প্রথম প্রকাশক :
মে বিপ্লব দিবস, ১৩৬৭

প্রকাশক :
মৈনাক ঘোষাল, প্রমীলা প্রকাশনী

মুদ্রাকর :
নিউ কমলা প্রেস,
শ্রীকৃষ্ণমোহন ঘোষ
৫৭/২ কেশব সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

বসন্ত স্মৃতি পাঠাগার, চাকদা, নদীয়ার,—সহৃদয় পরিচালকমণ্ডলীকে,—যাঁরা তাঁদের গ্রন্থাগারটিকে আমার পূর্বাপর চিন্তামূলক রচনায় যথেচ্ছ ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছিলেন।

সূচী

[বিঃ দ্রঃ ॥ বিদেশী গল্পগুলির প্রথম ও শেষের কাল্পনিক অলংকরণ অবশ্যই অনুবাদকের। সম্পূর্ণ পুস্তকটি শেষ না করে মন্তব্য করা যথাযথ হবে না।]

নরক-সরোবর

মাথায় যেন আকাশ ভেংগে পড়লো। বৃষ্টি, বৃষ্টি আর শুধু বৃষ্টি।

প্রায় দুঘণ্টা ব্যর্থ অনুসন্ধানের একমাত্র যে লরীটা এলো;—ব্রেক ভঙ্গী দেখিয়ে পগার পার। অথচ সরকারী পরিবহনের বাস-কনডক্টর বলেছিলো আমি না কী এখান থেকেই আমায় গন্তব্যস্থলের বাস-লরী যা কিছু হোক একটা পাবো।

এখন আমি কী করি ?

ভিজছি। কুকুরটা—অনেকক্ষণ আগে যেটা এঁটলীর মতো গায়ে সেঁটে ছিলো, কোনো এক সময় কেটে পড়েছে। হায় রে! যদি ওর পিছু ধাওয়া করে কোনো একটা আশ্রয় বা ওর গায়ে গা লাগিয়ে একটু তাপ পেতাম! কুকুরটা কী বেইমানী করতো? নিশ্চয়ই না। কারণ পাণ্ডব শ্রেষ্ঠ তো একদিন কুকুর ছাড়া স্বর্গে যেতে রাজী হয়নি।

আবার তেড়ে বৃষ্টি এলো। সরে এলাম মরুভূমির ওয়েসিসের মতো একমাত্র গাছটার আড়ালে। হঠাৎ-ই মনে হলো আমি কী বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। বাইরের এই প্রকৃতির মতো ছন্ন-ছাড়া জীবনটা আমার। সার্কাস-দলে কাটিয়েছি জীবনের বেশ কয়েকটা বছর। প্রথমে ছিলাম—পশু পরিচালকের অংগ সংবহন-কারী। কাজ ভালো লাগে নি কিছুদিন পর। পালা পাল্টালাম ট্রাপিজ-শূণ্যে। ভুড়িলাফ খেলায়। এর-ই ফাঁকে পড়া শোনার কিছু চেষ্টা। প্রাইভেটে স্কুল ফাইন্যাল, প্রি-ইউনির্ভাসিটি। তারপর একদিন তুলনামূলক তীর্ব্বতী—সাহিত্যে এম. এ.। শেষ পরীক্ষায় ভালোই উৎরে ছিলাম ঘড়ির দিকে নজর পড়লো হঠাৎ-ই! বারোটা প্রায় বাজো বাজো।

আমার জীবনেও। এখান থেকে এখনো চারশো মাইল পাড়ি দিতে হবে। মেঘলা আকাশ, পিচ্ছিল পথ। অজস্র চড়াই—উৎরাই সামনে। বৃষ্টি-টা থেমে গেছে অনেকক্ষণ। কাস্তের মতো চাঁদটা আমাকে দেখে বুঝি বাঁকা হাসছে। কাল সকাল দশটার মধ্যে আমাকে কলেজে যোগ দিতে বল হয়েছে। না দিলে কী হবে জানি না। যদি বলা হতো দশটার মধ্যে না পৌছালে নেওয়া হবে না। বাঁচতাম। এ যেন পোয়াতির বাচ্চা—হবার ব্যথা। টপ্ টপ্

জল ঝরছে ভিজে পাতার গা বেয়ে। শোঁ শোঁ করে হাওয়া উঠলো এক সময়। কখন না জানি নিজের অজান্তে দাঁতগুলি বাজনা আরম্ভ করে দিলো। ভিজে পাতা ঝড়ো হাওয়ায় যেন একশো শকুন-বাচ্চা কান্না জুরে দিলো। চাঁদ-টা ট্যারা চোখে এক নাগাড়ে চেয়ে হাসছে। এ যেন শকুনির চোখে পলক পড়ে না। ফিকে নীল আলো সমস্ত বিশ্ব-চরাচর ঢেকে দিয়েছে। সম্পূর্ণ ভুতুরে পরিবেশ!

ও—কী দেখছি?

ম্যাগ্‌লামোনিয়া না হ্যালুসিয়েনেসন্‌ কোনটায় ভুগছি আমি? দূর ছাই! সারাজীবন মার্কাস পালি সংস্কৃত আর মান্ধাতার আমলের চর্যাগীতি পড়েই জীবনটা নষ্ট করলাম। কী হলো আমার? মিষ্টি-ঢাকার শালপাতার মতোই জীবনটা আমার। অনেক কিছুই হতে পারে আবার কিছুই না। আরে! ওটা যে এসে পড়লো। জিনিষটা কী? কী সুন্দর একটা গান শোনা যাচ্ছে না। কোথা থেকে আসাছে গানটা! বাতাসটা তো ও দিক থেকেই আসছে। কী অদ্ভুৎ গন্ধ আবার। না, চেনা—শোনা কোনো গন্ধের সংগেই ওটার মিল নেই। খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যা হোক একটা কিছু করা চাই। এখনই না হলে কখনোই না।

ও—হরি! একটা বাস। না আমাদের চেনা-শোনা কোনো বাসের সংগেই এর মিল নেই। ছবিতে দেখা কোনো মার্কিনী বা ইংরেজী বাসের সংগেও না। বাসের কোনো হেড্‌লাইট নেই। মনে হচ্ছে—বাসের পঞ্চাশ গজ আগে পর্যন্ত দিন যেন ঠিক আগের অন্ধকারের সংগে হাত ধরাধরি করে চলেছে। কোনো বাসের গন্ধ কী চারদিকে সুমিষ্ট বাসে ভরিয়ে দেয়? আর যে গন্ধটার মিল পার্থিব কিছুর সংগে যায় না পাওয়া! এই গন্ধ এই আলো এই শকুন এটাই কী স্বর্গ! কতো লম্বা বাসটা—আন্দাজ নেই। সামনের অদ্ভুৎ দিন পেছনের বিস্তারকে একদম গ্রাস করেছে। চওড়াটাই বা কতো? জানি না মাথায় টোকা মারলাম। কাজ হলো না। সাকার্সী একটা ঘুষি! হ্যাঁ, শম্ভু ঘোষাল বেঁচে আছে। তবে, কোন জগতে সে? বহুৎ আচ্ছা!

'এক বাস চক্রা'!

অদ্ভুৎ নাম। এক বাস চক্রীই হও আর এক বাস নারকীই হও, ছাড়ান-ছাড়ুন নেই। এই বাসটাই লোপাট করতে হবে। কোন রাস্তায় যাবে ঠিক করতে পাচ্ছি না। চৌ-রাস্তার মোড় ছাড়িয়ে অনেকটা আগে গিয়ে থামলে

পড়লাম। লোপাট করতে গেলে আগেই যেতে হবে। পাগলা—ঘোড়ার মতো সুযোগ দিলে কোন রাস্তায় হাবড়ে যাবে কে জানে।

জয় বাবা ইম্পিরিয়াল সার্কাস!

চালাও চাক্কা। শূন্যের ওপর তিনবার পাল্টি গেলাম। অন্তত দশ-ফুট ওপরে। সাধারণতঃ বড় বড় খেলোওয়াড়-রা দেয় আট ফুট ওপরে। আর মোটে দুটো। আর আমি দিলাম তিনটা। প্রচুর সুযোগ পেয়েছে বাসটা। ইচ্ছে করলে গতি একটু বাড়িয়ে দিয়ে ব্যাংয়ের মতো চিড়ে চ্যাপ্টা করতে পারতো! না, গতি বরংচ কমিয়েই দিয়েছে অনেকটা।

শ নৈঃ শ নৈঃ!

শোনরে শম্ভু। জীবনে সবচেয়ে জোরে আর ওপরে ভুড়িলাফ দিলাম শূন্যে ডিগবাজী খেয়ে মাথাটা নীচে নামিয়ে। পড়ছি—পড়ছি। নীচে বাস-টার সোনালী দেহটা যেন আমাকে নিবিড় ভাবে পেতে চাইছে। পেলো। কিন্তু ঠাণ্ডা ঢালু বরফের চাই বেয়ে নীচে গড়িয়ে যাচ্ছি যে। এই কী শেষ! ভবঘুরে জীবন, সার্কাসে কেরদানী, কলেজের মাষ্টারি সবই শেষ!

না মরিনি!

বাসটা থেমে গেছে। ঝুপ্ করে কর্কশ রাস্তায় মাথাটা ঠুকে গেলো। মুখ খারাপ করে উঠলাম অজান্তেই। উত্তর বাংলায় রাস্তাগুলির ওপরটা মসৃণ করে না কেন। ঠিং ঠং ঠিং-গং, ডিং-ঢং!! অদ্ভুৎ বাজনা। সমস্ত অঞ্চলটা একটা দিকে বেগুনি আলোয় ভরে গেছে। শুয়ে শুয়েই একটা লাফ দিলাম। না, শরীরটা আজো ফিট আছে। ইয়াল্লা! এ যে বিরাট একটা বাস। যার জুড়ি পৃথিবীতে বোধ হয় কোথাও নেই। ছুঁচালো সোনালী একটা বেজী? মুখটার গোঁফের দু-দিকে মৃদু একটা লাল আলো ছড়াচ্ছে। ভেতরে সার সার মানুষ বসে আছে। একটা ভৌতিক, বিষণ্ণ পরিবেশ। এয়ার কণ্ডিশন্ড বাস। খুপড়ি খুপড়ি কাঁচের ভেতর থেকে বিরক্ত মানুষের সদাম্ভিক উঁকি ঝুঁকি! মানুষগুলি বেশ ঘ্যামা ঘ্যাম!

বেরিয়ে এসেছে ড্রাইভার। চোয়াড়ে মুখ। চেনা—চেনা। একসময় দেখলাম দরজা খুলে ক্লীনার-টা ও আমার পাশে এসেছে। কে বেশী চোয়াড়ে? এ যদি খোঁড়া হয় তো ও চোখে দেখে না। ড্রাইভারের কপাল-ঢাকা টুপির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে ওর কামুকী দৃষ্টি! লোকটা বোধহয় কিছুই দেখে না খালি মেয়েদের গোপন জায়গাগুলি। অদ্ভুৎ জান্তব ক্ষুধা। সময়

নেই। খুব তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে। তেড়ে যাবার আগে চোখ পড়লো ক্লীনারের দিকে। দামী আর ফিট-ফাট পোষাক লুচ্ছারের মুখ থেকে সবটা লাম্পট্য মুছে দিতে পারেনি। লোকটা কাঁধ থেকে বন্দুক নামালো। ওটা বন্দুক কী? অদ্ভুৎ-তো? কিন্তু আমি কী ধরা দেবো? ধরা দিলে সব পণ্ড। মরতে তো বসেছি। চারদিকের যা অবস্থা! কোনো ক্রমেই কাল দশটার মধ্যে কলেজে বহাল হতে পারছি না। ভরসা এই ভুতুরে বাস! লোকটা বন্দুকটা তুলে ধরেছে—হোয়াটস আপ! ইংরাজী মারাচ্ছি! চালাও ভক্কী। গাছটার দিকে তাকিয়ে শুধু 'ফায়ার' কথাটা বলতে পারলাম। ততক্ষণে সটান শান বাঁধানো রাস্তায় শুয়ে পড়েছি। ঘুরে গেছে লোকটা। লাল আলো বেরুলো বন্দুকটা থেকে। গাছটার দিকে আর তাকালাম না। শুয়েই ভল্ট খেলাম দু-বার। লোকটার টিগার ধরা কব্জিটা আমার দুই জুতের মধ্যে ঠিক আটকেছিলাম। ওই অবস্থায় পাক মারলাম ক্লীনারটাকে। শূন্যে উল্টে যখন রাস্তায় আবার দাঁড়ালো তখন অদ্ভুৎ দর্শন বন্দুকটা ড্রাইভারের বুকের দিকে তাক করা! অত বড় বিশালদেহী ড্রাইভার সম্পূর্ণ ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে গেছে। কাঁধের হোলস্টারের পিস্তল কোট ফাঁক করে ছোঁবারও ফুরসৎ পেলো না। মিন মিন করে ফ্যাসফেসে গলায় কে যেন বলে ওঠে, নিক্, টেক্ কেয়ার অফ্ ইওর লেসার গান্! হরি, হরি! এই তাহলে লেসার গান! সাড়া-শব্দ নেই মুহূর্তের অদৃশ্য রশ্মি যে কোনো বস্তুকে ধুলোয় পরিণত করতে পারে। না, ঠিক হলো না। ধুলো বলে কিছু নেই। বিজ্ঞানের আধুনিকতম অস্ত্রে বস্তুর পরমাণু বিভাজন সম্পূর্ণ হয়। চিন্তায় বাঁধা পড়লো। পায়ে চেপে ধরা হাতে খুঁট করে একটা শব্দ।

বুঝলাম লেসার গান এখন নীরব। শুয়ে থেকেই লেসার গানে একটা কষে লাথি মারলাম। এবং পিঠের মাংসপেশী আর কনুইয়ের যোগে আকাশকে পেতে চাইলাম। আকাশ পেলাম না তবে শূন্য থেকেই লেসার গান হাতে এলো।

চোখ পড়লো ড্রাইভারের দিকে। পিস্তল ওর হাতে আর নল থেকে আগুন বেরুচ্ছে। ভারসাম্য রাখতে ডান-হাতটা নৌকোর দাঁড়ের মতো বাঁকিয়ে পিঠে ঘুষি মারলাম। দিক পরিবর্তন হলো। কিন্তু কানের লতিতে গরম কিছু যেন পুড়িয়ে দিলে। মাটিতে নাবতে নাবতে আগেকার ফ্যাসফেসে গলা ভেসে এলো—ষ্টপ্ ফাইটিং, আয়ান। টু ইউ,—ইউ ব্ল্যাকি। প্লীজ ষ্টপ্ ইওর ভারটি গেম।

বোধহয় মুখ্‌খু ভেবেছে। বাংলাও শোনা গেলো—সাবধান, আমাদের কাছে ইলেক্‌ট্রনিক যন্ত্রপতি আছে। বাংলায় কথা বলছি বলে বোধহয় অবাক হচ্ছো। আমরা তোমার মনের প্রতিটি চিন্তাধারা পডতে পারছি। চুপচাপ বাসের মধ্যে এসো।

চিরকালের একগুঁয়ে আমি। মানুষের হুকুম শুনতে এখনো অভ্যস্ত নই। বিদ্রোহ করলো মন,—আমি যাবো না।

ফিরে তাকালাম ড্রাইকারের দিকে। না দেরী হয়ে গেছে। ক্যারেট্‌ চালিয়ে দিয়েছে ব্যাটা হাতের ছোটো আংগুলের পাশ দিয়ে। ছুটে আসছিলো কানের পেছনের মোক্ষম জায়গায়। ঘুরিয়ে দিলাম মাথাটা পয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণ করে। ও! মাথায় যেন দশটা বুলডোজার আঘাত করলো। শুয়ে পড়লাম মাটিতে। টিকটিকির লেজ কাটা গেলে যেমন কাটা লেজটা তিড়িং তিড়িং লাফায়। মাটিতে পাঁক খেতে লাগলাম অনবরত। বিশ্বাস নেই হারামজাদাদের। সন্ধি করেও যারা পেছনে ছুরি চালায় তাদের কখনো বিশ্বাস করতে নেই। স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে ড্রাইভারের উচ্চিংড়ের মতো লাফানো দেখে নিশ্চয়ই হাসতাম। ড্রাইভার আমারই তালে ল খাচ্ছে!

সুযোগ পেলাম একটা। পিস্তলটার নিশানা এক সময় আমার দেহের বাইরে চলে গেলো। দড়াম করে কষে একটা বুকে লাথি। না, ওর শরীরটা পড়তে দিলাম না। স্রেফ গলাটা কাচিতে ধরে নিলাম। পিঠ আর কনুয়েব সাহায্যে চরকির মতো কয়েকটা পাঁক দিলাম দেহটাকে। একটা ছেলে যেন নাগর-দোলায় চড়ে খেলনা পিস্তল থেকে চটপটি বাজিয়ে গেলো। থামলাম। যখন দেখলাম পিস্তল থেকে স্রেফ্‌ কট্‌ কট্‌ শব্দ বেরুচ্ছে। মোক্ষম মোচড় দিয়ে লোকটার দেহ দশ গজ দূরে সর্দির শিকনীর মতোই ছুঁরে ফেলে দিলাম। হঠাৎ কানে এলো আগের মিন্‌ মিন্‌ করে ফ্যাসফেসে গলার আওয়াজ—হে আমাদের ভারতীয় বন্ধু আমাদের সংগীর অহেতুক চাপল্যের ক্ষমা করুন।

এবার মনে পড়লো—এটাই তাহলে ওয়াক—টকি। আর ড্রাইভার ক্লীনার নির্দেশ পাচ্ছে ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে। আর সেই যন্ত্র ওদের দেহের মধ্যেই কোথায় আছে। আবার আওয়াজ পেলাম—আপনি আমাদের বাসে দয়া করে পদার্পণ করে বাধিত করুন। সু-স্বাগতম। ইউ আর ওয়েলকাম্‌ ইন্‌ আওয়ার অমনিবাস।

অমনিবাস। বাস কথাটা আদিতে অমনিবাস সেটা ভুলেই গিয়েছিলাম।

বিরাট বাসটার কাছে এসে দাঁড়ালাম। দুপাশে ড্রাইভার আর ক্লীনার। আমার হাতে লেসার বন্দুক। ওদের হাতে কিছুই নেই। চাঁদ ঢাকা পড়েছে মেঘের আড়ালে। বাহিরের ভুতুরে পরিবেশটা যেন একটা কালো ঠাণ্ডা কম্বলের ঝাপটায় মুছে গেলো। সবগুলি জানলা খুলে গেছে। কাছে-পিঠে সব জায়গাটা একটা নরম আর সুন্দর আলোয় ছেয়ে আছে। আমায় যেতে হবে। কাল কলেজে যোগ দিতে হবে। অজান্তেই সামনের রাস্তাটার বিরাট গাছটার দিকে তাকালাম। নেই গাছটা। ঐ গাছটা—যেটা কিছুক্ষণ আগেও আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলো, নেই সে! হয়তো বাসটা না এলে সারা রাতটাই গাছটার নীচে দাঁড়াতে হতো। একটা হিমেল বাতাস হঠাৎ আমাকে ধাক্কা দিলো। দাঁতের বাজনা আরম্ভ হতেই চোরা-বাজারের কোটটার সবগুলি বোতাম দিলাম এঁটে।

—ওয়েলকাম! সু-স্বাগতম!!

একটা উষ্ণ, ঘুম জড়ানো আবেশে ভুলে গিয়েছিলাম সব চিন্তা-ভাবনা। একটুও ধাতব শব্দ না করে বাসের একটা দরজা খুলে গেছে। ভিতরে ঢুকলাম আমি।

এখানে স্বর্গ বাইরে নরক।

পেছনে বাসের ফাঁকটা আবার বন্ধ হয়ে গেছে কখন। জানিনা কী করেই বা খুল্লো আর বন্ধ হলো। সেই চিন্তাটাও হারিয়ে গিয়ে মন এক অনাবিল আনন্দে ভরা গেলো। হ্যাঁ সারা জীবন আমি এখানে অপেক্ষা করতে পারি এক পায় দাঁড়িয়ে। কে আমি কোথায় যাবো ভুলে গেলাম! বাইরে নরক ঠাণ্ডা, নিঃস্বতা মারামারি, হিংসা অনাহার আর দারিদ্র্য! এখানে—চোখ জুড়ানো আলোয় ভুবন ভরানো। এই ছিটে-ফোঁটা আলো-ই বাইরে চুইয়ে অনেক-অনেক গুণ বড় হয়ে গেছে। আমি বিজ্ঞান পড়িনি। কারণটা জানিনা। এমন কী এই যে আলো সারা বাসটা ভরিয়ে দিয়েছে—তার উৎস আমি অনেক চেষ্টায় খুজে পেলাম না।

অর গন্ধ! পৃথিবীর কোনো গন্ধেই এর মিল নেই। যদি গাচ্চা হতাম সারাক্ষণ জোরে জোরে নিঃশ্বাস টেনে গন্ধ নিতাম। এই গন্ধটাই অনেক গুণ টের পাওয়া গিয়েছিলো বাসটা যখন বেশ দূর থেকে আসছিলো।

আমি কী নাচচ্ছি না-কী? হ্যাঁ তাই-তো আমি কী পাগল হলাম না

মৃত উদয়শংকর আমার ওপর ভর করলো। পাগুলি নাচাচ্ছি। বিভিন্ন মুদ্রায় হাতগুলি উপর নীচ করছি। একটা গান হচ্ছে না? হ্যাঁ, তাইতো একটা গান। এমন একটা গান যা শুনলে আপনা থেকেই হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মতো নাচেরে! আমি কাঠখোট্টা ট্রাপিজের খেলোওয়ার,—যাকে শত চেষ্টায় সার্কাসের অর্কেষ্ট্রা পার্টি একটা আংগুল নরাতে পারে নি? আজ সেই লোভী ছেলের মতো সমানে ঝোল টানছে আর নাচছে!

—শ্রীযুক্তবাবু শম্ভু ঘোষাল আপনি দয়া করে বসুন। প্লীজ বী সিটেড্।

চমক ভাঙলো দুটো কারণে। আগের মিনমিনে আর ক্যাসক্যাসে গলাটা এখন খুবই স্পষ্ট। গান থেমে গেছে। আলো পালটেছে। এখন সাদা বার লাইটের আলোয় সমস্ত বাসটা ভরা। দু-পাশে তাকালাম। আমার দুপাশে যথারীতি ড্রাইভার আর ক্লীনার। যেন দুটি লম্পট স্কুল-পালানো ছেলে হেডমাষ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে। মনে এলো আবার বাস ছিনতাইয়ের চিত্রটা। হাত দুটো উঠেও গিয়েছিলো দুটোকে বগলদাবা করতে। কিন্তু হঠাৎ-ই চোখ পড়লো এইমাত্র যে কথা বলে উঠলো। একজন উচ্চ-মর্যাদাসম্পন্ন অভিজাত শ্রেণীর ভীষণ ফর্সা মানুষ আমার সামনে বসে! কী চোখ! কী প্রচণ্ড আরষ্ট করা ব্যক্তিত্ব। না আমার বদমায়েশী উবে গেলো। সারি সারি মানুষ সব বসে। কী সুন্দর উঁচু কাঁধ-ওলা চেয়ার। ওগুলিকে চেয়ার বলবো না সো-ফা বলবো? ইচ্ছে করলে ওখানে শোয়াও যায়। হাতল—না হাতল ওকে বলা যায় না। হাতল-দুটো যেন কোল-বালিশ। প্রত্যেকের বসবার সামনে ঝক-ঝকে কালচে সাদা টেবিল। পরে জেনেছিলাম ওগুলি রূপোর তৈরী। বসবার জায়গাগুলি ভর্তি। কেবল একটা চেয়ার তখনও খালি। ওটা কী আমারই জন্য? লোকগুলির দিকে তাকালাম—একটার মুখ, অন্তত একটা শয়তানের মুখ চাই—যাকে দেখে আমি বাস ছিনতাইয়ের চিন্তাটিকে নিবিড় করে পেতে পারি।

পেয়েছি! একজনকে পেয়েছি! একটা ষণ্ডা-গুণ্ডা লোক এক কোনে চুপ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলো। লোকটার মুখে নিষ্ঠুরতার ছাপ আছে। জয় মা কালী কোলকাত্তাওয়ালী! কয়েক পা এগিয়েও গেলাম। কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হলো। সমস্ত নিষ্ঠুরতার ছাপকে ঢেকে দিয়েছে একটা করুণ বিষণ্ণতা। যার হৃদয়ের অভিব্যক্তি হচ্ছে মুখটা। পৃথিবীর যে যেখানে দুঃখী আছে তাদের দুঃখই যেন ওর মুটে ফুখে বেরোচ্ছে

দৃষ্টিটা পিছলে পিছলে সবগুলি মানুষ যখন শেষ করছে ঠিক তখনই আটকে গেলো একদম সামনের সম্মুখ দিকে। হ্যাঁ ওখানেই বসে আছেন সম্রাজ্ঞী! বয়স হয়েছে প্রচুর। উনি কী সত্যিই সম্রাজ্ঞী? কই না তো! কোথাও নেই সম্রাজ্ঞীর পোষাক। বসে আছেন উনি একান্তই আপনভাবে সকলের থেকে আলাদা সিংহাসনের মতো আসনে। ওটা কী সিংহাসন? উঁচু আসনে ঝকমকে পাথর বসানো যা আলোর খেলার বর্ণচ্ছটা দিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। আসনটা কী সোনার? ভদ্রমহিলার দেহে শোভা পাচ্ছে চকলেট রং-এর একটা গাউন। ওপরটা তার লাল-সুতোর ক্রকেটের কাজ। গলায় একটা মুক্তোর মালা। যার দানাগুলি পাকা আঙুরের মতো টস-টস করছে। মালার মাঝে পেপার ওয়েটের মতো বড় একটা হীরে। ডান হাতে পদ্মরাগ মরকৎ ও সূর্যকান্তমনি বসানো ব্রেসলেট। বা-হাতে একটা সোনার ঘড়ি। বাসের গাঢ় আলোয় যেটা চিকচিক্ করছে। কিন্তু ঘড়িটার বন্ধনীটার ধাতু মেটে মেটে কেন? তবে কী প্ল্যাটিনামের ব্যাণ্ড। শুনেছি প্ল্যাটিনাম ধাতুর কোনো উজ্জলতা নেই। মুখের দিকে তাকালাম। আলোতে লিপষ্টিকের সঙ্গে গায়ের চামড়ার রংয়ের পেন্ট জমেছে ভালো। চোখ বুজে ছিলেন ভদ্রমহিলা। চোখ খুল্লো, ঠোঁট নড়লো, ঘাড়টা মাত্র পনেরো ডিগ্রী ঘুরলো, পারলে ভু-ফ্রাঁসে? তুলনামূলক তিব্বতী সাহিত্যে খট্‌মটে লামাদের দরমি রংপো লালংডা-ড পরীক্ষা হলে পৌঁছবার আগে কিছুতেই মনে পড়তো না। কিন্তু প্রশ্নপত্র পাওয়া মাত্র সব হু-হু করে ভীড় করতো। হায়রে বুর্জোয়া!—পারলে ভু-ফ্রাঁসে!

এককালে ফরাসী ভাষা কিছু শিখেছিলাম। যদি বেড়ালের ভাগ্য শিকে ছেঁড়ার মতো কোনো বিদেশী জলপানি মেলে। সিনেমার ফ্লাশব্যাকের মতো সব কিছু মনে পড়লো আমার। ইংরাজ-সাহিত্যিক চসারের আগে কোনো খানদানী ইংরেজ সমাজে ফরাসী ছাড়া কথা বলতো না। সম্রাজ্ঞী সেই ভাষায় কথা বল্লেন। সেই ফরাসী ভাষায়! মুখটার দিকে আবার তাকালাম। সম্রাজ্ঞীই বটে। আচ্ছা রানী এলিজাবেথ, মহারানী ভিক্টোরিয়া, দিল্লীর সম্রাজ্ঞী রিজিয়া কী এই একই ঠাট-ঠমকে চলতেন?

মনে পড়লো মুখটা। উনিই সেই আগাথা ক্রিষ্টি! আগের দেখা মুখগুলিতে আবার চোখ বোলালাম। চিনলাম অনেকগুলিই, ভারতীয় মুখের ছাদের লোকটা স্যার্ আর্থার কোনাল ডয়াল। শুধুমাত্র একটা কাগজ পেনসিলের আঁকি-ঝুকি কাটছেন—হ্যাঁ, উনিই বিখ্যাত এডগার এলেন পো। ওই সে ষণ্ডাগুণ্ডা

লোকটা যাকে মারতে হাত নিসনিস ক'ছিলো কিন্তু বিষণ্ণ নিশাদের করুণ অভিব্যক্তি আমাকে রুখে দিলো, উনি কে? ওঃ, আচ্ছা উনিই জেমস্ হেডলী চেজ্। ড্রাইভারের দিকে তাকালাম। ষ্টিয়ারিংয়ের সামনে ঝুঁকে সামনের রাস্তায় হয়তো কোনো সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে একান্ত হবার স্বপ্ন দেখছিলেন। হঠাৎ তাকালো আমার দিকে। ঘাড় ফিরিয়ে মাথা ঝোঁকালো অল্প একটু হেসে। মনে পড়লো লোকটা আয়ান ফ্লেমিং। ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে! যার জন্য ও শত্তুর আগমন আগেই টের পায়। আছেন অদ্ভুত গোঁফ-ওলা মার্ক টোয়েন।

—আমি নিক কার্টার! ক্লীনারটা ঘাড়টা চুলকিয়ে ওর দিকে তাকাতেই বলে উঠলো। হ্যাঁ, নিক কার্টারই বটে! ওর আবার শত্তুর উপস্থিতিতে ঘাড় চুলকোয়।

—পারলে ভু-ফ্রাঁসে। গলায় মাপা বিরক্তি! আগাথা ক্রিষ্টি সম্রাজ্ঞীর বিরক্তি নিয়ে তৃতীয় বার বলে উঠলেন। রূপোর সিগারেট-হোল্ডার ঠুকে অল্প ছাই ঝাড়লেন—পাঃদোনে মোয়া! উইয়ে মাদাম উইয়ে! প্রচুর মাথা ঝুঁকিয়ে বলে উঠলাম। তর্জনী ঈষৎ উঠিয়ে সম্রাজ্ঞী নির্দেশ দিলেন কিছু। তাকিয়ে দেখি ক্লীনারের পাশে একটা ছোট খাটো বসবার চেয়ার। অকিঞ্চন। আমি যেন হংস মধ্যে বক যথা। কে যেন বলে উঠলো—সম্রাজ্ঞী মহানুভব! উনি আপনার জন্য ঐ আসন নির্দেশ করেছেন। এডগর এলেন পো দুবার টেবিলে পেন্সিল ঠুকে কিছু বল্লেন।—দুঃখিত, অত্যন্ত দুঃখিত আপনাকে খাবার দিতে দেরী হয়ে গেলো। খাবারের কথা শুনেই অনেকক্ষণ ঝিইয়ে রাখা খিদেটা চাড়া দিয়ে উঠলো। শেষ খেয়েছি শিলিগুড়িতে, দুপুর বারোটায়। কালিংপংয়ে এক কাপ চা। ব্যাপারটা কী? এসব হচ্ছেটা কী? এখানে জীবিত আর মৃতের আখড়া কেন? কেন এতো রহস্য-রোমাঞ্চ লেখকের সমাবেশ। মৃত ও জীবিত কী করে পাশাপাশি থাকতে পারে? সহজবোধ্য—এটা চক্রান্ত সৃষ্টিকারী মানুষের 'বাস'। যাকে বলা হতো আগে অমনিবাস। তাই বাসটার নেমপ্লেট 'এক-বাস-চক্রী'। কিন্তু যাচ্ছেটা কোথায়?

আপনার খানা।

গন্ধ উঠছে ভুর ভুর ধোঁয়া উঠছে শির-শির এক-প্লেট রোষ্ট-করা মুরগী থেকে। আংগুর—কলা-কমলালেবু আর এক পট্ নেস্ কফি! কী ভুতুরে খানা। রান্নাই বা করছে কে? দিয়ে বা গেলো কে? এ-যেন ছোটো বেলায়

গল্প-শোনা ভূতের গল্প। অতিথি এসেছে রাতে। চাইলো সে লেবু। কুঁড়ি হাত দূরের বাগান থেকে মালিক হাত বাড় করে অতিথিকে লেবু ছিঁড়ে দিলো। ভুতুড়ে আর অলক্ষণে চিন্তাগুলি জোর করে তাড়ালাম। ঝাঁপিয়ে পড়লাম গরম গরম খাবারগুলির ওপর।

একটা আরামের ঢেকুর তুলেই লজ্জায় পড়লাম। তাকালাম মুখগুলির দিকে। মাপা বিরক্তিতে সকলেই আমার দিকে তাকলো। সতর্ক হলাম। কোনো শব্দ না করে ঠোঁট পুড়িয়ে কফির পটে চমুক দিলাম।—আমরা যাচ্ছি কোথায়?

—নরক সরোবর।

তাকালাম। কথা বল্লো কে? কারণ এই ফ্যাসফেসে আর মিনমিনে গলা আমি বাসের বাইরে শুনেছি। ওঃ, তাহলে স্যর আর্থার কোনান ডয়ালই হচ্ছেন দলপতি। অর্থাৎ আগাথা ক্রিষ্টি যদি সম্রাজ্ঞী হয়—স্যর আর্থার প্রধান মন্ত্রী!

—নরক সরোবর? সেটা কোথায়?

—আপনাদের মানস-সরোবরের কাছেই!

মনটা আমার মেঘ-দেখা পেখম ছাড়া ময়ূরের মতোই নেচে উঠলো। তিব্বত মানেই তো আমার কলেজের—। তাড়াতাড়ি চিন্তাটাকে চাপা দিয়ে প্রশ্ন চালিয়ে গেলাম,—যদি কিছু মনে না করেন—কারণটা জানতে পারি কী?

—নিশ্চয়। আমাদের বিশ্রাম হয়ে গেছে। আয়ানও তৈরী। বাস ছাড়বে। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। আমরা সকলেই রহস্যের যাদুকর। রহস্য-খুন-চুরি-রাহাজানি—অর্থাৎ পৃথিবীর অমংগলের কালো বাদুড় আমাদের চিন্তায় ডানা মেলে থাকে। এক কথায় আমরা শয়তানের পূজারী। সেই শয়তানের আমরা বছরের এই সময় দর্শন পেয়ে থাকি। কারণ তিনি আমাদের সৃষ্টির এক রূঢ় সমালোচক।

—সরোবর কেন? আমি একটু থতমত খেয়ে প্রশ্ন রাখলাম। বাসের আলো গন্ধ আর উষ্ণতার পরিবর্তন হয়েছে। মুর্গীর রোস্টের গন্ধ মিলিয়ে গেছে। বাসে ওঠার সময় যে আলোটা দেখেছিলাম এখন আবার সেই আলোটাই ফিরে এসেছে। উষ্ণতা একটা ঘুম-ঘুম পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। স্যর আর্থার চুরুটের ছাই ঝাড়লেন।

—শয়তান থাকে নরকে। আর ঐ নরক-সরোবরের সংগে নরকের সরাসরি যোগাযোগ আছে। শয়তান ঐখানেই উঠে আসে। সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম,—এখানে জীবিত আর মৃত একসংগে আছেন কী করে? ভূত-পেত্নী আর মানুষ এসব কী?

—ভুল, চরম ভুল। আমরা কেউ মরিনি, কেউ বাঁচিনি। শয়তান আমাদের সৃষ্টি করেন, তিনিই আমাদের টেনে নেন। এই যে আমরা এতোগুলি লোক যাচ্ছি—ফেরার পথে হয়তো একজন ফিরলো না।

—কেন?

—শয়তান তাকে নিয়ে নিয়েছেন। ফলে পৃথিবী থেকে তার নাম সঙ্গে সঙ্গে মুছে যাবে। অনেক রাত হয়েছে, আপনার অনেক বেয়াদপি আমরা সহ্য করেছি। সাধ্যমতো আতিথ্য দিতে অবহেলা করিনি। নাউ, ইউ প্লীজ গেট আউট!

মুখ ফস্কে হঠাৎ শুধু বেরিয়ে গেলো—আপনার উপযুক্ত কথাই বলেছেন। বিরক্ত হলেন ভদ্রলোক, ঘুম-ঘুম চোখ সজাগ হলো,—মানে?

—আপনি আপনার উপযুক্ত কথাই বলেছেন!

ঘুম-ঘুম ভাব অদৃশ্য হয়েছে। মাত্রা ছেড়ে বিরক্তি অনেকটা বেশী উগ্র হয়েছে,—কী বলতে চান আপনি?

—আপনি আপনারই সৃষ্টি "পয়জন বেল্টের" ড্রাইভারের সংগে এর চেয়ে ভালো ব্যবহার করেন নি।

ভুরু কোঁচকালেন ভদ্রলোক। মনে করবার চেষ্টা করলেন,—ড্রাইভার?

ঘোমটা যখন খুলেছি ভালো করেই খ্যামটা নাচ দেবো—ন্যাকা সাজছেন না-কী? "পয়জন বেল্ট"-এ পৃথিবী যখন বিষাক্ত আবহাওয়ায় ঢুকলো আপনার আরেক চরিত্র পাগলা অধ্যাপক সস্ত্রীক রিপোর্টারকে নিয়ে দোতলার ঘরে ঢোকো, কিন্তু ড্রাইভার বেচারা খোলা মাঠে পড়ে রইলো। কী ক্ষতি করেছিলো সে আপনার? সে তো পাগলা লোকটার প্রকৃত উপকারী বন্ধু ছিলো।

—দ্যাট্‌স রাইট মাই ফ্রেণ্ড। আমাদের ষ্ট্যাণ্ডার্ড চাই। সে একটা মূর্খ ড্রাইভার, কোনো শিক্ষা নেই, সে পণ্ডিত মানুষের সংগে একঘরে থাকে কী করে?

—আর সেই স্ট্যাণ্ডার্ডের জন্যই কী আমাকে তাড়াচ্ছেন?

—একজ্বাক্‌টলি !

—চমৎকার আপনাদের কারবার মানুষকে নিয়ে—সেই মানুষটাকেই আপনি অদরকারে বিনা অপরাধে আস্তাকুড়ে ঠেলে দেবেন ? মানুষ যদি না থাকতো—

—লিওনাদো ভিঞ্চি নানা জিনিষে ছবি এঁকেছিলেন। সেই জিনিষগুলি কী ভিঞ্চির সমগোত্রীয় বলে দাবী করবে। আপনাদের অজন্তায় তেল কাদা আর কী সব গুঁড়ো দিয়ে দেওয়ালে চিত্র এঁকেছিলেন শিল্পীর দল। তাই বলে কী ঐ নোংরাগুলো শিল্পী মর্যাদা-সম্পন্ন ?

—বেশ। বলুন কী আপনাদের স্ট্যাণ্ডার্ড।

—আমাদের সংঙ্গে যারা থাকবে তারা সকলেই হবে রহস্য-গল্প লিখিয়ে—

—লিখিয়ে ? বলিয়ে হলে চলবে না ?

—না।

—কারণ ?

—আমরা লোকের কাছে ঘটনা শুনি। তারপর তা নিজের মুন্সিয়ানায় সুন্দর সৃষ্টিতে পরিণত করি ; ধরিত্রিতে আছে মাটি, গাছে কাঠ, কাদায় রং। শিল্পী তাতেই সুষমামণ্ডিত মূর্তি তৈরী করে।

আবার কলেজের চিন্তা ফিরে এলো। অন্যমনস্ক হবার জন্য ঘড়ির দিকে তাকালাম। ঘড়িটার কাঁচ সম্পূর্ণ ভেংগে গেছে। কাঁটা একটা উধাও। ছোটো কাঁটাটা বারোটার ঘরে রয়েছে। আমার আশারও বারোটা। লোভী মানুষের খাবার যেমন কথায় কথায় মনে পড়ে—আমারও কলেজ, তিব্বতীয় তুলনামূলক সাহিত্য, কলেজ।—হঠাৎই ক্ষিপ্ত হয়ে গেলাম। যাত্রাদলের মতো সুর করে গান গাইতে লাগলাম—তেরে-মেরে, মেরে-তেরে—তোম্ হাম্ হামকো মেরে তোমকো মেরে সাথ্—হৈ হৈ-হৈ !

—ষ্টপ্ ! প্লীজ হল্ড্ ইওর টাং !

থমকে গেলাম। চমকে গেলাম সুরেলী মেয়েলী গলার আওয়াজে—আপনাকে কী কখনো পাগলা কুকুরে কামড়েছিলো ?

সম্রাজ্ঞী কতোখানি বিরক্ত হয়েছেন সূক্ষ্ম কোনো যন্ত্র থাকলে হয়তো মাপা সম্ভব। না বোঝাতে ঘাড় নাড়লাম। পাগলা কুকুর হয়ে যদি এদের সকলের টুটিগুলি কামড়ে গাড়ীটা নিয়ে পালাতে পারতাম।

—অসম্ভব !

—কী ?

—আপনার ঐ অদ্ভুত স্বপ্ন! আপনি কিছুতেই এই বাসটা হিজ্যাক্, যাকে আপনাদের বাংলা ভাষায় ছেনতাই বলছে আজকাল, করতে পারবেন না ? মাপ করবেন, আপনি ওভাবে চিৎকার করে উঠলেন কেন ?

—আমি যাত্রার গান গাইছিলাম।

—যত না! সেটা আবার কী ?

—খালি মাঠে গলা ফাটিয়ে অভিনয় করা, গান করা—

—ধন্যবাদ। আমাদের যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে। আপনি দয়া করে নেবে যান।

খুব সুন্দর একটা খিস্তি এসেছিলো মুখে। প্রাণপণে দাঁতে ঠোঁটে চাপলাম। মুখে নোনতা লাগলো। রক্ত বেরিয়ে গেছে! তবু খিস্তিটা বের হতে দিলাম না। খুব ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলাম,—আপনাদের এখানে যারা আছে তাদের সকলেরই কী সমান ষ্ট্যাণ্ডার্ড। ঐ যে ড্রাইভারটা ওতো খালি মারামারি জানে। যেটা আমি ভালো পারি একটু আগেই দেখিয়ে দিলাম। যেখানে মারামারির ফুরসৎ কম সেখানে স্রেফ গেঁজায়! পৃথিবীর যত মেয়ে যেন জামা-কাপড় ছেড়ে কচি-খুকীর মতো হামলে আছে ওর জন্য। সম্রাজ্ঞী আগাথা ক্রিষ্টি কী সিগারেটের ধোঁয়াতেই কাশলেন না আমার কথাটায় লীন অশ্লীলতায় ?

—না ঠিক বলছেন। কিন্তু তবু আপনি জানেন ওর পাঠক পৃথিবীতে এক সময় সবচেয়ে বেশী ছিলো। আপনাদের দেশেও যে লোক সাহসিকতার কাজ করে তাকেই 'জেমস বণ্ড' বলে। জেমস বণ্ড যে নোংরা আর ঘন ঘন বিছানায় শোয় সে কথা কিন্তু মনে রাখে না। সব চেয়ে বড় পুরস্কার ওনার সব বইগুলি চিত্রায়িত হয়েছে।

—আর ঐ ক্লীনায়!

—ওর মতোই আপনি বলুন-না একটা গল্প।

—স্যার আর্থার !!

সম্রাজ্ঞী প্রোটোকল ভাংগলেন। অবশ্য ওদের ঘরোয়ানায়! গলা'র পর্দাটা আগাথা ক্রিষ্টির অনেক চড়ায় বাঁধা। আমার দিকে তাকালেন—যেন তার পায়ের কাছে একটা কেন্নো এসেছে। মরুক গে! হাতের তাস বুকে চেপে ধরলাম। তূণের বাইরে তীর। আর ফেরাতে পারবেন না তাঁর কথা দলনেতা স্যার আর্থার কোনান ডয়াল—ওয়াদা!

—হোয়াট ওবার্ধা ! মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী !

—আই মীন্ প্রোমাইজ্।

সময় নিলেন স্যার আর্থার। সকলের মুখে দিকে তাকালেন। দলনেতা ভুল করেছেন। কিন্তু প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বর কাছে কে দাঁড়াবে। ঘাড় নাড়লেন সকলে। এক ইঞ্চি মাথা নাবিয়ে দিলেন, ইয়েস্, আই প্রোমাইজ ! কিন্তু যেখানে আপনার গল্প আটকে যাবে, আপনিও আটকাবেন ঠিক সেইখানেই। কোনো চালাকী নয়। গল্প গল্পই হবে। নায়ক-নায়িকা জলে ডুব দিলো আর আপনিও দাঁড়ালেন যতোক্ষণ না তারা জল থেকে ওঠে ! একদম চলবে না। পাঁচ মিনিট সময়। আরম্ভ করুন।

ঠেলা সামলাও ! ভূতের কাছে মামদোবাজি ! ফিরিঙ্গীর সংগে ইংরেজী !! পৃথিবীর কাঁহা কাঁহা ডিটেকটিভ্ টিকটিকি সাহিত্যিকদের সংগে ফাজলামো ? এ-কী তোমার ট্রাপিজের খেলা না রাস্তায় গুণ্ডামি না ভদ্র জীবনে পালি আওড়ানো।

সামনের রাস্তার দিকে তাকালাম। মেঘ সরে গেছে। বাঁকা চাঁদটি দিক-চক্রবাল থেকে কিছুটা ওপরে। কিছুক্ষণ আগে আমার আশ্রয়দাতা গাছটা তার জায়গায় নেই। আমার পথের বন্ধু কুকুরটা ফিরে এসেছে। বাইরের কোনো শব্দই ভেতরে আসছে না। কিন্তু কুকুরটার লেজ পেটের ভেতর গেছে ঢুকে। সমানে ওটা দাঁতমুখ খেঁচাচ্ছে ! ও টা কী ভয় পেলো ?

বাইরে নরক ভেতরে স্বর্গ। কিন্তু নরক যারা তৈরী করে—সেইসব চক্রী এখানে বসে আছে। মরা আলোয় প্রকৃতি ভরে গেছে। দূরে দূরে পাহাড়গুলি যেন কালো-কালো দৈত্যের মতো হাতছানি দিচ্ছে ! ঢেউ-খেলানো চড়াই উৎরাইয়ের পথ। সামনে ভীষণ খারাপ রাস্তা। কোলকাতা বোম্বে ফেরৎ কিছু কুকরী হাতে নেপালী গুণ্ডা কী নেই ? কী হবে যদি আমায় বাস থেকে নাবিয়ে দেয়। বাসটা অনেকক্ষণ চলতে আরম্ভ করেছে। পেছন ফিরে তাকালাম। কুকুরটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ-ই সব অন্ধকার হয়ে গেলো। বিদায় ক্ষণিকের বন্ধু বিদায়। বাসটা একটা সুরংগে ঢুকেছে ! চিন্তায় বাঁধা পড়লো —হে ম্যান, সাম্-টডি !

—ক্লিনার নিক তাড়ি চাইছে।

এই তো গল্প বলার পরিবেশ ! গম্ভীর গলায় আওয়াজ উঠলো—

বেল-গন্ !

সময় নেই। হয় গল্প নয় রাস্তা। হয় স্বর্গ নয় নরক ! তাই হোক

উথাল পাথাল যায় নেতোল খোবানো

নিশ্চিন্তপুর।

গভীর নিশ্চিন্তে গ্রামটা যেন সব সময় ঘুমিয়ে থাকে। গরীব নমঃশূদ্রদের গ্রাম এটা। জীবন-যাত্রা যেন অনেকদূর ছুটে কয়লা-ফুরানো একটি কয়লার ইঞ্জিন। ধুঁকছে। হয়তো নিবে যাবে কোনো এক সময়-গতি তো দূরের কথা। পাকা-বাড়ী একটাই। প্যাকাটি খেজুর গাছ যার যা সুবিধে হয়েছে তাই মাটিতে আস্তব দিয়ে ঘর বানিয়েছে। ঘরের চাল সব সময় ঝুর ঝুর করে পড়ছে। নিশ্চিন্তপুরে একমাত্র আস্ত পাকা বাড়ীর মালিক রাঘব মণ্ডল। বহুদূরের মহাকুমা শহরে সরকারী অফিসের খেদমৎকার পিওন। উপরি—কিংবা মিথ্যা ভ্রমণ-ভাতা দেখিয়ে সে সংসারটা গুছিয়েছে। ছেলে পুলেও কম। মাত্র চারটে!

বড় হওয়া পৃথিবীকে মুঠোয় ভরা, আকাশকে নিবিড় ভাবে কাছে পাওয়া কোনো কোনো মানুষের রক্তে। ছেঁড়া-কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা মানুষের চিরন্তন স্বভাব। রাঘব মণ্ডল স্বপ্ন দেখে সেও একদিন ধনী হয়েছে। ছেলের বিয়ে দিয়েছে। ছেলে অনেক অনেক টাকা বিয়েতে যৌতুক পেয়েছে। কিন্তু দুঃখ হলো তার একটি বেশী ছুটো নেই। তিন-তিনটে মেয়ের ছ্যাচড়ামো করে যা হোক হেড্যা-ফেড্ডা করে বিয়ে দিয়েছিলো। একমাত্র ছেলে রামু। রাঘব মণ্ডল সময়ের সুযোগ নিয়েছে প্রচুর। সমাজ একদিন তথাকথিত নীচু তলার মানুষদের পায়ে চেপে রেখেছিলো। আজ তার শোধ দিচ্ছে। বিনে পয়সায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা, পরীক্ষা দিতে রেল-ভাড়া, উন্নতির জন্য পাকা ব্যবস্থা কতো কী! ধাপে ধাপে ছেলেকে উপরে তুলেছে রাঘব মণ্ডল। দূর কল্যাণী শহর থেকে ফার্মাসীর সার্টিফিকেট করিয়েছে কোনো গতিকে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা উৎরানোর পর। বিয়ে দিয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বৌ টেঁকেনি। বিয়ে দিয়েছিলো পাশের গ্রামের হরিহর বিশ্বাসের বড় মেয়ের সঙ্গে। বড় চাষী হরিহর। বড় মেয়ের বিয়েতে প্রচুর দিয়েছে। দশভরি সোনা। বাসন-কোষণ, বিছানা পত্র। ছেলের ঘড়ি-আংটি ট্রানজিস্টর, সাইকেল। রামু তখন সবে রানীঘাটে ড্রাগ-কণ্টোল অফিসে ঢুকেছে। অবাক হয় রাঘব।

তাকে দুলালীকে বিয়ে করতে হয়েছিলো দুলালীর বাপকে এক কাঁড়ি টাকা গুণে দিয়ে। আর আজ। রামুর বৌ টি'কলো না ঠিক। কিন্তু তার পণ বাবদ পাওয়া টাকায় ঐ নতুন ঘরটা! ঐটা ঠিক টিকে রইলো! আর সোনা-দানা? সে-তো দুলালীই দরকার পড়লেই পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লোকে বলে তারা বৌকে মেরেছে! বলুক গে!

রামুকে বিয়ে দেওয়া যেন রাঘবের নেশায় পেয়ে গেছে। থানা পুলিশের ভয় সে করে না। তাই দ্বিতীয় বিয়ে দেবে—এখান থেকে দু-ক্রোশ দূরে চুনি পেরিয়ে বসন্তপুরে। এখানকার মেয়ের বাপ আরো বড়লোক। মস্তবড় জোতদার। গভীর নলকূপ এলাকায় জমিই আছে ৩০ বিঘে। তে-তলা পাকা-বাড়ী। বিয়ের আগে দুঃখ করেছিলো রাঘবমণ্ডল, শ্যালার ছেলের যদি সরকারী পইতে থাকতো।

মুখ্যু-সুক্যু দুলালী বুঝতে পারেনি। খাটো গামছা পরে উদোম গায়ে রোদ্দুরে ধান শুকোচ্ছিলো খেবড়া পা দিয়ে। দেখে মনে হয় কালী-ঠাকুরের সামনে, যে দুটো ডাকিনী-যোগিনী আছে তাদেরই একটা এইমাত্র উঠে এলো। পাঁচদিনের পুরনো পান্তাভাত কিছু চিংড়িমাছ আর পেঁয়াজ দিয়ে মেরে পান চিবোচ্ছিলো। মুখের ঝোল টানতে গিয়ে অনেকটা পানের রস বুকে চলকে পড়লো। কোনমতে ঝোল সামলালো—কি বয়েলো? রেখো আবার বেমন হয়েলো-না-কী?

রাঘব ঘরে ঢুকেছিলো তাড়ির গেলাশ আনতে। সূর্যের দিকে তাকালো। হেলে পড়তে দেরী আছে। এক চমুকে গেলাসটা শেষ করে বল্লো—দূর মাগী! বামুন হতে যাবে কোন দুঃখে? মর শালারা! কথায় বলে কলির বামুন ঢোঁড়া সাপ না মারলে মহাপাপ। আমি বলছিলাম রামু কবে গেজেটেড অফিসার হবে।

—ঝাঁটা মার! গেজেটেড অফিসার হয়েলে কী দশটা পা বেরেয়েলো। মুই এতি চাই। এতি—

টাকা বাজাবার ভংগী করলো।—বেঁচে থেকোনা মোর বাপ্! মোর বুক জোড়া ধন। মুই কিন্তু এবার ওনার বিয়েতে ফটফটি চেয়েলো, আর মোর সাতলড়ি হার! হ্যা—মুই নইলে কুরুক্ষেত্র বানাবো—

রামুর এবার কার বিয়েতে যৌতুকের পরিমাণ এবং দাম অনেক বেড়েছে। সব চেয়ে চোখে পড়ে তার দাবীর মধ্যে মোটর সাইকেল। কিন্তু কথা হচ্ছে

মোটর সাইকেল চালাবে কোথায়? গ্রামে কোনো রাস্তা নেই। মাঠের আল আর এর বাড়ী ওর বাড়ীর ভেতর দিয়ে যাতায়াতের পথ। তা হোক রাস্তার চিন্তা রামুর, মোটর সাইকেল তার চাই—।

রামু আর দামু।

এক সময় ছিলো নিশ্চিন্তপুর গ্রামের দুই দামাল ছেলে। সাতক্রোশ দূরের ভিন-গাঁয়ের ফল পাকুড় পেড়ে তছনছ করতো কয়েক বছর আগেও। হরিহর আত্মা দুজন। ব্যথার ব্যথী সুখের সাথী। যদিও অবস্থার ফারাক বিরাট। রামু চাইতো উন্নতি করতে—অনেক, জগৎটাকে মুঠোয় আনতে। বড়লোকের ঘরের মেয়ে তার বৌ হোক। অনেক টাকা নগদ আসুক।

কোলিকাতায় না হোক জেলা শহরে একটা শৌখীন বাড়ী। যা-তা একটা মোটর গাড়ী। পিওন বাপের কারিগরী কর্মী সে। তার পক্ষে আশাটা বড়ই। কিন্তু দিনকাল পাল্টেছে। তাঁদের জাতের ছেলের উন্নতির জন্য ভালো চাকুরী আজ বাঁধা। তারপর বিয়ে—সে তো এখন অর্ধেক রাজত্ব আর পুরো রাজকন্যার সামিল!

কিন্তু দামু? গরীব সাপুড়ের ছেলে সে। বাপ কয়েকদিন আগেও সকালে ঝুপড়ি বেঁধে সাপ খেলা দেখাতে বেড়াতো। ফিরতো সাঁঝের অন্ধকারে। আকণ্ঠ তাড়ি গিলে। দামু অনেক চেষ্টা করেছে—বাপের পেশাকে ভুলতে, চেয়েছে—রামুর মত মানুষ হতে। পড়াশোনা করতে। অফিসে চাকরী করতে। কিন্তু পারেনি সে। বাপের সমস্ত রোজগারই গেছে তাড়ির পেছনে। মাকে তার মনেও পড়ে না। অস্থায়ী অনেক মা তার এসেছে। বাপের পয়সা ফুরোতে তারাও চলে গেছে। তাই শত ঘৃণা থাকলেও তাকে ধরতে হয়েছে সাপের ঝুরি। সুর করে বেহুলার গান। টাকা পেলে বিষাক্ত নিষ্ঠুর রাগী সাপও সে খুব তাড়াতাড়ি শিং-মাগুর মাছের মতো ধরে দেয়। এখন অবশ্য সে একটা নতুন ধান্ধা বাগিয়েছে। কোলকাতার হসপিট্যাল আর বড় কলেজগুলিতে সাপের জোগান দিয়ে। বনে জংগলে আস্তাকুঁড়ে যে চারা-গাছটা জন্মায়, সেও চায় ডালপালা মেলে বিরাট একটা গাছ হোতে। কী সুন্দর রামুর বৌকে দেখতে! কতো সুন্দর কাপড় আর গয়না সে পড়ে। তার যদি ও রকম বৌ-হতো একটা! সে যদি বিয়ে করতো! ঝুর্ ঝুর্ করে চালের পাতা থেকে পাঁচ বছরের আগের খড়গুলি ঝরে পড়ে। চিনির অভাবে লবণ আর দুধ-হীন চা-টাকেই নষ্ট করে দিলো।—শালা।

হেসে ধরতে পারে না, কেউটে ধরেলো! বুড়ো বাপকে একবার আক্তার দেখা। বুয়েলো তোর মরদ! শ্যালা বেজন্মা—

দারুন কাশির দমকে বাদ-বাকী কথা আটকে যায় দামুর বাপের। সত্যিই তো, গরীব তারা। তাদের এসব রাজসিক চিন্তা কেন? ভাংগা সানকীটা ধুতে পুকুর পাড়ে উঠে যায় দামু।

তাহলে অসম টাকা পয়সার মাপকাঠিতে দুটো মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব কীসের টানে? রামু আর দামু দুই অসম মানুষ। পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। রামুর টাকা আছে, সম্মান আছে ঘরে সুন্দরী বৌ। দামুর ও-সব কিছুই নেই। দামুর আছে অদ্ভুত কথা বলার ভংগী। একটাও গালাগালি না দিয়ে খুব ভদ্রভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতে পারা। চিন্তা করতে পারে সে কোনটা উচিৎ আর কোনটা অনুচিৎ সে ঠিক টের পায়। রামু শ্যালা আর চ-কার ম-কার ছাড়া কথা বলে না। গভীরভাবে সে চিন্তা করতে পারে না। কার্যকারণ সম্বন্ধে ঠিক ঠিক ধারণা করতে পারে দামু।

রামু ভয় করে দামুকে!

রামুর বিশ্বাস দামু টের পেয়েছে সেই হরিহর বিশ্বাসের মেয়েটাকে খুন করেছে। কারণ দরজা খুলে দামু চারদিক তাকিয়ে অনেকক্ষণ রামুর দিকে চেয়ে সটান ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো। রামু মনকে অনেক চোখ ঠাউরেছে। বারবার হরিহর বিশ্বাসের মেয়ে নিরালার কথা টেনেছে। কিন্তু বার বার সেই একই দৃষ্টি নিয়ে দামু তার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেছে। শুধু থতমত খেয়েছে রামু। প্রসংগ পাল্টেছে তৎক্ষণাৎ।

সেই দামু প্রেমে পড়লো!

শিমুল গাছটা সারা বছর গায়ে কাঁটা নিয়ে চুপচাপ এক পায় দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু তারও যৌবন আসে। বছরে একবার। বাড়ন্ত কালে সে ফুলে-রসে ফেঁপে ওঠে। রামুর ও প্রেম এলো জীবনে একবার!

যেতে চায়নি দামু।

চূর্ণি পেরিয়ে দু-ক্রোশ দূরের উমেশ সরকারের বাড়ীতে সাপ ধরতে। ঘৃণা করে সে বড়লোকদের। বিশেষ করে তাদের স্ব-জাতের বড়মানুষদের। খিঁচিয়ে উঠেছে দামুর বাপ—শ্যালা নালায়েক মাতবর হয়েল্য! কি নগী যাবা না তুমি? না-হোক কুড়ি গণ্ডা টাকা দিবেক। যা-শালা—

আর শোনা হয়নি। বাপের কাঁচা কাঁচা খিস্তি ভালো লাগে না তার।

শহর থেকে মরা সাহেবের প্যান্টটা অনেক কষ্টে দু'পায়ে গলিয়ে নিলো। অনভ্যাসের ফোঁটা কপালে চড়চড় করে। অন্য জায়গা হলে ছেঁড়া লুংগী মালকোঁছা মেরে নিতো। কিন্তু এ জোতদারের বাড়ী তিনতলা পাকা দালান। যে লোকটা খবর দিলো সেই বল্লো জোতদারের সোমত্ত মেয়েটাই না-কী সবচেয়ে বেশী ভয় পেয়েছে। নিরাশ হয় দামু। বড়লোকদের সোমত্ত মেয়েদের তার দিকে চেয়ে ফিক্-ফিক্ হাসি সহ্য করতে পারে না। কিন্তু না গিয়েই বা কী করবে? শীতকাল আসছে। শীত-কাতুরে সাপগুলি যেন খুপরি থেকে বেরোতেই চায়না। বেরোলো তো নাচতে চায় না। বাপের গাঁজার পয়সা জোগাতে হবে। পোড়া পেটও তো দু-দুটো। রামুর অনেক দিনের আগে দেওয়া চক্কর-বক্কর বুক খোলা জামাটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে রওনা দিতে গিয়ে চট্ করে একমাত্র ভাংগা আয়নাটায় নিজেকে দেখলো। কেউ কোনোদিন তাকে কুৎসিং বলেনি। কিন্তু এখন সে রূপ যেন অনেক, অনেক বেড়ে গেছে। শুধু মুখে যা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কী আর করা যাবে এ-অবেলায়। অগত্যা মধুসূদন বেরিয়ে পড়লো সে।

অনেক পথ পেরিয়ে এক হাঁটু ধুলো নিয়ে সে যখন উমেশ সরকারের বাড়ী পৌছালো—তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল কখন যে একটা দুটো করে শাঁখের আওয়াজ আর পট্-পট্ করে মস্ত বড় তে-তলা বাড়ীটার লাইট জ্বলতে আরম্ভ করেছে বিস্তর সাপের খোঁজা-খুঁজিতে খেয়াল করেনি সে।

আবার খোঁজাখুঁজি করলো দামু। নিরাশ হলো। সাপের চিহ্ন কোথাও নেই। বাঁশের হাতল দেওয়া খন্তা শাবল দিয়ে অনেক ঠোকাঠুকি করলো। কোথাও একটু ফাঁপা নেই—গর্ত-তো দূরের কথা। শান বাঁধানো ঘরের উঠোন যেন পাথর। বাড়ীর পেছন দিকটায় কলা গাছের ঘিঞ্জি জংগল। শাবোল চালালো। কোথাও নেই ভুসভুসে মাটির বা উই ঢিপি। নিজের ভাগ্যকে অভিশাপ দিলো একসময়। হতচ্ছাড়া একটা গর্ত যদি পেতো যার ধারটা মসৃণ আর তেলতেলে। পেলো অনেক গর্তই। কিন্তু সবই ইঁদুর আর ছুঁচোর সদ্য তৈরী করা। কল-পারে গিয়ে মুখ হাত পা ধুতে ধুতে ভাবছিলো সরকার মশাই আর ক-টাকাই বা দেবে। এই কয়েক ঘণ্টা ঘাঁটা-ঘাঁটির জন্য। এই সময়ই চিৎকারটা উঠলো—

তেতলার টং-এর ঘর থেকে একটা মেয়ের করুণ আর্তনাদ—সাপ! সাপ! বাঁচাও!!

দিক্-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুট দিলো দামু বাড়ীর দিকে, বাঁ-হাত সিঁড়ি দালানে উঠেই। আগেই লক্ষ্য করেছিলো সে। তর-তরিয়ে উঠে গেলো। চৌকাঠ ডিংগিয়েই থমকে দাঁড়ালো। এলো চুলে বুকের কাপড় খসিয়ে একটা সোমত্ত মেয়ে দাঁড়িয়ে। ইতস্ততঃ করলো। চিন্তা করলো সে। মেয়েটাকে ডাকলেই ছোবেল খাবে। পা টিপে টিপে কাছে গিয়ে ধাক্কা দিতে চাইলো সে। কিন্তু তার আগেই ছোবল দিয়েছে কালো কেউটে-টা! টানতে গিয়ে মেয়েটা অহেতুক ভয়ে জড়িয়ে ধরেছে কখন। টাল সামলাতে না পেরে হুড়মুড়িয়ে পড়লো দুজন। উঠে যখন দাঁড়িয়েছে দামু সব অপমান লাথি ঝাঁটা খাবার জন্য তৈরী। কিন্তু অবাক হলো সে—বাঁচালেন তুমি– মানে আপনি। আচ্ছা ওটা কী সত্যিই ছোবল মারতো? কিন্তু আপনি কে?

—সাপুড়ে। আপনাদের বাড়ী সাপ ধরতে এসেছি। প্রচুর ঢোঁক গিল্লো দামু। মেয়েটাও ততক্ষণে গুছিয়ে নিয়েছে। সাপটা তখন কুলংগীর উপর আস্তে আস্তে দুলছে। কুলংগীতে রয়েছে মেয়েদের স্নো পাউডার, কাঁটা সেণ্ট—সব টুকিটাকি। পাশেই আধমানুষ সমান একটা আয়না। বুঝলো ব্যাপারটা। মেয়েটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হয়তো কিছু করছিলো। কুলংগীতে হাত বাড়াতেই সাপটা ফোঁস করে উঠেছে। এই সাপটার জন্যই সরকারবাবু তাকে এনেছে। কাছে অনেকটা এগিয়ে গেছে দামু। দূরত্বটা ঠিক হয়েছে। এবার কেবল হাতের মোচড়ে ফিরে সাপুড়ের মতো কায়দা মাফিক চেপে ধরা।

না, পারলো না! মেয়েটা হঠাৎ-ই চিৎকার করে উঠলো। তাকে সাবাধন করতেই চাইছিলো। কিন্তু হঠাৎ ঘুরে তাকাতেই ছোবল বসিয়ে দিয়েছে কাল-কেউটে। একদম তর্জনী আংগুলে। হ্যাঁ, অবাক হবার সুযোগে সবটুকু বিষ ঢেলে দিয়েছে। ও-তো ওখানে খোলস ছাড়তেই ঢুকেছিলো।

—না, না, তাকে বাঁচতে হবে, একটা কিছু উপায় করতেই হবে। বাঁ-হাত দিয়ে ডান-হাতের তর্জনী জোরে চেপে ধরেছে। মেয়েটার সাড়ীর পার ছিড়তে বলতে পারতো কিন্তু দেরী হয়ে যাবে। এবং তখনই চোখে পড়লো মাথার ওপর ফ্যানটা ঘুরছে। দূরত্ব আন্দাজ করে একটা মরণ লাফ দিলো। দুটো গাঁট নিয়ে ডান তর্জনীটা কেটে বেরিয়ে গেলো। ফ্যানের ব্লেডের সংগে তর্জনীটা কিছুক্ষণ ঘুরলো। আশ্চর্য্য! মেয়েটার মাথায় সিঁথির ওপর বেয়ে কপাল দিয়ে ঝপ করে মেঝেতে গড়িয়ে পড়লো একসময়। একদৃষ্টে দেখলো সরকারদের ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটার দিকে। যেন সুন্দরী একটা বৌ সিঁথির

সিঁদুর কপালের এঁশোতির চিহ্নের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে কেমন নাক বেয়ে চলে গেছে! সুন্দর রূপ একরাশ এলোচুলের পটভূমিকায়। মাথাটা ঝিম-ঝিম করে উঠলো দামাস ছেলে দামুর! জ্ঞান হারাবার আগে আরেকবার দেখলো—মেয়েটা কী-রকম অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে কাঁদছে। জ্ঞান হারালো তখনই!

জ্ঞান ফিরতে দেখলো আবার সেই মেয়েটাকে। অবাক হলো দামু। মেয়েটা কী সারা জীবন তার দিকে অমন করে তাকিয়ে থাকবে? চারদিক তাকালো। অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করলো। একটা ধপ্ধপে সুন্দর বিছানায় শুয়ে আছে সে। তার ডান হাতে ব্যাণ্ডেজ। মেয়েটার কপালে আর সিঁথিতে নেই রক্তের প্রলেপ। একটা দোয়েল যেন শিস দিয়ে উঠলো,—আপনি ভালো বোধ করছেন তো? ঘাড় নাড়লো সে। অবাক হয়ে ভাবছিলো দামু মেয়েটা কেন ঐ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। ঐ রকম ভাবেই তো দেখে তার বন্ধু রামুর বৌ-রামুকে।—হ্যা খুব ভালো, অনেক ভালো। আচ্ছা আপনি অমন চিৎকার করে উঠলেন কেন? মাথাটা নীচু করলো সুন্দরী মেয়েটা। লাল হলো ধপধপে ফর্সা মুখ। আবার শিস্ দিলো দোয়েল,—আমার কপাল!

থলথলে ভুঁরি চাপড়াতে চাপড়াতে ঘরে ঢুকলো পরের দিন সকালে জোতদার উমেশ সরকার। ক্যাটক্যাটে গলায় বল্লো,—আমার মেয়ের জীবন বাঁচিয়েছে তুমি। জানি তোমার ঋণ শোধ করতে পেরবো না। এই রাখে শতেক টাকা। জীবনে কখনো একশো টাকার নোট দেখেনি দামু আর জীবনে এই প্রথম মিথ্যা কথা বল্লো,—কিন্তু সাপ?

ঘরে ফ্যান ঘুরছিলো। তবুও স্বভাব দোষে কাঁধের গামছা ঘুরাচ্ছিলো উমেশ সরকার। এক গাল হাসলো। যেন পাঁকা তরমুজ ফেটে এক গাদা তরমুজ বীচি বেরিয়ে পড়লো,—ও তুমি ভয় করোনিকো। আমার মাহেন্দরে ওনাকে নিকেশ করেছে। তুমি বাবা ভ্যালা-ভ্যালা বাড়ী পেলয়ে যাও।

—না, না আমি ওটার কথা বলছি না। আমি বলছিলাম! কলা বাগানে সাপের কথা!

—কী বলতে নেগেছো তুমি!

ঢোঁক গিল্লো দামু। কথাটা কাজের হয়েছে। চেষ্টা করলে সেও রামুর মতো চটপট মিথ্যা বলতে পারে। বল্লো—হ্যা, আমি দেখেছি, কলার বাগানে বেশ কয়েকটা সাপ। ওদের যদি—ওরে বাপরে, উমেশ সরকার একটা

তেড়ে তুড়ি-লাফ দিলো। মনে হলো যেন সাপটা ওর পাছা থেকেই বেরোলো। অনেক কষ্টে হাসি চাপলো দামু। উঠে পড়ে উমেশ—বেশ, যা ভ্যালা বুয়েছ করো, কিন্তুক সবকটা ধরি দিবা।

গুটি-গুটি পায়ে নীচের দিকে বিস্ফারিত চোখ করে উঠে পড়লো উমেশ। গভীর চিন্তায় ডুবে গেলো দামু। আশ্চর্য এই বাড়ী! ঐ মেয়ে, ঐ বাপ! আর তার নিজের বাপ? ঝুর-ঝুর চাল ওলা কাদা মাটিতে খেজুর গাছে মাখিয়ে ঘর। কী করবে সে? কিন্তু ঐ মেয়েটা—ঐ ফরসা, সুন্দরী ভরা যৌবনের কুমারীটা তার দিকে বার বার অমন করে তাকায় কেন?

হ্যা, বেশ কয়েক দিন পর পর-ই দামু উমেশ সরকারের বাড়ী এসেছে। সাপ একটাও ধরতে পারেনি। সাপ থাকলে তো ধরবে? নিজের ঝোলার ভেতর থেকেই সাপ বার করেছে। পর পর পাঁচ দিন পাঁচটি সাপ সে ধরে দেখিয়েছে। নির্বিষ সাপগুলির ছোবল ইচ্ছে করেই নিজের হাতের ওপর খেয়েছে। কারণ সে যে ওপরের জোড়া-সন্ধ্যা-মালতী ফুল থেকে শিশির ঝরা দেখতে চায়। সত্যি, যখনই দামু সাপের কামড় খায়—কেঁদে ফেলে ক্ষমা। অনেক দিন পরে সে মেয়েটার নাম জানতে পেরেছে - ঐ সুন্দরী উমেশ সরকারে মেয়েটার নাম ক্ষমা। হেঁপোরুগী তাড়ি খোর ঘাটের মরার সাপুরে ছেলের দৈন্য দশা মেয়েটি কী দয়া করবে? জানে না দামু।

পুরুষ সে—সে চায় নারী তাকে দেখে মুগ্ধ হোক! মুগ্ধ হয়েছে ক্ষমা। কিন্তু মা মনসার এ-কী লীলা। কেন তার দেহের রক্ত মেয়েটার সিঁথি-কপালে গিয়ে পড়লো! দামু বই পড়ে জেনেছিলো—অনেক যুগ আগে তাদের পুরুষরা মেয়ের বাপের রক্তে মেয়ের সিঁথি আর কপালে রক্ত তিলক এঁকে দিতো। রক্ত তিলক বিদেশী ফিরিংগীরা বরদাস্ত করেনি। তাই আজ সিঁদুরের রেওয়াজ।

ঝোলার সাপ হাত সাফাই করে ধরতে আর কতোক্ষণ লাগে? বড় জোর দু-তিন মিনিট। বাকী সময়টা সে ধরা সাপকে নানা ভাবে খেলায় খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে। অদ্ভুৎ সুর করে বেহুলার-ভাসান পালা গায়। হিন্দী সিনেমার হিরোর মতো নানা অংগ-ভংগী করে হিন্দী গান—সফেরা বিন্ বাজাও, বিন বাজাও—অবশ্য নির্বিষ সাপগুলির মিথ্যা বিষদাঁত তুলে।

কিন্তু ধরা পড়া গেলো দামু। খুব সাহস করে তে-তলার টংয়ের ঘরে ক্ষমাকে সাপ দেখাতে গিয়েছিলো একদিন। নিবিড়ভাবে ক্ষমা বলেছিলো—ভারী

সাহস আপনার! যদি সাপটা ছোবল দেয়? হাসতে হাসতে সাপটার মুখে চুমো খেয়ে বলেছিলো—

—না দেবেনা। আজ আমি কাউকে ভয় পাই না। কেউ আমার ক্ষতি করতে পারবে না।

—ওরে বাপরে! খুব যে বীরপুরুষ দেখছি।

—হ্যা, আপনি বল্লে আপনাকে নিয়েও আমি পালিয়ে যেতে পারি! আমি—

আর কিছুই বলতে পারলো না দামু। ঘরে থপ্ থপ্ করে ভাল্লুকের মতোই ঢুকলো উমেশ সরকার। তিনতলায় উঠেছে। ভাল্লুকের মতোই হাঁপাচ্ছে—।

অকথ্য-ভাষায় গালি দিলো জোতদার সরকার। ভদ্রতার মুখোশ সরিয়ে দু-ঘা বসিয়েও দিলো। দীন-হীন তারই স্বজাতি দামুকে।

ক্ষমার দিকে তাকালো দামু। সে-ই করুণ চোখ। সন্ধ্যামালতী ফুল জোড়া শিশিরে ভেজা!!

সব অপমান মাথায় নিয়ে চলে গেলো দামু উমেশ সরকারের বাড়ী ছেড়ে। আর সে কোনোদিনই সাপ-খেলা দেখাতে এলো না।

উমেশ সরকারের বাড়ী ছাড়লেও ক্ষমাকে ছাড়েনি দামু! ক্ষমাও না। ক্ষমার কলেজে যাবার পথে, নৌকাতে নদী পারাপারে আড়ালে আবডালে যখনই সুযোগ পেয়েছে ক্ষমাকে দেখেছে। ক্ষমাও মেয়েদের সত্তার আকুতি জানিয়েছে। সে আসুক—কথা বলুক। এমন-কী আনমনাভাবে যেতে-যেতে চিঠিও দিয়েছে। কিন্তু কথা বলতে বা চিঠি দিতে সাহস হয়নি দামুর।

তার আর ক্ষমার মধ্যে ফারাক যে অনেক। কী করে সম্ভব হবে সেই অসম্ভব। ক্ষমা জানিয়েছে চিঠিতে সে তাকে ভালবাসে। ক্ষমা তাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত!!

ঠাণ্ডা হয়ে গেছে দামু। সাপের বিষ-থলি বার করবার ছুরিটা নিয়ে সে শুধু নিজের হাতের চামড়া কেটে কেটে লিখেছে—আমি তোমাকে ভালবাসি! অনেক রক্ত দিয়েছে দামু ক্ষমার জন্য। হাতের তর্জনী কেটে আর এখন চামড়ায় রক্তের আলপনা এঁকে।

কিন্তু বিয়ে অসম্ভব! স্বর্গের দেবীকে আস্তাকুঁড়ে সে ফেলতে পারে না। সাপের সঙ্গে সে লড়াই করতে পারে কিন্তু মুখ ফুটে সে বলতে পারবে না উমেশ

সরকারকে যে—আমি—আপনার মেয়েকে বিয়ে করবো। ভয়?—না। তার পৌরুষকারের পরাজয় সে হ'তে দেবেনা।

এখন থেকে দামু ক্ষমার কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। আগে সমস্ত দিনে একবার ক্ষমাকে দেখলেই পরম সুখ পেতো। চরম নিশ্চিন্ততায় ভরে থাকতো তার মন। আর আজকাল? দেখা-ও করতে পারে না ভুলতে তো পারে না। শোওয়া-বসা-ওঠায় সব-সময় কায়াহীন ক্ষমা তাকে যেন নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরেছে। পাগল হয়ে যাবে না-কী সে?

না পাগল হলো না পালিয়েই গেলো! বাংলাদেশে আরেকটা সাপুড়ের দলে মিশে বরিশালের জল-জংগল দেশে দামী দামী সাপ ধরতে ছুটে গেলো সে। জীবন আজ তার কাছে শূন্য। সাপে যদি তাকে কাটে তো কাটুক!

সাপে তাকে কিন্তু কাটলো না। ধরা পড়লে সে বাংলাদেশ পুলিশের হাতে! বিনা ছাড়পত্রে ও দেশে ঢুকেছিলো বলে।

বছর তিনেক পরে অনেক ঘাটের জল খেয়ে যখন সে নিশ্চিন্তপুরে ফিরলো বেশ পরিবর্তন হয়ে গেছে তখন গ্রামের। চরম অভিমানে তার বন্ধু রামুকে বিয়ে করেছে ক্ষমা। অনেক যৌতুক পেয়েছে রামু। শ্বশুরের একমাত্র জামাইকে দেওয়া মোটর সাইকেল ভটভটিয়ে যত্র তত্র ঘুরে বেড়ায় রামু! বেশ পরিবর্তনের মধ্যে নিশ্চিন্তপুর গ্রামে পঞ্চায়েত থেকে মাটির রাস্তা দু-মাইল দূরের পাঁকা রাস্তায় মিশেছে। সেই রাস্তায়-ই দাপিয়ে বেড়ায় রামু। শ্বশুরের দেওয়া মোটর বাইকে চেপে।

বিয়েটা কিন্তু হঠাৎ-ই হয়নি। তক্কে-তক্কে ছিলো রাঘব বিশ্বাস। প্রথমবারে ঘটক-কে পত্রপাঠ বিদায় জানিয়েছিলো জোতদার উমেশ সরকার। কারণ ক্ষমা দোজপক্ষে রাজী হওয়ার আশা করেনি উমেশও। এমন ভালো ছেলে সে কোথায় পাবে? ভালো সরকারী চাকরী করে। দিনকাল 'পাল্টেছে' এখন। দু-এক বছরের মধ্যেই গেজেটেড অফিসার হবে জামাই। দোজপক্ষ?—তা হোক! আগের পক্ষে কোন ছেলে-পিলে নেই। শ্বশুরবাড়ী হবে কাছে। শিক্ষিত আইবুড়ো কোনো বোনের ঝকমারি নেই। তবে? তবে চিন্তার কথা হলো আগের পক্ষে বৌটা আগুনে পুড়ে মরলো কেন?

কিন্তু শেষমেষ কোনো বাঁধাই টিকলো না যখন দামু দিনের পর দিন ক্ষমার সঙ্গে দেখা করলো না। আর একদিন হঠাৎ-ই কাউকে না বলে কয়ে দামু দেশান্তরী হলো। মনে মারাত্মক আঘাত পেলো ক্ষমা। প্রতিদানে দিলো ও

চরম আঘাত। রামুকে সে বিয়ে করলো অঝোর-ধারা কোনো এক শ্রাবণের গোধূলি লগ্নে।

কিন্তু ক্ষমাও টিকলো না রামুর কপালে। চুর্ণি-তে রামুর সংগে নৌকা চড়তে গিয়ে নৌকাডুবি হলো!

অবস্থা রামুদের অনেক ভালো হয়েছে। বাড়ী এখন তাদের তে-তলা। জোত-জমিও প্রায় বিঘে পঞ্চাশেক! শ্বশুরের সম্পত্তি অনেকটা বাগিয়ে নিয়েছে ক্ষমা মরবার আগেই।

কোলকাতা থেকে একটা বিরাট গাড়ী এসেছিলো রামুদের বাড়ীতে রামুরই সম্বন্ধে। কোলকাতার বনেদী বড়লোক। বিরাট মদের কারবারী। মেয়ে কুরূপা হোক। পড়াশোনা থ্রি-ফোর। বেঁচে থাক। অফিসে তো তোর ছেলের বৌ কলম পিষবে না। ভাবছিলো রামুর মা। অনেক পরিবর্তন হয়েছে রামুর মারও। এখন সব সময় ব্লাউজ পরে, কালে-ভদ্রে ভেতরে ছোটো-জামা। কিন্তু ডাকিনী যোগিনীকে যদি ছোটো-জামা পরানো হয়—বাগ মানবে কী তাদের অশান্ত বুক-জোড়া। রামুর মারও সেই দশা। গরমের জন্য তে-তলায় ঝুল-বারান্দায় উদমগায়ে মোটা একটা গামছা তলপেটের নীচে জড়ো করে কথা বলছিলো কর্তার সঙ্গে—কী বয়েলো মিন্সেগুলি? মরে যাই, মরে যাই, মাগীটার চলানি? ও বলে কণের দিদি! হ্যাগা, ও কী বিধবা না নাইনে নাম লেখানো? ছোটো করে চুল কেটেছে? মাথায় সিঁদুর খোঁজো—আমাদের কামাল বকনটাকে জংগলে খোঁজার চেয়ে কঠিন। রামুর বাবা এক-কালের পিওন, এখন অবসর নেওয়া বাবু রাঘব বিশ্বাস, হুইস্কিতে চুমুক মারছিলো। এখন আর তার তাড়িতে নেশা শানায় না। রাঘব খিঁচিয়ে উঠলো—চুপ মার মাগী! মুই ভাবতে নেগেছে হেথায় বিয়ে বসাবো কী-না। উনি সাতকাহন গাইতে নেগেছেন—

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো রামুর মা। এলোমেলোভাবে ব্লাউজ আর শাড়ী পরতে পরতে বলতে লাগলো—ঘাটের মরা—আগের দু-দুটো বৌ মরেলো। কোন্ আভাগীর বেটা ঐ বৌ-কাটকী ছ্যালার সঙ্গে বিয়া দিবে?

—চুপ মার ঢেমনী! ও-রকম সরকারী পৈতে-ওলা লোকের সংগে বিয়ার লিগা অনেক ছুঁড়ি গা ধুয়ে বসে আছে। শুধু মুখের কথাটা খসাতে যা।

দামুর সেই একই কাজ। দিনগত পাপক্ষয়। বুড়ো বাপ সে জয় বাংলায়

যাবার পরেই—নদীতে ডুবে মরেছে। সংসারের নেই কোনো পিছু-টাণ। জীর্ণ শরীটা শুধু বয়ে বেড়ানো। কিন্তু মৃত্যুও তার কপালে নেই। গভীর চিন্তায় ডুবেও সে সাপ ধরার কাজ করে গেছে। আশ্চর্য একদিনও সে সাপের কামড় খেলো না।

শিয়ালদা থেকে এগারটার লালগোলা পাবে না পাবে না করেও পেয়ে গেলো দামু। প্রচণ্ড ভীড়। ঝোলায় বিষধর সাপটাকে নিয়েই ভয়। ভীড়ের চাপে হাঁড়ি না ভেঙে যায়। সাপ বেরোলেই কেলেংকারী। সাপটার বিষ কোনো কলেজেই সেদিন নিলো না। পাঁচদিন পরে আসতে বলেছে। কিন্তু এ-কদিন চলবে কী করে?

নৈহাটিতে জায়গা পেলো। ঠেলেঠুলে বসেই ভীষণ চমকে গেলো। সামনেই তার প্রাণের বন্ধু রামু। কতোদিন পরে দেখা? হিসেব নেই! ভীষণ জ্বালা ধরেগেলো দামুর মনে। দু-দুটো মেয়ে-মানুষের খুনী তার সামনে বসে! আবার আরেকটা বিয়ে করতে চলেছে। বিয়ে ওর ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর কতো চায় ও? জোত-জমি গাড়ী-বাড়ী সবই তো পেয়েছে! এখন আবার বড়-মানুষী চাল দেখাতে নতুন বিয়ে করে কোলকাতায় বাস করতে চায়! অসম্ভব! ক্ষমা মরেছে ওরই জন্য! রামুকে খুলে বলেছিলো ক্ষমার কথা। তার চিঠির কথা। সেই রামুই কী-না বিয়ে করলো ক্ষমাকে—তার অনুপস্থিতে। বেশ করেছে বিয়ে করেছে। তাই বলে খুন! দয়া নেই, রামুর। হঠাৎ দামুর মনে হলো তার গায়ে একটা তেঁতুলে বিছে উঠেছে। খুব সন্তর্পণে ওকে নামাতে হবে। তারপর পা-দিয়ে থেতলাতে হবে একসময়। কিন্তু খুব সতর্ক। একটু বেচাল হলেই কামড়। মরণ কামড়।

কী-ভাবে সাফাই দেবে ভাবছিলো রামুও। খুব চালাক ছেলে দামু। ওর প্রথম বৌয়ের মৃতদেহ দেখে দামুর অদ্ভুত দৃষ্টি। সেটা-কী ভর্ৎসনা, ধিক্কার, ঘৃণা না বিজাতীয় হিংসা? গভীর চিন্তা করতে পারে দামু। অনেক কিছু সকলের কাছে এড়িয়ে গেলেও—দামুর কাছে সহজেই ধরা পড়ে! ক্ষমার মৃত্যু সেটার কী ব্যাখ্যা দেবে রামু? সেটাও কী বুঝতে পারে না যে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে রামু! চরম বিশ্বাসঘাতকতা। গভীর ভালোবাসতো ক্ষমাকে দামু। বিয়ে করা অসম্ভব। তবু তো সে প্রেমিক। আকাশের চাঁদ সকলেই চায়—পাক বা না পাক।

মা-বাবার যেন লোভের শেষ নেই। যথেষ্ট হয়েছে আর না। কতোবার বলেছে সে। না তবু তাকে বিয়ে করতে হবে। আর এই শেষ বিয়ে। বাড়ী-ঘর-জায়গা-জমি সব লাখ-তিনেকে বিক্রী করে কোলকাতায় বাস করবে তারা। আজ তার সর্বদাই এই চিন্তা।

এক-নাগাড়ে চলমান গাছের সারির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একসময় ঘাড়টা টন্-টন্ করে উঠলো রামুর! বিবেককে আর টুটি টিপে রাখা গেলো না। মুখ ফেরালো একসময়। বগীটা একদম ফাঁকা। এই গাড়ীটা নৈহাটি কাঁচড়াপাড়ার পর খালিই যায়। করুণ হাসির চেষ্টা করলো রামু—কীরে শালা কেমন আছিস্? অনেকদিন পরে দেখা তাই না!

বিছেটা কতোদূর উঠলো বেয়ে? না এখনো ঝেড়ে ফেলার সময় হয়নি। তড়বড় করার সময় এ নয়। বল্লো—একরকম হ্যাঁ অনেকদিন পরেই দেখা হলো। জেঠামশায় জেঠিমা সব ভালো তো?

—ভালো নয়। বাবার প্রোষ্ট্রেট গ্ল্যাণ্ডটা বেড়েছে। ভাবছি কোলকাতায় পি জি-তে অপারেশন করাবো। তুই বোধহয় বুঝবি না—আমি এখন ক্লাশ-ওয়ান গেজেটেড। বিয়েটা হয়ে গেলেই বিলেত ঘুরে এসে ডাইরেক্টর হয়ে যাবো। জানিস্ তো এখন আমাদের যুগ।

নিজেকে খিস্তি দেয় রামু। কেন মরতে 'বিয়ে' কথাটা বলতে গেলো। হাত থেকে ঢিল বেরিয়ে গেছে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। ধিকি ধিকি জ্বলছিলো কাঠ-কয়লার আগুনটা। কে যেন পেট-ফোলা ব্যাগ থেকে দিলো হাওয়া। জ্বলে উঠলো দামু,—বিয়ে করছিস্ আবার? দু-দুটো বৌকে খুন করে তোর আশ মিটলো না। আরেকটা অসহায় মেয়েকে কীভাবে মারবি এবার?

—কী বলছিস্ তুই ড্যাকরা?

—ঠিক বলছি। শোন্ প্রথম বৌকে তুই গলায় ফাঁস দিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় মেরেছিলিস?

—তাহলে আমি ভগবান বল। লোকে জানে আমার বৌ ঘরে ছিটাকিনি দিয়ে ভেতর থেকে কেরোসিন তেলে আগুন দেয়।

—হ্যাঁ পুলিশ অবশ্য তাই বুঝেছিলো। কিন্তু আমি তা বুঝিনি। তোদের ঐ ঘরটার ছিটকিনি ছিলো ঢিলে। একটু আলগাভাবে তুলে টেনে দরজা বন্ধ করলেই—বাইরে থেকেই দরজা বন্ধ করা যায়।

ভীষণ ক্ষেপে যায় রামু। চিৎকার করে ওঠে সে মুখ খারাপ করে। গায় ঠেসে ধরে। বুদ্ধিমান লোক হলে চেপে যেতো। কিন্তু একে বলে গোঁ। আর সেই গোঁর জন্য ওরা বিখ্যাত। এককালে বোধহয় একেই বলা হতো চণ্ডালের রাগ,—প্রমাণ, প্রমাণ যদি না দিতে পারিস্ টিপে মেরে ফেলবো তোকে—

—প্রমাণ দুটো। ঘর ভেংগে প্রথমে আমিই ঢুকি। ঘরের চারদিক তাকাতেই বিছানার কাছে টেবিলের ছাইদানিতে একটা অনেকক্ষণ ধরে পুড়ছে এমন একটা সিগারেট পাই। দ্বিতীয় প্রমাণ—যে দড়িতে গলায় ফাঁস দিয়েছিলি সেটা সরাতে পারিস্নি। গলায় আটকানো অবস্থায় পুড়িয়েছিলিস্ ওকে। তাই ছাই হলেও ওটা যে দড়ি সেটা বোঝা যাচ্ছিলো। তুই-ও সেটা বুঝেছিলিস্। আমি ঘরের অন্যদিকে যেতেই সেই দড়ির ছাই তুই গুঁড়িয়েছিলি। আর, সেইদিন থেকেই তুই হারালি আমাকে। আমি তোকে!

জোঁকের মুখে যেন নুন পড়লো। আক্রমণ করার জন্য সজারুটা—সব কাঁটা মেলে ধরেছিলো। তারপর গুটিয়ে নিলো নিজেকে।

দুজনেই চুপ। অনাবশ্যক ভাবে দুই বিপরীত জানলায় গভীর মনোযোগ দিয়ে গাছপালা দেখতে লাগলো। শিমুরালি পার হলো। পানের বুরুজগুলির অন্ধকার স্নিগ্ধ-ছায়ার কথা ভাবলো দু-জনেই। দুই প্রাণের বন্ধুর চিন্তাধারা এখন এক। দুজনেই ভাবছে ক্ষমার কথা। এ-কী দামু কাঁদছে! কাঁদতে চায়নি দামু। ক্ষমার সন্ধ্যামালতীর দুই ফুলে কেমন ভোরের শিশিরের মতো চোখের জল গড়িয়ে পড়তো—ভাবতে গিয়েই টপ টপ করে তার চোখে জল বেরিয়ে পড়লো।—তারপর তুই ক্ষমাকেও খুন করলি—

অদ্ভুৎ ঠাণ্ডা রামুর গলা—কেন খুন করবো আমি ক্ষমাকে?

— তোর, তোর বাবা মার টাকার নেশায় পেয়ে গেছে বলে। সিঁড়ি দিয়ে ধাপে ধাপে তুই আর বড়লোক হতে চাইলি না। কলের খাঁচা কী যেন বলে ওকে কোলকাতায় বড় হাসপাতালে আছে—লিফট্।

—হ্যা লিফটে চড়ে তোরা বড়লোক হতে চাইলি! এ-তো বেশ মজার নেশা—টাকাকে টাকা অথচ বিন্দুমাত্র কেউ সন্দেহ করে না খুনের ব্যাপারগুলো।

অনেক দূর থেকে কোনো মরা মানুষ যেন কথা বলে উঠলো—কীভাবে আমি ক্ষমাকে খুন করলাম।

—কীভাবে ?—আমি অনেক ভেবে বার করেছি ব্যাপারটা। তারপর ক্ষমার মরার সময় যারা কাছে ভিতে ছিলো প্রশ্ন শুধিয়েছি তাদের। মিলে গেছে আমার চিন্তার সঙ্গে ব্যাপারটা।

ব্যাপারটা হলো। তুই ক্ষমাকে নৌকা চড়াবার নাম করে মাঝ নদীতে নিয়ে যাস্। কোনো একসময় ক্ষমাকে অন্যমনস্ক করে—বৈঠা দিয়ে মাথায় আঘাত করতে চাস্। কিন্তু মারটা জোরে হয়ে যায়। ক্ষমার মাথায় বেশ লম্বা একটা থেৎলানো জায়গা হয়ে গেলো আঘাতে। নৌকাটা উল্টে দিলি তুই। বাঁচবার কোনো সুযোগই হতভাগীকে দিলি না। হৈ-চৈ চেঁচামেচিতে যখন লোক এলো নৌকা-চাপা ক্ষমা তখন নদীর তলায়।

—পুলিশ কী এতোই বোকা।

—না পুলিশ খুবই চালাক। তারা জানতে পেরেছিলো ক্ষমা ভালো সাঁতার জানে।

— তাহলে সন্দেহ এলো না কেন ?

—তারা সন্দেহ ঠিক করেছিলো। কিন্তু তুই ইঞ্চি প্রতি হাজার টাকা কাটা ঘায়ের জন্য দিয়ে পুলিশের মুখ বন্ধ করে দিস্। কথা আর এগোলে না। হুড়মুড়িয়ে লালগোলা প্যাসেঞ্জার রাণাঘাটে ঢুকলো। দূরের যাত্রীরা কোনো সময় দিলো না। ঝপা-ঝপ উঠে পড়লো। রামুরা এক নিরিবিলি কোনে বসে ছিলো। রামুর পোষাক আর দামুর চেহারা দেখে এগোলো না সেদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে পড়লো তারা। ট্রেনটা কয়েকমাস হলো দেওয়া হয়েছে। ফাঁকাই যায়।

দুই বন্ধুর একই চিন্তা। শত্রুরকে বাঁচতে দেওয়া যায় না। রামু ভাবে দামু খুব বেশী জেনে গেছে। ভগবান না করে নতুন বৌ যে হতে যাচ্ছে কিছু হলেই ঠিক ফাঁসিয়ে দেবে ব্যাটা।

দামু ভাবে এতো পাপ ধরিত্রী মা সহ্য করতে পারবেন না। তার ক্ষমাকে সে কেড়ে নিয়েছে—বাঁচার তার অধিকার নেই। আর কতো নিরীহ মেয়ের সর্বনাশ করবে এই শয়তান! পুলিশে যদি যায় ? এতোবড় অফিসারের কথা ফেলে তার মতো নগণ্য সাপুড়ের কথা শুনবে পুলিশ! পাগল না কী ? সবচেয়ে বড় কথা প্রমাণ, প্রমাণ কোথায় ? সুযোগ চাই কিন্তু, কীভাবে সুযোগ নেওয়া যায়। সেই সুযোগই তারা পেয়ে গেলো। হঠাৎ ঘোষণা হলো মাইকে—"ডাউন শান্তিপুর ও ডাউন কৃষ্ণনগর না এলে আপ লালগোলা ছাড়বে না।"

দুজনেই চিন্তা করলো। ইঞ্জিন পাল্টাতে পনেরো মিনিট। আর দুটো গাড়ী আসতে এবং যেতে আরো পনেরো মিনিট। একুনে আধ ঘণ্টা।

রামু দ্রুত চিন্তা করলো রাণাঘাটে সবচেয়ে বড় ওষুধের দোকানের মালিক মুখার্জীবাবু। এককালে সে রাণাঘাটের ওষুধের দোকানগুলি পরীক্ষা করতে আসতো। ওষুধের দোকানের মালিকদের হাড়হদ্দ জানে সে। মুখার্জীবাবু থাকে মেসে। বিষজাতীয় ঔষধ থাকে তার বিছানার ওপরে একটা কেসে। শো-কেসের চাবি থাকে বালিশের তলায়। মেস এখন ফাঁকা। সব মেম্বাররা যে যার ধান্দায়। ঠাকুর বেটা রান্নাঘরে নাক ডাকাচ্ছে। তাঁকে ভালোই চেনে। দেখলেও কিছু বলবে না। এ-সুযোগ ছাড়া যায় না। ষ্ট্রিকনিন—ষ্ট্রিকনিনই ভালো হবে একে ঠাণ্ডা করতে।

সব-দিক চিন্তা করে মুখ খুল্লো রামু—তুই একটু বস্ আমি একটু ষ্টলে চা খেয়ে আসি। ব্যাগটা দেখিস।

দামু-ও তাই চাইছিলো। সময় দিলো। ব্যাগ হাতড়ালো রামুর। না, ব্যাগে ছোরা পিস্তল কিছু-ই নেই। কিছু টাকা আর উটকো কাগজের ঝামেলা। নিশ্চিন্ত মনে ঝোলা নিয়ে সে বাথরুমে সেধুলে।

ঝোলার সাপটাকে মেরে ছোট দুই সিসি সিরিঞ্জে বিষ ভরে নিলো। ক্ষমাকে বাঁচাতে যে তর্জনীটা বিসর্জন দিয়েছিলো—সেখানেই ছুটে গিয়ে ষ্টেশনের লাগোয়া ঔষধের দোকানে লিউকোপ্লাষ্ট—কিনে লাগিয়ে নিলো সিরিঞ্জটা। ছোট্ট দু-সি-সি সিরিঞ্জটা লেগেও গেলো ভালো। ঝোলার মধ্যে লুকিয়ে নিলো হাতটা।

আধঘণ্টার অনেক আগেই হেলতে দুলতে দু'হাতে দু-টো কাটা লাল টকটকে তরমুজ ঝুলিয়ে ফিরলো রামু। একগাল হেসে বল্লো—তরমুজ দেখেই তোর কথা মনে পড়লো। এককালে তো তুই তরমুজ খুব ভালবাসতিস।

রামুর ডানহাতে তরমুজটা বিষ-মাখানো ছিলো। সেটাই সে দিলো দামুকে বাঁ হাতেরটা ভালো। সেটা খেলো নিজে। তরমুজ খেয়ে ওরা যখন বগীতে উঠলো তখন দামু ইচ্ছে করেই একজন লোকের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলো। সুবিধা তাতে অনেক চট করে রামুর পিঠে সিরিঞ্জের সাপের বিষ সবটুকু ঢুকিয়ে দিলো। বিরক্ত হলো রামু কিছুটা খেঁকিয়ে উঠলো —দেখে চলতে পারেন না। পিঠে কী ফুটিয়ে দিলেন বলুন তো ?

কম বিরক্ত নয় পেছনের লোকটা—আমি !

কথাটা বাড়ালো না আর রামু। দামুকে জায়গায় বসিয়ে ওকে হত্যার খবরটা জানিয়ে চুপিচুপি কেটে পড়তে হবে তাকে। গাড়ী ছাড়তে আর দেরী নেই। ডাউন শান্তিপুর এসে গেছে। কৃষ্ণনগর আসতে আর দেরী নেই।

দামু সিটে বসতে না বসতেই নেকড়ের মতো দাঁত খিঁচালো নিঃশব্দে,—শোন্ দামু তুই বড় বেশী জেনে গেছিস। হ্যা আমি স্বীকার করছি আগের দুটো বৌ-কে মেরেছি। কিন্তু তুই-তো কাউকে বলতে পারবি না। কারণ তুই-ও মরতে চলেছিস! —

হাসলো দামু পরম নিশ্চিন্তে, কী করে?

—এখুনি যে তরমুজ খেলি তাতে আমি বিষ মিশিয়ে দিয়েছি।

আর কথা বলতে পারলো না রামু। হঠাৎ-ই মাথাটা ঘুরে পড়লো। চারদিক তাকালো দামু। কৃষ্ণনগর ঢুকে গেছে। আর সময় নেই ছুটে গিয়ে এখনই তাকে দৌড়াতে হবে। হেসে উঠলো দামু,—কিন্তু একটা কথা তুই ভুলে গেছিস—ছোটোবেলা থেকে আমি যা খাই ঠিক তাই বমি করতে পারি। ঝোলা নিয়ে বিপরীত দিকের কৃষ্ণনগরের খোলা দরজায় ঝাঁপ মারলো সে। লালগোলা চলতে আরম্ভ করেছে তখন; যে যার সীটে বসতে ব্যস্ত। কেউ আর রামুকে লক্ষ্য করলো না। রামুর মৃতদেহ যখন আবিষ্কার হলো লালগোলা প্যাসেঞ্জার তখন বেলডাঙ্গায় ঢুকছে।

টেপ বন্ধ হবার স্পষ্ট শব্দ পেলাম। বাসের ঘড়ির দিকে চোখ পড়লো। মাত্র একশো মাইল এসেছি। আরো তিনশো মাইল বাকি। জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম। ভোর হতে অনেক দেরী। বাসের যাত্রীদের দিকে চোখ পড়লো এবার। স্যার আর্থার কোনাল ডয়ালের দিকে তাকাতেই তিনি বলে উঠলেন—ইউ প্লীজ গ্যোটআউট।

জলে ডোবার আগে খড়কুটো-টা আঁকড়ে ধরতে চাইলাম আমি।—কেন গল্পটা কী আমার ভালো হয়নি।

—নট আপটু দ্য ষ্ট্যাণ্ডার্ড।

স্যার আর্থার রায় দিলেন। করুণভাবে তাকালাম সম্রাজ্ঞীর দিকে। সম্রাজ্ঞী মহানুভব।—ম্যাডাম, আপনি! সম্রাজ্ঞী কী ঘুমোচ্ছিলেন। তাড়াহুড়ো নেই। ধীরে সময় নিয়ে উত্তর দিলেন—ট্রাশ্!

মন্তব্য তো নয় যেন একগাদা থুতু ছেটোলেন।

—কেন ট্রাশ? আমার গল্পে শার্লক নেই বলে, নেই সেই বেঁটে-খাটো

বেলজিয়ান ভদ্রলোক অরিকুল পোঁয়া—রো বা পাদরী বাবা ব্রাউন। এটা হচ্ছে গণতন্ত্রের যুগ। সকলের সমান অধিকার।

স্যার আর্থার ছোট্ট করে বল্লেন—শোনো, বালক তোমাদের দেশে কেউ রহস্য গল্প লিখতে পারে না। তুমি এতোক্ষণ যা বল্লে তা স্রেফ মরা কান্না। শীঘ্রি বাস থেকে নেবে পড়ো মাই বয়!

আমিও রুখে দাঁড়লাম, প্রমাণ চাই। আপনাদেরও সকলের গল্প আমি শুনবো। সকলের গল্প টেপ করে বিচার করতে হবে—বিশেষ করে ঐ দুজন ভ্যান্‌ভট্ আর ব্যানারম্যান।

—নইলে?

—নামবো না, নামবে আমার মৃতদেহ।

—সম্রাজ্ঞী মহানুভব। কথা বল্লেন আবার—ছেলেটাকে সন্তুষ্ট করা হোক।

মার দিয়া কেল্লা! যাক্, নিশ্চিন্তি—কিন্তু না, আর ভাববো না। এদের নিশ্চয়ই টেলিপ্যাথি আছে। লক্ষ্য করেছি আগেই। এখন আবার পড়ে গেলাম। প্রত্যেকটা আসনের পেছনে আসীন মানুষের নাম আছে। প্রথমেই চোখে পড়লো খোলা-মেলা, আসন থেকে উপছে পড়া মানুষ গিলবার্ট কেথ্ চেষ্টারটন্! চোখে পড়লো ভাবুক মানুষ এইচ্. জি, ওয়েলস্। দেওয়ালে টাঙানো পরীক্ষার ফল দেখছি যেন আমি। উপরের সব উঁচা ছেলেগুলি পাশ করে গেছে। আমার গল্পটা কী ওই দুজন ব্যানারম্যান আর ভ্যানভটের রহস্য গল্পের থেকে ভটপটিয়ে যাবে না?

শেষের সে দিনটি কী ভয়ংকর

স্যার আর্থার কোনান ডয়াল

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি শেষবারের মতো কলম ধরছি। এই কয়েকটি কথাই আমার শেষ লেখা যাতে আমার বন্ধু শার্লকস্ হোমসের একক গুণের কথা থাকবে এবং যা তাকে অসাধারণ করে তুলেছে। অসংলগ্ন, হ্যা আমি গভীরভাবে অনুভব করছি অসম্পূর্ণ ভাবে আমি তাঁর সংগ বিভিন্নভাবে পেয়ে আমার অদ্ভুৎ অভিজ্ঞতালব্ধ ফসল আপনাদের কাছে উপস্থিত করতে আরম্ভ করি। "লালের অভিজ্ঞতা"—আমাদের দু-জনকে একসংগে এনে দিয়ে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা আরম্ভ করে আর শেষ করে দেয় "নৌ-সন্ধির" মধ্যস্থতায়। একটি জঘণ্য আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ এড়াতে এই মধ্যস্থতার অবদান প্রশ্নাতীত। আমার ইচ্ছা ছিলো—যে ঘটনা আমার জীবনকে শূণ্য করে দিয়েছে দু-বছর আগে এবং যা আজো পূর্ণ হয়নি—সেই সম্বন্ধে নীরব থাকব কিন্তু অধুনা কর্ণেল জেমস্ মোরিয়ারটি কতোগুলি চিঠি লিখতে আরম্ভ করেছেন। ঐ সব চিঠিতে তিনি তাঁর ভাইয়ের কীর্তি কলাপকে সমর্থন করতে চাইছেন। আমি আর ঠিক থাকতে পারছি না। সত্যি যা যা ঘটেছিলো—সেই সব ঘটনা এখন জন· সাধারণের কাছে উপস্থিত করা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই। কেবল আমিই জানি সত্যি কী ঘটেছিলো এবং এখন এমন একটা সময় উপস্থিত হয়েছে যখন সত্য ঘটনা গোপন করে আর কোনো লাভ নেই। যতোদূর জানি সংবাদ পত্রে মাত্র তিন ধরণের সংবাদ বেরিয়েছিলো। ৬-ই মে, ১৮৯১ সালে জেনেভার জার্নালে, ৭ই মে রয়টারের পাঠানো বিভিন্ন ইংরাজী সংবাদ সংস্থার খবর, এবং বর্তমানের চিঠিগুলি যাতে আমি জড়িত। এই চিঠিগুলির মধ্যে প্রথম দুটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তৃতীয়টি—যা আমি এখন দেখাবো, ঘটনার অধঃপতন। আজই আমি প্রথম বলবো অধ্যাপক মোরিয়ারটি এবং শ্রীশার্লক হোমসের মধ্যে ঠিক কী ঘটেছিলো।

আমার বিয়ের পর পরই এবং চিকিৎসা ব্যবসায় জড়িয়ে পরার ধরুণ হোমস্ ও আমার বন্ধুত্বের গাঢ়তা কিছুটা হাল্কা হয়েছিলো। যখনই সে তার অনুসন্ধান কাজে সহায়তার দরকার বোধ করতো আমার কাছে আসতো। কিন্তু এই দেখা সাক্ষাৎটা ক্রমে ক্রমে কমে আসতে লাগলো। অবশেষে ১৮৯০

সালে দেখা গেলো আমি কেবল মাত্র তার তিনটি রহস্য খাতায় লিপিবদ্ধ করেছি। ঐ বছরে শীতকালে এবং ১৮৯১ সালের বসন্তে কাগজে দেখলাম ফরাসী সরকার তাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজে নিযুক্ত করেছে। আমি ও যথাক্রমে নারবোন ও নিম থেকে হোমসের লেখা দুটি চিরকুট পেলাম। ঐ চিঠি থেকে জানতে পারলাম হোমসকে ফরাসী দেশে বেশ কিছু সময় থাকতে হবে। ২৪শে এপ্রিল বিকেলে তাকে আমার মন্ত্রণা কক্ষে ঢুকতে দেখে তাই বেশ কিছুটা অবাক হলাম। হোমস্ অনেকটা ফ্যাকাশে আর রোগাটে হয়ে গেছে।

"হ্যা, আমি এখন বেশ কিছুটা স্বচ্ছন্দভাবে থাকতে পারি" আমার চাহনির যেন উত্তর হলো ওটা, "কিছু দিন আগেও আমার কাজের চাপ ছিলো। যদি জানলাগুলি বন্ধ করে দি, আপত্তি করবে কী?"

টেবিলে যে বাতির তলায় বসে পড়ছিলাম—সেটাই ছিলো কেবল মাত্র আলোর উৎস। দেওয়ালের পাশ দিয়ে গিয়ে হোমস জানলাগুলির বন্ধ করে ব্যাংগুলি ভালোভাবে আটকে দিলে।

"তোমার ভয়ের কারণটা কী?" জিজ্ঞেস করলাম।

"ঠিক বলেছ, আমি ভীত।"

"কী কারণে?"

"বন্দুক!"

"ভাই, কী ব্যাপার বলো তো?"

"ওয়াটসন্ তুমি আমাকে খুব ভালোই জানো আমি মোটেই অস্থির মস্তিস্কের লোক নই। আবার তোমাব ঘাড়ে যখন বিপদ চেপে বসেছে তখন তাকে অস্বীকার করাটা বীরত্ব না বলে মূর্খতা বলাই ভালো। আমাকে কী দয়া করে একটা দেশলাই দেবে?" সিগারেটের টানটা তার মনের কষ্টকে ঠাণ্ডা করাতে যেন সিগারেটের ধোঁয়া রূপে কৃতজ্ঞ হয়ে উঠলো।

"এতো বেলায় তোমার কাছে আসার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।" বললো সে, "আমি আরেকবার তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি তোমার বাড়ীর পেছনের দেওয়ালটা আঁচোর-পাঁচোর করে টপকাবার জন্য।"

"কিন্তু ব্যাপরটা কী বলবে তো?" প্রশ্ন তুলাম। হাতটা মেলে ধরলো সে। বাতির আলোয় দেখলাম হাতের দুটো গাঁট ছড়ে গেছে আর রক্ত বেরুচ্ছে।

"বুঝতেই পারছো এটা একটা ঠাট্টার ব্যাপার নয়" হাসলো সে।

"পরন্তু এটা একটা মানুষের হাত-ভাংগার ব্যাপার হয়ে উঠতে পারতো।" "শ্রীমতী ওয়াটসন্ কী বাড়ীর ভেতর ?"

"ও বেড়াতে গেছে।"

"বা! তুমি একা ?"

"একদম।"

"তাহলে তো তোমাকে এক সপ্তাহের দেশ ভ্রমণের প্রস্তাব করার ব্যাপারটা খুবই সহজ হয়ে গেলো।"

"কোথায় ?"

"ও যেখানেই হোক। আমার কাছে সবই সমান।"

সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন অদ্ভুৎ। অনির্দিষ্ট ছুটি উপভোগ করা হোমের স্বভাব নয়। তার ফ্যাকাশে, বসে যাওয়া মুখ স্নায়ুর উত্তেজনার চরম ভাবে অবাক হলাম। চোখের ভাষা পড়ে আর হাতের আঙ্গুল জড়ো করে এক সময় হাঁটুতে কনুই রেখে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করলো সে।

"তুমি বোধহয় অধ্যাপক মোরিয়ারটির নাম কখনো শোনোনি ?"

"না।"

"হ্যা ওখানেই রয়েছে প্রতিভা আর সমস্ত ব্যাপারটার চমৎকারিত্ব।" বলে উঠলো সে, "লোকটা লণ্ডন শহর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে অথচ তার নাম কেউ জানে না। এটাই হলো তার অপরাধের তুংগে থাকার কারণ। চরম সততার সংগে বুঝলে ওয়াটসন বলছি, যদি লোকটাকে হারাতে পারি, যদি সমাজকে ওর কবল থেকে মুক্ত করতে পারি, তবে বুঝবো আমি আমার সাহসিকতার চরমে পৌছেছি। এবং তখনই কোনো নিরুপদ্রব জীবন যাত্রার কথা চিন্তা করবো। নিজেদের মধ্যে বলছি, স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার রাজপরিবার আর ফরাসী প্রজাতন্ত্রের কাজ করে যা উপাজন করেছি তাতে আমি আমায় মনোমত শান্ত জীবন যাপনে সক্ষম। আর রাসায়নিক গবেষণায় আবার মন-প্রাণ ঢালতে পারি। আমি স্থির হয়ে থাকতে পারিনে, দুদণ্ড চেয়ারে তিষ্ঠতে চাই না যখন ভাবি অধ্যাপক মোরিয়ারটির মতো একজন লোক কী অপ্রতিরোধ্য অবস্থায় লণ্ডন শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

"লোকটা করেছে-টা কী ?"

"ওর জীবনটাই হচ্ছে অতদ্ভুৎ। বড় বংশের ছেলে, উচ্চ শিক্ষিত, প্রকৃতির দানে অংকশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। মাত্র একুশ বছর বয়সে বায়নোমিয়াল নিয়মের ওপর যে প্রবন্ধ লিখেছিলো ইওরোপে তা আজো চালু।

ঐ প্রবন্ধের দৌলতে ইওরোপের ছোটো-খাটো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে অংক-শাস্ত্রের চেয়ারটা দখল করেছে সে। সব দেখেশুনে মনে হবে ওর ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জল। কিন্তু বংশগত সূত্রে লোকটা পিশাচ। রক্তে রয়েছে ওর অপরাধ, সেটা কিছু মাত্র না কমে মানসিক উৎকর্ষতায় অনেক বেড়ে গেছে। ওকে ঘিরে নোংরা সমস্ত কুৎসা জমতে লাগলো বিশ্ববিদ্যালয় শহরে। ফলে ওকে চাকরীতে ইস্তাফা দিয়ে লণ্ডনে ফিরে আসতে হলো। লণ্ডনে সে নীচ সাংগ-পাংগদের নায়ক হয়ে বসলো। বাইরের পৃথিবী এইটুকুই মাত্র জানে। এখন আমি যা তোমাকে বলবো সেটা আমিই আবিস্কার করেছি।

"তুমি ভালোই জানো, লণ্ডনের উঁচুস্তরের অপরাধ জগৎ সম্বন্ধে আমার থেকে কেউ ভালো জানে না। বেশ কয়েক বছর ধরে আমি বুঝতে পারছিলাম সমস্ত কুকর্মের পেছনে একটা শক্তি আছে। সে শক্তিটার ক্ষমতা হচ্ছে অপরাধ গভীরভাবে সংঘবদ্ধ করা—আইন যেটা ভাংগতে পারেনা পরন্তু অপরাধীদের যা ঢেকে রাখে। জালিয়াতি, ডাকাতি, খুন-খারাপী সমস্ত রকম ব্যাপারে আমি বারবার একটা শক্তির উপস্থিতি উপলব্ধি করতে লাগলাম। ফলটা হলো যে সব কেসে আমাকে ডাকা হয়নি এবং যা আজো অসমাধিত রয়ে গেছে তার মধ্যে আমি ওর উপস্থিতি বোধ করছি। কয়েক বছর ধরে যে পর্দাটা ওকে ঘিরে রেখেছে সেটা ছিঁড়ে ফেলতে চেষ্টা করছি। অবশেষে একদিন সুতো পেলাম এবং তা ধরে এগিয়ে গেলাম যতো দিনে না আমাকে সেটা ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক এবং অংকশাস্ত্রে পারদর্শী মোরিয়ারিটির কাছে পৌছে দিলো। অবশ্য এর মধ্যে আমাকে হাজারোটা ধূর্ত ধাঁধা এড়াতে হয়েছে।

"বুঝলে ওয়াটসন, অপরাধ জগতে সে-নেপোলিওনের মতোই সম্রাট। এই বিরাট শহরে যতো অপরাধ হচ্ছে তার অর্ধেকটা এবং যা অনাবিস্কৃত থেকে যাচ্ছে তার সমস্তটারই নায়ক হচ্ছেন ইনি। লোকটা প্রতিভাময়, দার্শনিক, এবং উদ্ভট চিন্তাশীল। সবার সেরা মাথা তার। জাল বিস্তার করে ঠিক মাকড়শার মতো ও মাঝখানে বসে থাকে। হাজারোটা তার সুতো, কিন্তু সুতোর কোনো একটা প্রান্তে কম্পন হলেই সে সেটা ধরতে পারে। নিজে সে কিছুই করে না। পরিকল্পনা তার। অসংখ্য তার চেলা। আর সুন্দরভাবে তারা সংঘটিত। কী ধরনের অপরাধ হবে? ধরো কোন দলিল চুরি, কোনো বাড়ীর ওপর বন্দুকবাজী, একটা মানুষকে গুম করতে হবে, অধ্যাপকের কাছে সংবাদ চ'লে গেলো। অপরাধের ছক কাটা হলো আর কাজটারও নিস্পত্তি ঘটলো। হয়তো লোক ধরা পড়লো। তখন জামিন বা

তার হয়ে লড়বার জন্য উকিল খরচ সবকিছু জোগাড় হয়ে গেলো। কিন্তু মধ্যমনি যে চেলাটাকে কাজ করিয়েছিলো সে রয়ে গেলো নেপথ্যে। এই সংঘঠন আমি বার করলাম আর আমায় সমস্ত উদ্যোগ বুঝলে ওয়াটশন, লোকের সামনে তুলে ধরলাম সংগঠনকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ভেংগে দিতে।

"কিন্তু অধ্যাপক মশাইটি নিজেকে এমন একটা জালে ঘিরে রেখেছে এবং তা এতোই ধূর্ততায় ভরা যে কোনো আদালতেরই সাধ্য নেই সেটা ভাঙ্গে। আমার ক্ষমতা তো তুমি ভালোই জানো বন্ধুবর। এবং তিন মাস পরে আমি স্বীকার রতে বাধ্য হলাম আমি এমন একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হয়েছি যে বুদ্ধিতে আমার সমকক্ষ। তার অপরাধের ভয়ালতা তার প্রতি আমার প্রশংসায় যেন হারিয়ে যেতে চাইলো। তার পরেই সে ভুল করলো, একটা ছোট্ট ভুল, এতো ছোটো যে এর বেশী সে করতে পারে না। যেহেতু আমি চারপাশ থেকে চেপে ধরেছিলাম বরাত খুলে গেলো আমার আর ঐভুলটা ধরেই আমি তাকে ছেড়ে আমার জাল গোটাতে লাগলাম যতোক্ষণ না তাকে কোণঠাসা করি। তিন দিনের মধ্যেই, ধরো সামনের সোমবারের মধ্যেই অধ্যাপক মশাই আর তার সাংগপাংগরা পুলিশের হাতে ধরা পড়বে। তারপরেই আরম্ভ হবে শতাব্দীর সবচেয়ে সাংঘাতিক অপরাধের বিচার। চল্লিশটারও বেশী রহস্যের সমাধান আর দলের সকলের জন্য তৈরী হবে ফাঁসির দড়ি। কিন্তু যদি আমাদের চালে একটু ভুল হয় বুঝতেই পারছো, শেষ মুহূর্তেও যদি সেটা হয় তাহলে সবকটা ফাঁকি দেবে আমাদের।

"মজা হচ্ছে, যদি সব ব্যাপারটা অধ্যাপক বেটার অগোচরে করতে পারতাম খুব ভালো হতো। কিন্তু ও ব্যাটা বুদ্ধিতে বড় দড়। তাকে জড়াতে প্রতিটি পদক্ষেপ ও ধরতে পারলো। প্রত্যকবারই সে জাল ছেঁড়বার চেষ্টা করলো কিন্তু প্রত্যকবারই আমি পেড়ে ফেল্লাম।...আমি কখনোই অতো তুংগে উঠিনি এবং প্রতিদ্বন্দ্বী কোনোদিনই অতো জোরে আমাকে ধরেনি। গভীরভাবে সে আমাকে কাটবার চেষ্টা করেছিলো, এবং প্রতিবারই আমি পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে আসছিলাম। আজ সকালে শেষ চাল দেওরা হলো। মাত্র তিন দিন আছে ব্যাপারটায় যবনিকা পড়তে।

আমার বসার ঘরে বসে বসে ব্যাপারটার সম্বন্ধে ভাবছিলাম যখন, ঠিক তখনই দরজা খুলে গেলো আর অধ্যাপক মোরিয়ারিটি আমার সামনে দাঁড়িয়ে!

স্নায়ু আমার মোটামুটি শক্ত। কিন্তু আমি স্বীকার করছি, ওয়াটসন্। যে লোকটা আমার চিন্তার জগৎ জুড়ে আছে তাকেই আমার সামনে দাঁড়িয়ে

থাকলে দেখে যেন কেঁপে উঠলাম। তার চেহারা-পত্র আমার পরিচিত। প্রচণ্ড লম্বা আর পাতলা। কপালটা তার গম্বুজের মতো বাঁকা আর তাকে ঘিরে সাদা চুলের বেড। চোখ-জোড়া গভীর গর্তে বসা। পরিস্কার দাড়ি কামানো, ফ্যাকাশে, তাপসের চেহারা। লোকটা যে অধ্যাপক তার চেহারায় সেটা-মোটামুটি বোঝা যায়। কাঁধ-দুটো গোল কিন্তু শক্তসামর্থ নয়, সরীসৃপের মতো মুখটা সামনে ঝুকে অনবরত এদিক-ওদিক করছে। গভীর ঔৎসুক্যে সে তার কোটর গত চোখ-জোড়া নিয়ে চেয়ে রইলো।

"যা আশা করেছিলাম সে রকম নয় আপনার মুখের গড়ন" অবশেয়ে সে মুখ খুল্লো, "একজনের ড্রেসিং-গাউনের পকেটে গুলি ভর্তি পিস্তল নাড়াচাড়া করা খুবই বিপজ্জনক।"

"ব্যাপারটা হলো লোকটা ঘরে ঢোকার সংগে সংগে আমি বুঝতে পারলাম কী বিপদের মধ্যে আমি পড়েছি। বাঁচার একটাই পথ সেটা তাকে চুপ করে দেওয়া। মুহূর্তে আমি ড্রয়ার থেকে পিস্তল পকেটে ঢুকিয়ে আর পকেটে আংগুল চালনা করে তার দিকে তাক করে রইলাম। তার মন্তব্যে পিস্তলটা আমি টেবিলের উপর ফেলে রাখলাম, সে তবুও হাসছিলো আর চোখ পিট্‌পিট্ করছিলো। কিন্তু তার চোখে কিছু একটা ছিলো যেটা দেখে আমার বেশ আনন্দ হলো।

"স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আপনি আমাকে চেনেন না" বল্লে সে।

"উল্টোভাবে" উত্তর দিলাম, "বেশ ভালোভাবেই আপনাকে জানি। দয়া করে চেয়ারে বসুন। যদি আপনার কিছু বলার থাকে তার জন্য আপনাকে পাঁচ মিনিট সময় দিলাম।"

"আমি যা বলতে চাই তা নিশ্চয়ই আপনার মাথায় খেলে গেছে।"

"তাহলে উত্তরটাও আপনার মাথায় নিশ্চয় উদয় হয়েছে।" বল্লাম আমি।

"পথ ছাড়বেন না?"

"নিশ্চয়ই না।"

"পকেটে হাত ঢোকালো সে আমিও পিস্তলটা টেবিল থেকে তুলে নিলাম। কিন্তু সে কেবল পকেট থেকে একটা স্মারক নোট বই তুলে নিলো—যাতে রয়েছে কতোগুলি তারিখ।

"জানুয়ারী মাসের চার তারিখে আপনি আমার কাজে বাঁধা দিয়েছিলেন" লোকটা বল্লো, "২৩ তারিখে আমাকে অসুবিধায় ফেলেছিলেন। ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি খুবই অসুবিধায় পড়েছিলাম আপনার জন্য। মার্চের শেষে আমার

পরিকল্পনা পুরোপুরি ব্যর্থ হলো। আর এখন এই এপ্রিলের শেষে আপনার আঁঠার মতো লেগে থাকার জন্য আমি এমন একটা অবস্থায় পড়েছি যার ফলে আমি হয়তো আমার স্বাধীনতা হারাবো। অসহ্য এ অবস্থা!"

"আপনি কী কোনো প্রস্তাব দেবেন?"

"আপনাকে আমার পেছনে লেগে থাকার ব্যাপারটা ছাড়তে হবে, হোমস্ সায়েব" সরীসৃপের মতো মুখটা এদিক ওদিক দুলিয়ে বল্লে সে, "আপনাকে ছাড়তে হবে।"

"সোমবারের পর" আমিও উত্তর দিলাম।

"তুক। তুক্।" মুখে বিচিত্র শব্দ করে বল্লে সে "আমি স্থির নিশ্চিত যে আপনার মতো বুদ্ধিমান বুঝতে পারছেন এর থেকে পরিত্রাণের একটাই উপায় সেটা—আপনার নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া। যে ভাবে তদন্ত চালিয়েছেন তাতে আমাদের জন্য একটাই পথ খোলা রয়েছে। পরিস্কার ভাবে বলছি, আপনার ব্যাপারে চরম কিছু ব্যবস্থা নেওয়া খুবই পরিতাপের ব্যাপার একটা। হোমস্ সাহেব হাসছেন আপনি, কিন্তু আমি যা বলছি তাই হবে।

"বিপদ আমার কাজে ওৎপ্রোৎভাবে জড়িয়ে থাকে," মন্তব্যটা আমার। উত্তরে বল্লেন তিনি, "এটা ঠিক বিপদ নয়, অনিবার্য ধ্বংস এটা। আপনি কেবল একটা লোকের বিরুদ্ধে নয়, একটা ধূর্ত সংস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে। যার শক্তি আপনার শত চাতুর্য্য সত্বেও ধরতে পারেন নি। সরে দাঁড়ান, অথবা নিজেকে আমাদের পায়ের নীচে থেৎলানো দেখুন।"

চেয়ার ছেড়ে উঠলাম আমি "আমার ভয় হচ্ছে এই কথাবার্তার খাতিরে আমি আমার অন্য কোথাকার কাজে অবহেলা দেখাচ্ছি।"

সে-ও উঠে পড়লো আর দুঃখের সংগে মুখটা এদিক-ওদিক নাড়তে লাগলো। "ভালো, খুবই ভালো," অবশেষে সেই বল্লো, দুঃখের ব্যাপার, কিন্তু আমার যা করবার তা করলাম। আপনার খেলার প্রতিটি চাল আমার জানা। সোমবারের আগে আপনি কিছুই করতে পারছেন না। হোমস্ সাহেব এটা আপনার ও আমার মধ্যে যৌথ খেলা। আপনি চান আমাকে কাঠ গোড়ায় দাঁড় করাতে। কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি আমি কোনো দিনই কাঠ গোড়ায় দাঁড়াবো না। হারাতে চাইছেন? কিন্তু কোনো দিনই তা পারবেন না। আপনি যদি আমার সর্বনাশ করার মতো চালাক হোন নিশ্চিত থাকুন আমিও ঠিক তাই করবো।...

"মোরিয়ারিটি সাহেব আপনি আমাকে নানা ভাবে সম্মানিত করলেন," শেষ

মেষ বল্লাম আমি, "আমাকেও তার উত্তরে আপনাকে নিশ্চয়ই সম্মানিত করা উচিৎ। আমিও বলছি প্রথম কাজটা সমাধা করতে যদি দ্বিতীয়টা মানতে হয়, মানুষের উপকারের জন্য সানন্দে তা মানবো।

"প্রথমটার ব্যাপারে আমি আপনাকে নিশ্চিত করতে পারি, কিন্তু দ্বিতীয়টার ব্যাপারে কিছুই না।" সে যেন গর্জন করে উঠলো আর তার গোলাকার কাঁধটা আমার দিকে করে চোখ পিট্‌পিট্‌ করতে করতে আর ইতি-উতি তাকাতে তাকাতে উঠলে সে ঘর থেকে।

ঐ একবারই আমার সংগে অধ্যাপক মোরিয়ারিটির দেখা হয়। স্বীকার করছি আমার মস্তিস্কে একটা অস্বস্তিকর চাপের সৃষ্টি হয়েছিলো। ওর ঠাণ্ডা, যথাযথ কথাবার্তা একটা গুণ্ডার কথাবার্তার চেয়ে আমার ওপর বেশী প্রভাব সৃষ্টি করেছিলো। আমি স্থির নিশ্চিত হয়েছিলাম তার কথার সততার ব্যাপারে। অবশ্যই তুমি বলবে, কেন পুলিশী সতর্কতা ওর বিরুদ্ধে নেওয়া হয়নি। কারণটা হলো, আমি জানি আঘাত আসবে ওর তরফ থেকে নয় ওর চেলাদের কাছ থেকে। হ্যা, এ ব্যাপারে আমি একদম ঠিক।—"ইতিমধ্যেই কী তোমার ওপর আক্রমণ চলেছে?"

"প্রিয় সখা ওয়াটসন্, অধ্যাপক মোরিয়ারিটি পায়ের তলায় ঘাস জন্ম দেবার মানুষ নন। দুপুরে কোনো একটা কাজে বাইরে গিয়েছিলাম, অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটে। বেণ্টিক ষ্ট্রীট আর ওয়েলবেক ষ্ট্রীটের কোনাটায় একটা ঘোড়ার গাড়ী বিদ্যুৎ চমকের মতো আমার ঘাড়ে পাগলের মতো এসে পড়লো। সেকেণ্ডের এক চুলের জন্য আমি বেঁচে গেলাম ফুট পাথে লাফিয়ে পড়ে। গাড়ীটা মেরিলীবোন ষ্ট্রীট থেকে ছিটকে এসে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হলো। এরপরই আমি ফুটপাথ ধরে চলতে লাগলাম। বুঝলে ওয়াটসন্ কিন্তু ভের ষ্ট্রীটে কোনো ছাদের ওপর থেকে একটা ইট হঠাৎ আমার পায়ের কাছে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে পড়লো। পুলিশ ডাকলাম এবং ব্যাপারটার তদন্ত করালাম। মেরামত করার জন্য সেই ছাদের ওপর শ্লেট আর ইট জড়ো করা হয়েছিলো, পুলিশ আমাকে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়লো যে বাতাসে একটা ইট হঠাৎ-ই আমার পায়ের কাছে এসে পড়ে। ব্যাপারটা আমি ভালোই জানি, কিন্তু প্রমান কিছু নেই। এরপর আমি একটা গাড়ীতে চেপে পলমলে আমার ভাইয়ের ওখানে উঠি। ওখানেই দিনটা কাটাই। এখন ঘুরপথে তোমার কাছে আসছি। আসার পথে একটা বদমাশ আমাকে গদা নিয়ে আক্রমন করে! পেড়ে ফেলি আর পুলিশ এসে পাকড়াও করে তাকে। কিন্তু সবরকমের দৃঢ়তা নিয়ে আমি তোমাকে বলতে পারি

এই দুজন—তাদের একজন হচ্ছে সেই ভদ্রলোক যার সামনের দাঁত ভাংগতে আমার গাঁট ছড়ে গেছে আর ভূতপূর্ব অংকশাস্ত্রবিদ যে নাকী দশ মাইল দূরে কোনো ক্লাশ ঘরে ব্ল্যাক বোর্ডের ওপর অংক বোঝাচ্ছে—এই দুজনের মধ্যে যে কোনো সম্পর্ক আছে তা প্রমাণ হবে না। সুতরাং ওয়াটসন ভাই তুমি এবার নিশ্চয়ই আশ্চর্য হচ্ছো না কেন আমি ঘরে ঢুকেই জানলাগুলি বন্ধ করে দিলাম আর তোমার বাড়ীর পেছনের দেওয়াল দিয়ে চলে যাবার জন্য অপ্রচলিত পথের অনুমতি চাইছি।

সব সময়েই বন্ধুবরের সাহসের প্রশংসা করি আমি, কিন্তু আজকের বেশী বাখানি আর কোনো দিনই করবো না।…বল্লাম আমি, "রাতটা নিশ্চয়ই এখানে থাকছো?"

"না, বন্ধু, এর ফলে আমি হবো তোমার ভীতি-উৎপাদক একজন অতিথি। আমার কিছু পরিকল্পনা আছে, ভরসা হচ্ছে ওগুলি ভালো ভাবেই সুসম্পন্ন হবে। ব্যাপারটা এমন ভাবে পেঁকে উঠেছে যে আমার সাহায্য ছাড়াই দলটা গ্রেপ্তার হবে, কারণ ব্যাপারটা ওদের গ্রেপ্তার নিয়েই। আমার উপস্থিতি দরকার কেবলমাত্র অভিযোগের জন্য। পুলিশ ওদের গ্রেপ্তার করার আগের কয়েকদিন পর্যন্ত আমার পক্ষে গা ঢাকা দিয়ে থাকাই বাঞ্ছনীয়। খুবই আনন্দ পাবো, যদি এ কদিন তুমি দেশভ্রমণে আমার সংগী হও।

"ব্যাবসা-পত্তরও ঠাণ্ডা মেরে গেছে," বল্লাম আমি. "আমার এক প্রতিবেশী সাহায্যও করবে। তোমার সংগে যেতে পারলে আনন্দই পাবো।"

"কাল সকালেই তাহলে আমাদের রওনা দিতে হয়?"

"দরকার হলে নিশ্চয়ই।"

"অবশ্য খুবই দরকার। এখন আমার নির্দেশগুলি শোনো আর আশা করবো তুমি অবশ্যই এগুলি মানবে কারণ মনে রাখবে তুমি দু-মুখ ধারালো কিছুর বিরুদ্ধে আজ খেলছো। প্রতিপক্ষী হলো ইউরোপের ধূর্ততম দুবৃত্ত আর তার পেছনে আছে অশেষ শক্তিশালী এক অপরাধ সংস্থা। এখন শোনো, তোমার বিশ্বস্ত কোনো লোক যে মালগুলি তুমি নিয়ে যেতে চাও, সেগুলি ঠিকানা না লিখে রাতের মধ্যেই ভিক্টোরিয়াতে পাঠিয়ে দেবে। কোনো লোক দিয়ে কাল সকালে একটা হ্যানসাম ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে আসতে বলবে। প্রথম ও দ্বিতীয় গাড়ওয়ান যারা ভাড়া যাবার জন্য উন্মুখ তাদের নেওয়া হবে না। লাফিয়ে হ্যানসামে উঠবে। লওথার কুঞ্জে ষ্ট্রাণ্ডের শেষ পর্যন্ত যাবে। কোথায় যাবে কোচোওয়ানকে লিখে জানাবে। চিরকুটটা আবার সে যেন রাস্তায় না

ফেলে। গাড়ী ভাড়া ঠিক রাখবে। জায়গা মতো পৌঁছে কুঞ্জের ভেতর দিয়ে অপর প্রান্তে গিয়ে পৌঁচবে ঠিক ঘড়িতে যখন বাজবে ৯-১৫ মিঃ। দেখবে অপর প্রান্তে রাস্তার বাঁকে একটা ব্রুহাম দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ীর কোচয়ানের গায়ের ভারী পোষাক কালো রংয়ের কিন্তু কলারটা লাল। গড়ীতে উঠলে সে তোমাকে সময় মতো ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে পৌঁছে দেবে যাতে তুমি আন্তঃমহাদেশীয় ট্রেনটি ধরতে পারো।

"তোমার সংঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে কোথায়?"

"স্টেশনে। সামনের দিক থেকে দ্বিতীয় প্রথম শ্রেণীর বগীটা আমাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।"

"তাহলে গাড়ীই হচ্ছে আমাদের মিলনস্থল?"

"হ্যাঁ।"

বৃথাই তাকে বিকেলে থাকবার জন্য অনুরোধ করা। পরিস্কার বোঝা গেলো সে মনে করছে সে যদি আমার ঘরে থাকে তাহলে আমার ওপর বিপদ নেমে আসবে। এবং কেবলমাত্র তার জন্য আমাকে ছেড়ে যেতে সে বাধ্য। খুব তাড়াতাড়ি কয়েকটি নির্দেশ দিলো সকালে আমায় আর কী করতে হবে। এর পর আমরা বাগানে চলে এলাম। হ্যাঁচোর-পাঁচোর করে দেওয়াল বেয়ে ওপারে মটিমোর ষ্ট্রীটে গিয়ে সে পড়লো। শিষ দিয়ে ডাকলো একটা হ্যানসাম। তারপর শব্দে বুঝলাম গাড়িটা দ্রুত স্থান ত্যাগ করলো।

হোমস্ যা বলেছিলো সকালে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করলাম হানসমও একটা যোগাড় হলো—সেটা যাতে আমার জন্য আগে থেকে নির্দিষ্ট না থাকে তার যথাযথ ব্যবস্থা নিলাম। সকালের জলখাবারের পরই লোয়ার কুঞ্জে রওনা। সেখানে পৌঁছে তীরবেগে কুঞ্জ ভেদ করে অপর প্রান্তে পৌছালাম। ব্রুহাম একটা দাঁড়িয়ে সেথায়। কোচোয়ানটার মোটা-সোটা কালো একটা ওভারকোট গায়ে। গাড়ীতে উঠতে না উঠতেই ঘোড়ার পিঠে চাবুকের বাড়ি পড়লো আর গাড়ীটাও ভিক্টোরিয়া স্টেশনের দিকে ঝন্‌ঝনিয়ে চলতে লাগলো। গাড়ী থেকে নামবার সংগে-সংগেই সেও গাড়ীটা নিলো ঘুরিয়ে—আমি কোনদিকে যাচ্ছি সেদিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করে।

এখন পর্যন্ত সবকিছু ভালোভাবেই উৎরেছে! মালও উদ্ধার হলো। হোমসের বলা বগীটাও খুঁজে পেলাম।······আমাদের বগীটাই একমাত্র "অংগীকারবদ্ধ" বলে চিহ্নিত। হোমসের দেখা নেই বলে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। গাড়ী ছাড়তে আর মাত্র সাত মিনিট বাকী। ষ্টেশনে ঘড়ি তাই নির্দেশ করছে।

ভ্রমণার্থী আর ষ্টেশনে বিদায়-জানাতে আসা মানুষের ভীড়ে আমি সুধু-মুধুই হোমসের ছোটো-খাটো দেহটা খুঁজে বেড়াতে লাগলাম। কিন্তু সে বেপাত্তা। এরমধ্যে কয়েকটি মিনিট শ্রদ্ধাভাজন একজন ইটালী-দেশীয় পাদরী-সাহেবকে সাহায্য করলাম। ধর্মযাজকটি একটি কুলিকে তার ভাংগা-ভাংগা ইংরাজীতে বোঝাতে চাইছিলো যে সে তার মালপত্ত্রগুলি প্যারিসে পাঠাতে চায়। আরেকবার চারদিক তাকিয়ে আমি আমার বগীতে ঢুকে পড়লাম। দেখলাম বর্ষীয়ান ইটালী-দেশীয় পাদরী-বাবার ভিন্ন টিকিট থাকা সত্ত্বেও নম্বরী তাঁকে আমার ভ্রমণ-সংগী করে দিয়েছে। বৃথাই তাকে বলা তাঁর কাজটা বে-আইনী যেহেতু আমার ইটালী ভাষার জ্ঞান তার ইংরাজী ভাষার জ্ঞান থেকেও নড়বড়ে। সমস্ত ব্যাপারটায় ইতি করে আমি কাঁধ ঝাঁকালাম আর ফেরফিত্তি বাইরে দৃষ্টি চালালাম আমার বন্ধুর পথ চেয়ে। একটা ঠাণ্ডা স্রোত আমার দেহ দিয়ে বয়ে গেলো যখনই মনে এলো হয়তো এই অনুপস্থিতি তার ঘাড়ে বিপদ আসার জন্যই। ইতিমধ্যে দরজা বন্ধ হয়েছে, গাড়ীর বাঁশী বেজে উঠেছে। ঠিক তখনই—"ভাই ওয়াটসন্." একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠলো, "তুমি আমাকে এখনও সুপ্রভাত জানাওনি।"

হঠাৎ আশ্চর্যে চমকে উঠলাম। বৃদ্ধ যাজক আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। এক মুহূর্তে তার মুখের খাঁজ-খোঁজ অদৃশ্য। নাকও চিবুক থেকে গেছে উঠে।······নিস্প্রভ চোখ-জোড়া আবার জ্বলে উঠলো আব নুব্জ দেহ খাড়া। বৃদ্ধের সাজসরঞ্জাম পড়ে গেলো আর হোমসও ফিরে এলো সে হারাতে না হারাতে। "হায় ভগবান!" বলে উঠলাম আমি "তুমি আমাকে চমকে দিয়েছিলে!"

"প্রতিপদে সতর্কতা দরকার", ফিসফিসিয়ে উঠলো সে "অনেক কারণেই আমি নিশ্চিত যে তারা এখনও আমাদের পিছনে আঁঠার মতো লেগে আছে। হ্যাঁ, মোরিয়ারিটি নিজেই লেগে আছে। হোমসও কথা বল্লো আর গাড়ীও নড়লো। পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম একটা ঢ্যাংগা লোক ভিড় ঠেলে পাগলের মতো এগুতে চাইছে আর প্রবলভাবে হাত নেড়ে ট্রেণটা যেন থামাতে চাইছে। খুব দেরী হয়ে গেছে। ট্রেণ তার গতি পেয়েছে এবং মুহূর্তের মধ্যে ষ্টেশন ছেড়ে গাড়ী বেরিয়ে গেলো।

"সবরকম সতর্কতা নেওয়াতে, তুমি দেখতেই পারছো, ব্যাপারটা ভালো-ভাবেই উৎরে গেলো," থামলো হোমস্।······

"ওয়াটসন্ সকালের কাগজ দেখছো?"

"না।"

"বেকার ষ্ট্রীটের খবর কিছু রাখো ?"

"বেকার ষ্ট্রীট ?"

"গত রাতে ওরা আমাদের ঘরে আগুন লাগায়। বিরাট কিছু ক্ষতি হয়নি।"

"হায় ভগবান্! হোমস্, এ-যে অসহ্য!"

"ওদের সেই গদাওলা লোকটার গ্রেপ্তারের পরই ওরা আমার সূত্র হারিয়ে ফেলে। তা-না হলে ওরা ভাববে কী করে যে আমি ঘরেই ফিরে গেছি। এখন দেখা যাচ্ছে তারা তোমার ওপরও নজর রেখেছিলো, না হলে মোরিয়ারিটি ভিক্টোরিয়ায় হাজির হয় কী করে। আসার পথে কোনো সূত্র-ফুত্র ফেলে আসোনি তো ?

"তুমি যা-যা বলেছিলে ঠিক তাই করেছি আমি।"

"তুমি ব্রুহামটা খুঁজে পেয়েছিলে ?"

"হ্যাঁ, গাড়ীটা আমার জন্য অপেক্ষা করছিলো।"

"কোচম্যানটাকে চিনতে পেরেছিলে ?"

"না।"

"ও হচ্ছে আমার ভাই মাইক্রফট্।···যাক্ এখন মোরিয়ারিটির ব্যাপারেই আমাদের পরিকল্পনা ছকতে হবে।"

"যেহেতু এটা একটা এক্সপ্রেস ট্রেণ এবং সময়ের সংগে লাগোয়া নৌকার সময়, মনে হচ্ছে ওকে বেশ ভালো-ভাবেই ঝেড়ে ফেলতে পেরেছি।"

"ভাই ওয়াটসন্, আমি বেশ বুঝতে পারছি তুমি তখন বুঝতেই পারনি যখন আমি বলেছিলাম, এই লোকটা বুদ্ধিমত্তায় আমার সমকক্ষ। ধরো আমিই যদি ওর মতো অনুসরণকারী হতাম, তাহলে একবার একটা ছোটো বাধা পেয়েই হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতাম ? তাহলে, তুমি তার সম্বন্ধে অতো ছোটো চিন্তা করছো কেন ?"

"সে কী করবে ?"

"আমি কী করতাম ?"

তুমিই বলো, কী করতে ?"

"টিকটিকি লাগাতাম।"

"দেরী হয়ে গেছে না ?"

"মোটেই না। ট্রেণটা ক্যান্টারবেরী থামে। নৌকোর জন্য প্রায় মিনিট পনেরো দেরীও হয়। লোকটা ওখানেই আমাদের ধরবে"

"লোকে হয়তো ভাববে আমরাই দুষ্কৃতকারী। ঠিক আছে ওর পৌছানোর সংগে-সংগেই ওকে গ্রেপ্তার করতে হবে।"

"এটা হবে তিন মাসের কাজ পণ্ড করে দেওয়া। আমরা মাছের চাঁইটাকেই ধরবো। কুঁচোকাঁচাগুলি হয়তো জাল ছিড়ে বেরিয়ে যাবে। সোমবারেই সবকটাকে পেয়ে যাবো।"

"তারপর ?"

"হ্যাঁ, তারপর অবশ্যই আমরা অন্তঃদেশ ভ্রমণে ব্যস্ত হয়ে পড়বো। প্রথম নিউহেভেন এবং পরে ডিয়েপ। মোরিয়ারিটি ঠিক আমি যা করতাম তাই করবে। সে প্যারিসে নামবে, আমাদের মালপত্তরের খোঁজ নেবে। দু-দিন মালখানায় থাকবে অপেক্ষায়। ইতিমধ্যে আমরা কয়েকটা কার্পেট ব্যাগে কাজ চালিয়ে দেবো। আর ব্যাগ তৈরী কারখানার লোকেরা আমাদের নেওয়া ব্যাগ দেখে তারাও ওরকম ব্যাগ তৈরী করতে অনুপ্রাণিত হবে। এইভাবে গদাইলস্করী চালে একসময় সুইজারল্যাণ্ডে উঠবো লুকসেমবুর্গ আর বাসলের মধ্যদিয়ে।"

পোড-খাওয়া যাত্রী আমি। ঠিক এভাবে আমার জিনিষপত্র হারাতে মন চাইছিলো না। স্বীকার করছি যখনই ভাবলাম আমার এমন একজন লোকের সংগে টক্কর দিতে হবে যার কীর্তিকলাপ কালিমালিপ্ত এবং অখ্যাতিতে ভরা, আমার মন বিরক্তিতে ভরে গেলো। স্পষ্ট বোঝা গেলো হোমস্ আমার থেকেও ব্যাপারটা ভালো বুঝতে পেরেছে। ক্যাণ্টারবেরীতে নামলাম একসময়। জানতে পারলাম আমাদের নিউহেভেনের ট্রেণ ধরতে একঘণ্টা বসে থাকতে হবে। কিছুটা দুঃখভারাক্রান্ত-হৃদয়ে চলমান মালগুদাম ঠেলাগাড়ীটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ভাবছিলাম ঐ ঠেলাটায় আমার সমস্ত জামাকাপড়ই চলে যাচ্ছে এমন সময় হোমস্ আমার জামার আস্তিন ধরে টান দিলো এবং জলের দিকে নির্দেশ করলো।

"ইতিমধ্যেই তুমি দেখতে পাচ্ছো ?" বল্লে সে।

দূরে কেণ্টের জংগল থেকে একটা পাতলা ধোঁয়া দেখা গেলো। একটু পরেই একটা ইন্‌জিন বগীসহ গর্জন আর ঝন্‌ঝন্ রবে হুড়মুড়িয়ে ষ্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। আমাদের কতোগুলি মালের পেছনে লুকোবারও সময় দিলো না— মুখে এসে আঘাত দিলো এক ঝলক গরম বাতাস।

"ওই সে যাচ্ছে" বল্লো হোমস্।······বোঝো ব্যাপার। আমাদের বন্ধুরও তাহলে বুদ্ধির সীমা আছে। বুদ্ধির লড়াইটা ভালোই জমেছে।

"আর যদি আমাদের ও ধরতে পারতো তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়তো ?"

"ও-যে আমার ওপর খুনের নেশায় ঝাঁপিয়ে পড়তো তাতে কোনো সন্দেহই নেই। যাহোক, সেটা হতো দুজনের খেলা। এখন প্রশ্ন হলো আমরা কী এখানেই সময়ের আগে মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাধান করবো না নিউহেভেনের বুফেতে পৌছানো পর্যন্ত না খেয়ে থাকবো।"

সেদিন রাতেই ব্রুসেলস্-এ পৌছে দু-দিন কাটিয়ে দিলাম। তৃতীয় দিন ষ্ট্রাসবার্গে পর্যন্ত গিয়ে উঠলাম। সোমবার সকালে হোমস্ লণ্ডন-পুলিশ দপ্তরে টেলিগ্রাফ করলো আর বিকেলেই দেখলাম হোটেলে আমাদের জন্য উত্তর অপেক্ষা করছে। খাম ছিড়ে টেলিগ্রাফটা পড়ে একটা তিক্ত অভিশাপ দিয়ে আগুণের গর্তে ছুঁড়ে ফেলে দিলো সেটা।

"আমার এটা বোঝা উচিৎ ছিলো" গর্জে উঠলো সে "সে পালিয়েছে !"

"মোরিয়ারিটি !"

"কেবল তাকে ছাড়া পুলিশ পুরো দলটাকেই পাকড়াও করেছে। পুলিশকে সেই কেবল ফাঁকি দিলো। অবশ্যই আমাব দেশ ছাড়ার পর তার সংগে কসরৎ করে এমন কোনো লোক ছিলো না। এখন খেলাটা পুলিশের হাতে। ওয়াটসন, তুমি এবার ইংলণ্ডে ফিরে যেতে পারো।"

"কেন ?"

"কারণ, এখন সংগী হিসেবে আমি মারাত্মক। লোকটার জীবিকা গেছে নষ্ট হয়ে। লণ্ডনে পৌছাবার সংগে-সংগেই সে হারিয়ে যাবে। যদি তার চরিত্র ঠিক মতো বুঝে থাকি তাহলে সে নিশ্চয়ই সমস্ত শক্তি নিয়ে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে শোধ নিতে। আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সে ওরকম কিছু বলেছিলো, আর আমার মনে হয় ও করবেও তা। আমি তোমাকে অনুরোধ করবো তুমি তোমার চিকিৎসা-ব্যবসায় ফিরে যাও।"

এ আবেদন টেঁকে না। যেহেতু আমি প্রথম দিন থেকেই তার কাজের প্রচারক এবং বন্ধু······আধঘণ্টা ধরে চল্লো আমাদের যুক্তিতর্ক। কিন্তু ঐদিন রাতেই আমরা জেনেভার পথ ধরলাম।

চমৎকার একটা সপ্তাহ কাটালাম আমরা রোণ নদীর উপত্যকায় লের্ডক-এ। তারপর গেলাম জেমিনী পাশ। ওটা তখনো ছিলো বরফের তলায়, তারপর ইন্টারলোকেন, মেরিংটন। খুবই সুন্দর ভ্রমণ ছিলো। নীচে মনোরম বসন্তের শ্যামল বিস্তরণ, উপরে অনাস্বাদিত তুষার। আমার মনে কোনো সন্দেহই ছিলো না যে হোমস্ তার মন থেকে কালো ছায়াটা সরাতে পারেনি। কী

আলপাইনের গৃহস্থ ওরিবেশে, অথবা পর্বতকন্দরে সে সবসময়ই তার পাশ দিয়ে যাওয়া লোকগুলির মুখে তার খুঁটিয়ে দেখা দৃষ্টি স্থাপন করেছে। স্পষ্টই বোঝা গেলো, যেখানেই আমরা যাই না কেন—আমাদের পায়ে পায়ে বিপদ জড়িয়ে আছে তাকে কিছুতেই এড়াতে পারছি না।

একবার মনে আছে তখন জেমিনী পাশ দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম। ওপর থেকে একটা বিরাট পাথর সশব্দে গড়িয়ে নীচের লেকের জলে গিয়ে পডলো। মুহূর্তের মধ্যে হোমস্ পাহাড়ে চড়ে একটা চুড়ো থেকে বকের মতো গলা উঠিয়ে চারদিক নজর দিতে আরম্ভ করেছে। আমাদের পথ-প্রদর্শক বৃথাই বোঝাতে চাইলো বসন্তকালে ঐ জায়গায় পাথর ছুটে আসা সাধারণ ঘটনামাত্র। উত্তরে সে কিছুই না বলে, আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। যার মর্ম হলো সে যা চাইছে ঠিক তাই ঘটছে।

এ-সব দেখেশুনেও কিন্তু সে বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ হলো না। বরংচ তাকে এতো উদ্দীপ্ত আর কখনো দেখেছি বলে মনে করতে পারলাম না। বার-বার সে জানাতে লাগলো তার জীবিকার ছেদ সে হাসিমুখে মেনে নেবে যদি অধ্যাপক মোরিয়ারিটির হাত থেকে সমাজ মুক্ত হয়।

"বুঝলে ওয়াটসন্! আমি বোধহয় বলতে পারি আমার জীবন একেবারে ব্যর্থ হয়নি" মন্তব্য করলো সে, "আজ রাতে যদি আমার কার্যকলাপ থেমে যায়, শান্তভাবে আমি সেটা দেখে যাবো। লণ্ডনের বাতাস আমার কাছে মধুরতর। আগের হাজারটা তদন্তে আমি কখনো দুর্বৃত্তদের ওপর এতো শক্তি প্রয়োগ করেছি বলে মনে করিনা।······তোমার সবকিছু স্মারক লেখার ওপর মুকুটের মতো অবস্থান করবে কীভাবে ইওরোপের সাংঘাতিকতম ও সৃজনশালী দুর্বৃত্তকে ধরেছিলাম বা শেষ করে দিয়েছিলাম।······"

মে মাসের তিন তারিখে আমরা ছোট্ট গ্রাম মেঁরিণজেনে পৌঁছালাম। উঠলাম ইংলিশ্চার হফের নিবাসে। তখন অবশ্য বড়জন পিটার ষ্টীলার সেটার দেখাশোনা করতো। বাড়ীর মালিকটি বুদ্ধিমান। সুন্দর ইংরাজী বলে। লণ্ডনের গ্রোসভেনার হোটেলে তিন বছর ওয়েটারের কাজ করেছে। তারই পরামর্শে চার তারিখের বিকেলে আমরা পাহাড় পার হবো আর রোঁসেলোর কুঞ্জে রাত কাটাবো বলে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের বার-বার বলে দেওয়া হয়েছিলো আমরা যেন রাইকেনবাক্ প্রপাতের কাছে না যাই যেটা পাহাড়ের পথে মাঝ বরাবর পড়ে।

সত্যি ভয়াবহ স্থান এটা। গলানো বরফে ফুলে-ফেঁপে ওঠা জলপ্রবাহ বেগে

বয়ে যাচ্ছে গভীর এক পর্বত-কন্দরে। আগুন-লাগা ঘর থেকে ধোঁয়া যেমন গল-গল করে বেরোয়, ঠিক সেই রকম জল পিচকিরি দিয়ে উঠছে।······

জলপ্রপাতকে অর্ধেকটা ঘিরে রাস্তা উঠে গেছে যাতে পরিপূর্ণ দৃশ্যটি উপলব্ধি করা যায়। পথিক যে পথে উপরে উঠে যাবে তাকে সেই পথেই আবার ফিরতে হবে। কারণ রাস্তাটা ওপরে হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে। আমরাও তাই করতে যাচ্ছি এমন সময় দেখলাম একটা সুইস্‌দেশীয় বালক একটা চিঠি হাতে নিয়ে ছুটে আসছে। আমরা যে হোটেল ত্যাগ করে এসেছি সেই হোটেলটার চিহ্ন রয়েছে চিঠিটায়। হোটেলের মালিক চিঠিটা দেখছি আমাকেই লিখেছে। চিঠিতে লেখা আছে আমাদের হোটেল ছাড়ার কয়েক মিনিদের মধ্যে জনৈকা ক্ষয়রোগে মরণাপন্ন ইংরাজ ভদ্রমহিলা হোটেলে এসে পৌছান। শীতকালটা তিনি ডাবো প্লাজ-এ কাটিয়েছেন। বর্তমানে তিনি তাঁর বন্ধুদের সংগে লুসানে মিলিত হতে যাচ্ছিলেন। পথে হঠাৎই তাঁর রক্ত উঠতে আরম্ভ করে। মনে হয় না তিনি কয়েকঘণ্টা আর টিকতে পারবেন। তিনি একটা বিরাট সান্ত্বনা পাবেন যদি কেনো ইংরেজ ডাক্তার তাঁকে দেখে। যদি আমি দয়া করে ফিরি, প্রভৃতি প্রভৃতি। ভালো মানুষ ষ্টীলার আবার পুনশ্চ দিয়ে লিখেছে যদি আমি ভদ্রমহিলাকে একবার দেখে যাই তবে ষ্টীলারকে যথেষ্ট সম্মান দেখানো হবে যেহেতু ভদ্রমহিলা কোনো সুইস্‌ ডাক্তার দেখাতে নারাজ। ফলে সে স্বীকার করেছে, একটা বিরাট দায়িত্ব নিচ্ছে।

এরকম আবেদন ঠেলে ফেলা যায় না। বিদেশে কোনো স্বদেশী মরণাপন্ন এক ভদ্রমহিলার অনুরোধ অস্বীকার করা অসম্ভব। আবার হোমস্‌কে একা ফেলে যাওয়াও চিন্তার বিষয়। শেষে ঠিক হলো আমি মেরিণজেন থেকে না ফেরা পর্যন্ত সুইস্‌ ছোকরা হোমসের পথপ্রদর্শক এবং সংগী-হিসেবে থাকবে। বন্ধুবর কিছু সময় প্রপাতের কাছে থাকবে। তারপর সে রোঁসেলোতে ধীর গতিতে ফিরে যাবে। বললে সে। আর আমি বিকেলের দিকে ঐ জায়গায় তার সংগে মিলবো। ফিরে যাবার পথে দেখলাম একটা পাথরে হেলান দিয়ে রেগে প্রবাহমান জলরাশীর দিকে তাকিয়ে আছে হোমস্‌। হাত দুটো তার মোড়া। এই পৃথিবীতে এই আমার তাকে শেষ দেখা।

নীচে নামবার শেষ জায়গায় পেছন ফিরে তাকালাম। ঐ জায়গা থেকে জলপ্রপাত দেখা অসম্ভব। কিন্তু বাঁকাপথ যেটা পাহাড়ের কাধকে বেড় দিয়ে প্রপাতে পৌছেছে সেটা দেখা যায়। ঐ রাস্তা দিয়ে আমার মনে আছে একটা লোককে দ্রুত উঠতে দেখেছি। সবুজ পশ্চাদপটে তার কালো শরীর আমি স্পষ্ট

দেখতে পাচ্ছি। তাকে এবং যে শক্তি নিয়ে সে উঠে যাচ্ছিলো সবই আমি লক্ষ্য করলাম। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আমি ছুটে চলছিলাম সেটা মনে আসতেই হারিয়ে গেলো সে।

এক ঘণ্টার কিছু পরে আমি মেরিণজেনে পৌছালাম। বুড়ো ষ্টীলার তার গাড়ী-বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

"ভালো কথা" তাড়াতাড়ি কাছে পৌছাতে আমি বললাম, "ওনার খারাপ কিছু নিশ্চয়ই হয়নি ?"

আশ্চর্য হবার ভাব তার মুখে ফুটে উঠলো। তার ভুরু কুঁচকে ওটার সংগে সংগে আমার হৃৎপিণ্ড সীসের মতো শক্ত হয়ে গেলো।

"আপনি কী এই চিঠিটা লেখেননি ?" পকেট থেকে চিঠিটা বার করে তাকে বললাম, "হোটেলে কী কোনো রুগ্ন ইংরেজ ভদ্রমহিলা নেই ?

"নিশ্চয় না," বল্লে সে। "কিন্তু দেখছি চিঠিটার ওপর হোটেলের চিহ্ন আছে। হায়, হায়! এ নিশ্চয় সেই ঢ্যাংগা ইংরেজটার কাজ। যে আপনারা চলে যাবার পরই হাজির। সে বলছিলো—"

কিন্তু আমি হোটেলওলার ব্যাখ্যা শোনবার জন্ম আর দাঁড়িয়ে রইলাম না। ভয়ে-আতংকে আমি ইতিমধ্যেই গ্রামের রাস্তায় ছুটলাম। যে পথে এইমাত্র এলাম সেই পথেই আবার ছুটে চল্লাম। একঘণ্টা লেগেছিলো নেমে আসতে। আমার সবচেষ্টা সত্ত্বেও দু ঘণ্টা লাগলো বাইকেনবাক্ জলপ্রপাতের কাছে আবার ফিরে যেতে। যে পাথরের আড়ালে হোমস্ ঝুঁকেছিলো ঠিক সেইখানে তার পাহাড়ে উঠবার ছড়িটা হেলান দেওয়ানো। কিন্তু তার কোনো চিহ্ন নেই। বৃথাই আমি তাকে ডেকে মরলাম। আমার কণ্ঠস্বরই চারধারের পাহাড় চূড়ায় প্রতিধ্বনিত হয়ে আমার কাছে ফিরে এলো আমারই উত্তর হিসেবে।

ঐ পাহাড়ে-চড়া ছড়িটাই আমাকে অসুস্থ আর ঠাণ্ডা করে দিলো। তাহলে সে রোজেনলৌতে ফিরে যায়নি। তিন ফুট চওড়া রাস্তাতেই সে দাঁড়িয়েছিলো যার একদিকে খাড়া দেওয়াল আর অন্যদিকে খাড়া ঢালু, যতোক্ষণ পর্যন্ত না তার শত্তুর তাকে মেরে ফেলেছিলো। সেই সুইস্ ছোকরাও উধাও। সে-ও নিশ্চয়ই মোরিয়ারিটির মাইনে করা লোক। এবং দুজনকে একা রেখে কেটে পড়েছে। তারপর কী ঘটলো? কে আমাদের বলবে তারপর কী ঘটলো ?

দুই কী এক মিনিট নিজেকে ফিরে পেতে সময় দিলাম। আতংকে আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর হোমেরই পন্থা অনুসরণ করলাম এই

বিয়োগান্ত ব্যাপারটা অনুসরণ করতে। হায়রে! ওটা যে খুব সহজেই করা যায়। আমাদের কথাবার্তা চলার সময় আমরা রাস্তাটার খুব বেশী-দূর যাইনি। আর ঐ পাহাড়ে-চড়া ছড়িটা তো বলেই দিচ্ছে আমরা কোথায় দাঁড়িয়েছিলাম। জলের ছটায় মাটি সবসময়ই নরম। এমন কী সামান্য একটা পাখীর পায়ের ছাপও সে ধরে রাখে। দু-জোড়া পায়ের ছাপ রাস্তার দূরপ্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে। কিন্তু কেউ ফিরে আসেনি। পায়ের ছাপ শেষ হবার পরই জমিটা ঘোষ খাটালের জমির মতো চষা, কাদায় ভর্তি। ফার্ণ আর কাঁট-গাছ যেগুলি একটা গহ্বরের মুখ সাজিয়েছেলো, সেগুলি ছেঁড়া আর কাদায় ভর্তি। আমি ঝুঁকে গহ্বরে দেখতে লাগলাম। মুখের চারধারে জলের ছটার জলকণা ছিটকে পড়তে লাগলো। আমার স্থান-ত্যাগের পর অন্ধকার আরো ঘনিয়ে উঠেছে। তাই এখন কেবল আমি দেখলাম কালো দেওয়ালের ওপর এখানে-সেখানে জলের কিছু ঝিকিমিকি, গহ্বরের দূরপ্রান্তে যেখানে জলের রাশ নেমেছে সেখানে জলের ঝলকানি। আবার চিৎকার করে ডাকলাম। অর্ধেক মানুষের স্বর আর অর্ধেক জলপ্রপাতের শব্দ মিশিয়ে একটা শব্দ আমার কানে ফিরে এলো।

আমার সংগী আর সাথীর কাছ থেকে শেষ বাণীও যে আমিই শুনবো এটাও যেন ভাগ্য-নিয়ন্ত্রিত। আমি পাথরটার গায়ে হেলানো পাহাড়ে-চড়া ছড়িটার কথা বলচি। এই পাথরটার ওপর কোনো একটা জিনিষ যেটা ঝকমক করছিলো আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। হাত দিয়ে জিনিষটা তুলে দেখলাম এটা হচ্ছে তার সিগারেট-খোপ যেটা সে সবসময় তার কাছে রাখতো। এবার ওটা তোলার সংগে-সংগে চৌকো কাগজ যা সিগারেট-খোপে চাপা দেওয়াছিলো পত্‌পত্‌ করে উড়ে মাটিতে পড়লো। খুলে দেখলাম ওতে আছে হোমসের নোটবই থেকে ছেঁড়া তিনটি পাতা। লেখাটি আমারই উদ্দেশে। লোকটার বৈশিষ্টা চিঠিতে পরিপূর্ণ। সেই আগের মতোই নির্দেশ, দৃঢ় আর পরিষ্কার লেখার ছাঁদ। মনে হলো যেন চিঠিটা সে তার লেখার টেবিলে বসে লিখেছে।

প্রিয় বন্ধু ওয়াটসন্—মোরিয়ারিটির সৌজন্যে এই কয়েকছত্র আমি লিখছি। সে আমাদের মধ্যেকার শেষ আলোচনা আর বোঝাবুঝির জন্য অপেক্ষা করছে। কীভাবে সে ইংরেজ-পুলিশদের পাশ কাটিয়েছে আর আমরা কী করছি না করছি তার সংবাদ কীভাবে রাখতো তার একটা খসড়া দিয়েছে। তার ক্ষমতার সম্বন্ধে আমি যে ধারণা করেছিলাম এগুলি তারই প্রমাণ। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে এর বর্তমানে সমাজে যে অপরাধগুলি হতো এখন থেকে সেগুলি আর হবে না।

সমাজকে এই লোকটার স্পর্শ থেকে মুক্তি দেবো আমিই। কিন্তু মূল্যটার জন্য আমার বন্ধু-বান্ধবরা ব্যথিত হবে। বিশেষ করে আমার প্রিয় বন্ধু ওয়াটসন্। আমি আগেই বলেছি আমার জীবিকা একটা সংকটজনক অবস্থায় পড়েছে, এবং তার সমাধান এর থেকে ভালোভাবে আর কিছুতেই হতে পারে না। তোমার কাছে পরিপূর্ণ স্বীকারোক্তি করছি—মেরিঞ্জেন থেকে আসা চিঠিটা ছিলো ভুয়ো। আমি তোমাকে যেতে দিতে চেয়েছিলাম যা এখন ঘটলো ওরকম একটা ঘটনা ঘটবে বলে আমি আশা করেছিলাম। ইনেস্‌পেক্টর প্যাটারসনকে বলো কবুতর-খোপে (এম-মার্কা) 'মোরিয়ারিটি' নামে যে চিঠিপত্রগুলি আছে সেগুলিই এই দলটিকে ধরিয়ে দিতে পারবে। চিঠিপত্রগুলি একটা নীল রংয়ের খামে আছে। আমার ইংল্যাণ্ড ত্যাগের আগে আমার সমস্ত সম্পত্তি বিলি-ব্যবস্থা করে আমার ভাই মাইক্রফটকে দিয়ে দিয়েছি। শ্রীমতী ওয়াটসনকে আমার শুভেচ্ছা জানাইও।······

তোমার একান্ত বিশ্বস্ত—শার্লক হোমস্।

শেষে, ব্যাপারটার পরিণতির জন্য দু-চার কথাই যথেষ্ট। বিশেষজ্ঞদের পরীক্ষায় ধরা পড়লো, দুজন মানুষের হাতাহাতিতে শেষ পরিণতি যা ঘটে, এখানেও তাই ঘটেছিলো। দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে ঘুরে পড়ে যায়। ওদের দেহদুটো উদ্ধার করা অসম্ভব। ঐখানে ঐ ঘূর্ণমান জলের কড়াইয়ের মতো জায়গায়, ঐ বিক্ষুব্ধ ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে শুয়ে আছে চিরকালের জন্য দুজন মানুষ—দুর্ধর্ষতম অপরাধী আর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যান্বেষী। সেই সুইস্ ছোকরাকে আর পাওয়া গেলো না। এবং সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে মোরিয়ারিটির মাইনে করা অনেক লোকের মধ্যে সেও একজন। আর দলের কথা বলতে,—হোমসের দেওয়া সূত্র থেকে সম্পূর্ণ দলটার অপরাধ সাধারণের কাছে প্রকাশ করে দেওয়া হলো। আর ঐসংগে এও জানা গেলো—মৃত লোকটার কী বিরাট প্রভাব দলটায় ছিলো। মামলা চলাকালে তাদের দলপতির কীর্তিকলাপে আরো কিছু প্রকাশ পেলো। এখন আমি এই লোকটার ব্যাপারে সব কিছু খোলাখুলি লিখতে বাধ্য হলাম। যেহেতু কোনো অসাধু-মানুষ একে বড় করতে গিয়ে একজনের ওপর আক্রমণ চালিয়েছেন—যাকে আমি মনে করি আমার জানা-শোনা সমস্ত মানুষদের মধ্যে মহত্তম ও বিজ্ঞতম।

ভূত আমার পুত

রবার্ট লুই ষ্টিভেনসন্

ডাল উপত্যকায় বেলওয়ারী গির্জায় রেভ: মুরডকস্থলি বহুৎদিন ধরে ধর্ম-যাজকের পদে ছিলেন। দেখতে মুখটায় কিছু কালো, কঠোর প্রকৃতির বুড়ো মানুষটা তাঁর শ্রোতার কাছে কিছুটা নির্দয়। জীবনের শেষ সময়টা নিবান্ধব এমন কী চাকর-বাকর ছাড়া তাঁকে ঝুলন্ত "শয়" বিচ্ছিন্ন গির্জায় কাটাতে হয়েছিলো। লৌহ কঠোর অনুশাসনে থাকা সত্ত্বেও—চোখ তাঁর বন্য, ভীত আর অস্থায়ী। গির্জার বাইরে কোনো দীক্ষা-মন্ত্রে মনে হতো চোখ তার ঝড়ঝঞ্ঝা সবকিছু ভেদ করে অসীমের বিভীষিকায় পৌঁছিয়েছে। অনেক যুবক-যাজক শিক্ষার শেষ ভোজে তাঁর কথাবার্তায় গভীরভাবে আকৃষ্ট হতো। পিটার প্রথম—শ্লোক অষ্টম আবৃত্তি করতেন তিনি। "শয়তান হচ্ছে একজন গর্জনশীল সিংহ।" আগষ্টের ১৭ তারিখের পর তাঁর বেদীর ওপর দাঁড়ানো ব্যক্তিত্ব এবং ভীতিজনক আচরণ শাস্ত্রের বিষয়বস্তুকে পিছু ফেলে যেতো। বাচ্চারা ভয়ে অজ্ঞান হতো আর বয়স্করা দেখাতো দ্বিধাগ্রস্থ।

ছোটো গ্রামটার পরস্পর বিরোধী আলোচনার ঢেউ উঠতো সমস্ত দিনটা ধরে। গির্জা ছিলো ডাল জলাশয়ের একদিকে। ঘন গাছের আড়ালে। একদিকে ঝুলেছিলো 'শয়' পাহাড় অপর দিকে ছিলো অসংখ্য বরফে ভরা পাহাড়ের চূড়া, আকাশের দিকে মাথা তুলে। ভালো-মন্দ যারা বিচার করতে শিখেছিলো তারা পাদরী বাবা সুলির কার্যভার নেবার গোড়া থেকেই সন্ধ্যার পর স্থানটা এড়িয়ে চলতো। স্থানীয় মদের ভাঁটির আড্ডাধারীরা রাতে ঐ গোলমেলে জায়গা দিয়ে যাবার নাম শুনলে মাথা ঝাঁকিয়ে অস্বীকার করতো। ঐ পাহাড়িয়া অঞ্চলের, বিশেষ করে একটা জায়গাকে ওরা ভয় করতো। গির্জাটা দাঁড়িয়ে ছিলো বড় রাস্তা আর ডালের জলের ধারে। সম্পূর্ণ জায়গাটা ছিলো আবার প্রাচীর দিয়ে ঘেরা! গির্জার পিছনে প্রায় আধ-মাইল দূরে ছিলো বেলওয়াড়ীর কির্ক শহর। নদীর আর রাস্তায় মাঝে ছিলো একটা পড়ো বাগান কাঁটা গাছ আর ঝোপ-ঝাড়ে ভর্তি। পাদরী সাহেবের থাকবার বাড়ীটা দোতলা। ওপর আর নীচ তলাতেই দুটো করে চারটে ঘর। সদর দরজার সামনে একটা পাথুরে রাস্তা। ঐ রাস্তার একদিকে বড় রাস্তা অপর দিকে উঁচু উঁচু এগুার আর উইলো গাছের জটলা। নদীর ধার দিয়ে ওরা গজিয়ে উঠেছে। এই পাথুরে জায়গা আর তার আশপাশ কম বয়সী বেলওয়াড়ী যাজকদের মধ্যে

কুখ্যাত হয়ে উঠেছিলো। পাদরী গুলি অনেক সময় সন্ধের পর ঐ জায়গায় এক৷ একা ঘুরে বেড়াতেন আর অনুচ্চারিত স্বরে প্রার্থণার মতো কিছু বলতেন। পাদরী সাহেব দেশে ফিরে গেলে আর তাঁর বাসস্থানে তালা ঝুলে—স্কুলের খুব দুঃসাহসী ছোঁড়ারা বুকের ধুকপুকানি নিয়ে 'মহাজন যে পথে করে গমন' বলে ঐ কুখ্যাত পথ পেরিয়ে যেতো। সংখ্যায় কম, উটকো পথিক বা ব্যবসায়ী যে ও অঞ্চলে আসতো সে-ই ভয়-জড়ানো, গোঁড়া, নিষ্কলংক পাদরী সাহেবের ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসা দেখাতো। মজার কথা হলো গির্জার অনেক লোকই জানতো না, আবার যারা জানতো তারা মুখ খুলতো না রেভ: সুলির যাজকত্বের প্রথম বছরে কী কী অদ্ভুৎ ঘটনা ঘটেছিলো। কেবলমাত্র কখনো-সখনো বুড়ো এক আড্ডাধারী তৃতীয় পাত্র মদ টেনে সাহস সঞ্চার করে বলতে পারতো কেন যাজক মশাইকে অদ্ভুৎ দেখায় আর কেনই বা তিনি নির্জনতা পচ্ছন্দ করেন।

"বোয়েলে, দু-কুড়ি দশ বছর আগে পাদরী বাবা য্যাকন একানে এয়েলো ত্যাখন এক্কেবারে ছোকরা—দশ বুক সাহস আর এ্যাতো নেকাপড়া। কী সোঁদর বক্তিমে। কিন্তুক যা হবার, কথাটা বুয়ে দ্যাকো, ধম্মোর বিয়াপারে কোন্ অভিজ্ঞতা লাগবে? ছোকরা গুণা বেবাক্ ওর পেছু পেছু নড়ে, যেন কাকের পেছু ফিংগে। কিন্তুক বুড়ো মাগীগুণা পটেনা। পাদরী বাবাগুনা অনেক কলেজে নেকাপড়া করেলো আর এ্যাকানে য্যাকন এয়েলো বিস্তর অসুবিধা। দরকারী বুলতে গ্যালে কিছু না পেয়েলো। গির্জের বিস্তর বই। ওতো গুণা গির্জেয় আগে কখনো দ্যাকেনি কেউ। মজা দ্যাকো, ও-গুণা কিন্তু সব ধর্মের বই লয়কো। কতো বই কতো তার নেকা। আবার শোনো, উনি আবার একটা বই নিকতে আরম্ভ করেলো। কে জানে কী—তার নেকা। ওই টুকু ছোকরা—ঐ তো বয়স কী সে নিকেলো?

ঘর-গেরস্থালি তো করতে হবেক। তা কেডা-ই বা ঘর নিকোয়, আর হেঁসেল ঠ্যালে। নেই সময় যেতো নাওয়া-খাওয়া। তাই, বুড়ী মাগীর এ্যাক দরকার পড়েলো। খোঁজ খোঁজ। কে জানি কেডা খবর দিলো বুড়ী মাগী জিনেত মক্কোর বাত্তা অনেক মনিষ্যি পেঁকোলো,—ওনাকে নিয়োনিকো, যোগের কথা শুনো, ও মাগী ডাইনী, পেত্নীর দোসর। পেরতয় কী? এ এক্কেবারে চোকে দ্যাকা। ছাওয়াল পাওয়াল গুণা, তোমরা তো জানো, দেখেলো, ও মাগী ডাইনীগুণার মতো এ্যাকানে সেকানে এলো চুলে সাঁজের আঁধারে ঘুরে বেড়ায় আর আপন মনি বিড বিড় করি কী সব বুলতে নাগে। কথাডা খেয়াল রেখো। জমিদারবাবু গায়ে পড়ে পাদরী বাবাকে বুলতে গিয়েলো জেনেস্তের

বাক্যি। কিন্তু উনি লারলেন। বুড়ো নোকেরা বয়েলো জেনেত চ্যালো পেত্নীর বাঁদী। তা বাবা কুসংস্কার আর কী সব বলি হাঁকায়ে দিয়েলো। আবার মজা ত্থাকো, মানুষগুণা য্যাকন বাইবেল খুলি ত্থাকায়—উনি চটেমটে কেতাব ছুড়ে দিলেন। বয়েলো—"শয়তানকে মোরা বেঁধে রেখেছি!" শোনো কথা।

ব্যাপারটা যখন চাউর হয়েলো যে জেনেত বাবার থানে দাসীর কাজে যাবি, ওমনি ছেলে বুড়া, ধেড়ে মাগী সব কডা যেন ক্ষেপি গিয়েলো। মাগীগুণা আর কি বা করতি পারি? তারা দরজায় কুলুপ আঁটি নিজের বাচ্চাগুণার ওপর নজর রাকতি নেগেলো। ওমা, তারপরের কাণ্ড শোনো,—একদিন জন ট্যানসনের দু-দুটা ছাওয়াল মরি পড়ি রয়েলো। ধর ধর জেনেত ডাইনীটাকে ধর। মাগীর মুখে আর রা কাড়েনা! বাঁধি নে চল্লো সব কডায়। কিন্তু নিলি কী হবি। আবার যা রাম তাই গংগা। উল্টে সেদিনডায় আরেকডা মানুষ খতম হয়েলো। এবার ঘরের মাগগুলি যেন ক্ষেপি গিয়েলো। হাতে নাতে রাক্কুসীকে পেড়ে ফেল্লে এ্যাকদিন। পিঠের চামড়া ছিড়ি ঝুঝুনি দে লছ ছুটাই দিয়েলো। তারপরডায় ডালের জলে ফেলি সে কী নাকানি-চোবানি। বলতি নেগেলো সবকডা মিলি,—যদি তুই ডাইনী হস; ডুবি মরবি আর যদি ডাইনী না হস, সাঁতরে নদী পার হবি। কী বা বলবো—তার পাপের শাস্তির বদলে কে এয়েলো জানো সেডা? পাদরী বাবা নিজ্জি এয়েলো। চাঁদপানা গলায় বলতি নেগেলো পাদরী বাবা, "মায়েরা আমার! আমি আপনাদের কাছে মিনতি করছি একে ছেড়ে দিন!"

জেনেত দে-ছুট! একেবারে পাদরী বাবা পায়ের গোড়ে। মাগীটা ত্যাকন ভয়ে বেরাক সাদা! বলতি নেগেলো, দোহাই বাবা যেশুর যোগে বাঁচাও! এই এদের হাত থেকে বাঁচাও মোগে!

ঘরের বৌ-ঝিগুনা তারাও বা ছাড়বে কেনো তাদের হক-ডা? খুলে দিলো সব বেতাগু-ডা।

ত্যাকন পাদরী বাবা পুছ করালো, "বোন! তোমার সম্বন্ধে যা শোনা যাচ্ছে, তা কী সত্যি?"

"ভগবান আমায় যেমনডা রেকেছেন" জেনেত বয়েলো, "তিনিই মোর ছিষ্টি কত্তা। আর মুই জানিনা। ভুলে যান ছোটোগুনার কথা" বক্তিমে জুড়ে দিয়েলো সে, চিরকাল যেমন চলে এয়েছি। আজো মুই সেই রকম ভালোডা আছি।"

"তুমি কী" বল্লে পাদরী বাবা শুলি, "ভগবানের নামে আর তাঁর এক দীন সেবকের কাছে শয়তান আর তার আচরণকে নিন্দা করবে?"

সবিশেষ শোনো সবাই, এবার কী হয়েলো। শয়তানের কথাটি শুনি তার দাঁত বের হয়েলো। সে কী দাঁত আর তাদের মাড়ি ঘিরে ঝন্-ঝন্ শব্দ! জেনেত একসময় হাত তুলি সবকডার সামনে শয়তানের নিন্দা করেলো।

"এখন তোমরা," ঘরের বৌ-ঝিদের বল্লেন তিনি, "ঘরে ফিরে যাও আর ভগবানের নিকট করুণা ভিক্ষা করো।"

আরো শোনো কেচ্ছা-ডা। তিনি জেনেতের হাত-খানা ধরি বড় ঘরের ঝিদের মতো গ্রামের মধ্যে দে নিজের বাড়ী বই নে গ্যালো। আর সে ছুরির কী দাঁত নাড়ানির হাসি!

ঝুঝকো আত পর্যন্ত তো ধাড়ী মানুষগুণা কেরষ্ট বাবাকে ডেকেলো। কিন্তু করলি হবি কী সারা গিরাম-ডা য্যান খাঁ-খাঁ। ছাওয়াল পাওয়ালগুণা ভয়ে তো সিঁটিয়ে মরে। বুড়োধাড়ীগুণা পর্য্যন্ত ঘরে খিল আঁটি ঝিম মেরে গিয়েলো। কিন্তুক বেত্তান্ত-টা কী? না জেনেত আসতি নেগেছে—ঐ সে আসতিছে! ঘাড়-ডা এদিকপানে ঝুলে—যেন কেডা ওনাকে ফাঁসি দেছে। হাসিডা খ্যাকো! কেমন দাঁতের ছিরকুটা'ন মুখে মাগীর, বুঝ করি খ্যাকো, কেরস্তানদের বাকিয় নাই। দাঁতগুণা যেন কেঁচির মতো ঝন্ঝন্ শব্দ কত্তি নেগিছে ভগবানের নাম তো মুখি নাই—যদি বা বলতি চেয়েলো—মনডায় বলে কামড়াতে এয়েলো সে! কতোই বা বুলবো—যতো না বুলা যায় ততো-ডাই ভ্যালা! কিন্তুক কেডা বা বুঝায় পাদরি বাবাকে? উনি বুলতে নেগলেন—কাচ্চা-বাচ্চা-গুণার জ্বালায় ওডা ওমন ধারা।

দিন যায় ক্ষণ যায়, অকর্মার ধাড়ীগুণা ঐ কেলেংকারীডা আরো যেন বড় করি খ্যাকতে নেগোলা। কিন্তুক পাদরী বাবা যে দিন দিন ক্ষয় হত্তিছে সে-ডা কে খেয়াল করি? উনি তো ওনার নেকাপড়ার জন্যি রাত বারোডা পর্যন্ত কাটাতি নেগেলো। জেনেত নিজের মনি চলে, কেউ কথাডি কয়না। কিন্তুক বদনাম যা হবার তাতো হয়িচে।

জুলাই মাসডার শেষতক কালডা বড্ড খারাপ হয়েলো! গরম গরম খালি গরম। এরম গরমডা আর কেডা কবে দেখেলো! কাচ্চাগুণা খেলা ভুলি ঠাণ্ডা মেরি গিয়েলো। যদি বা কখনো-সখনো দু-ফোঁটা বিষ্টি হয়েলো তো ধত্তি মা শুষে নিয়েলো। মনডা বুঝ করেলো এই হকাল-টা তো আকাশ-ডা ভালো হবেনি। হায়, হতোস্মি! মানুষগুণার চায় সুলি বাবার মুশকিলডা বড্ড

বেড়েলো। নোকটার না আছে খাওয়াডা না আছে শোওয়া-ডা। তেনার য্যাকন নেকাপড়া বন্ধ তো উনি চল্লেন চারপাশডা ঘুরতি।

কালো পাথরডার পাশে একটা ঘেরাপানা জায়গা তোমরা দেয়েলে? ও-ডায় অনেকদিন আগে একডা কবরখানা ছেলো জায়গাডা লোহার বেড়ায় ঘ্যারা। কেরষ্টেব ধর্ম্মোডা য্যাকন চাউর হলো, ত্যাকন কেউ ওদিকপানে যাতি ডর পেতো না। ওই জায়গাডায়-ই আবার স্থলিবাবা ঝিম্ মারি বসি থ্যাকতো। কী না উনি যেশুর উপদেশ গবেগণা কত্তি নেগেচেন। ঐ কালো পাহাড়ডায় একদম পশ্চিম পাড়ে চলি আলেন সেদিন। ওমা! কী ত্থাকলেন বুঝ করো। পেরথমে তুটি তারপরডা চার শেষ মেষডায় সাত-সাতটা দাঁড়কাক ক্যা ক্যা করি একটা পাশে ঝটপট্ কত্তি নেগিচে। ওনারা ক্যানে ওমন কত্তি নেগেলো? নিশ্চয়ই কিছু আছে ওখানডায়। স্থলি ডরপোক মানুষডা লয়। মানুষটা ত্থাকলেন একটা নোক হোথায়—ঐ এক কবরে বসি। নিকষ কালো আর দত্যির মতো চেহারাডা। আর মুখডার কী বেত্তান্ত ভাবো? স্থলিবাবা আগে পরে অকেন কালো মানুষের ব্যাপার শুনেলো। কিন্তু এবার ভয়েডর নেগেলো। এমন কালো মনুষ্যি তিনি না ত্থ্যাকেচেন না শুনেচেন। একডা ঠাণ্ডা পাণি যেন তেনায় হাড়গুণার মধ্যে চলতি নেগেলো। বয়েলো তিনি, "ভাই তুমি কী এখানে নতুন এয়েছ? কিন্তু বাকিয় নেই কালো মানুষডার। পায়লে গিয়েলো সে। নিশিতে পেয়েলো যেন স্থলি বাবাকে, পেছু হটতে নেগলেন তিনি। ছুট-ছুট, দে ছুট। কিন্তু কোথায় তেনার নাগাল? শেষমেষডায় তেনাকে পাহাড়ডায় তলায় এ্যাকবারডির জন্ম দেকলো। তারপরডায় ডালের পানির মধ্যি দে গীর্জা-পানে সেঁধুলে মানুষডা।

স্থলিবাবর মনডায় কিন্তু সুখ নেই। কেননা, ঐ কেলে মানুষডা কী মানুষ না ভূত কেডা কবে? ছুটতে নাগলেন তিনি বড় রাস্তাটায়। না সেডা নেই। ব্যাগানডা তল্লাস করি কিছু প্যালেন না। এক সময় ঢুকি গেলেন গীর্জাডায়। ওমা, বনে যাবো গো! সামনেডায় দায়ড়ে আছে জিনেত! ঘাড়ডা এক পাশডায়—যেন কেউ ফাঁস দিয়েলো। মেয়েডা বা মেয়েডার ডান যেডাই বলো না তুমি—বাবাকে দেহি মোটেই স্থক্ প্যালে না। কিন্তুক মেয়েডার পাণে তাকাতে স্থলিবাবা ঠিক আগডার মতো ঠাণ্ডা মেরি গ্যালো।

"জানেত" বল্লেন তিনি, "তুমি কী একটা কালো লোককে দেখেছ?" "কালা-পানা লোক?" বয়েলো জানেত "হেইমা, রক্ষে করো! পাদরীবাবা

তুমি ভলো করোনি। বেওয়ারীতে কোনো কালো মানুষ নেই—নিচ্চয় করি বলত পারি।"

তোমরা বুঝ করে দ্যাকো কথাডা জেনেত কিন্তু সরলমনে সারেনি। "উত্তম" বয়েলো বাবা, "জেনেত, কালো মানুষ যদি নাই থাকবে তাহলে আমি যে কথা বল্লাম—"

ব্যাস্ পাদরী-বাবা ভূঁইয়ে বসি হেঁপো রুগীডার মতো হাঁপাতে নেগেলো আর মনে লয় দাঁতগুণা যেন তাঁর মাথায় করাত চালাতিচে।

"কুথা যাবো গো", জিনেত বয়েলো "কী ঘেন্নার কথা!" আর ওমনি তেনাকে এক পাত্তর বেরাণ্ডি তাড়ি থ্যাতি ছ্যালে।

এ্যাক সময় তো স্থলি বাবা তাঁর নেকা-পড়ার ঘরডায় সেঁধুলে। কী ঠাণ্ডা-রে বাপ ঘরডায়! কিন্তুক গরম হওয়ার হল্কা-ডা, হঠাৎ এয়লো কেন? নিকনেই মাটি গুড়াবার চুল্লী। লোকডা চিন্তায় যেন উথালি-পাথলি খেতি নেগেলো। বেওয়ারীতে আসা তক বেত্তান্ত মনি কত্তি নেগেলো বার বার। মনে তার কালো মানুষডার কথা এয়োলো। ভগমানকে ডাকতি চেষ্টা করে তো ঘুরিফেরি সেই কলোডা মনি আসে। দাদুনি দে ঘর্ম বাই যায় দেহডার পর। না পারে এক বন্ন নিকতে না পারে এ বন্ন পড়তি।

উঠে পড়ি জানলা দে ডালের পাণি-পানে তাকাতি গ্যাকেনি জিনেত পাণিতে বস্ত্র কাচতি নেগেচে। বনডা হোথায় বেজায় ঘন আর গীর্জার তলাডায় পাণি একদম কালোপানা। জিনেত কিন্তু মনে করো স্থলি বাবাকে গ্যাকেনি। বাবার দিকপানি পেছনডা দি সে কাজ করতিচে। রহস্য বুঝ করো। স্থলি বাবা কিন্তু বুঝতে পারিনি সে কোনডা গ্যাকচে বা কী গ্যাকতি চায়ডা। কিন্তুক সেই যে ঠাণ্ডা স্রোত যেডা সে দেহডার পর বোধ করতি নাগতো—সেডা মেয়েডা মুখ ঘুরাতি ফিরি এয়েলো। তার মানি এয়েলো গাঁয়ের নোকগুনা কী বলে— ওরা বলি যে জেনেত বহুৎদিন তক মারা গ্যাচে, ওডা জেনেতের পেতনী। ঠাণ্ড-কালো-কাদার দেহের মধ্যি ভূত। বাবা সরি আসি আরো ভালোকরি গ্যাকলো। উই মোর বাপ! মুখড কী কালো। আবার সে গান গেয়েলো। যতোডা জোরি পারে গাইলে! কিন্তুক একবর্ণও কেউ বুঝতে নারবে। এর পরডায় মানুষডা নিজেকে গালি গ্যালো—ও মেয়েডা একা, কতো সন্দেহ কতো হেনেস্তাডা ক'র। শেষমেষ সে নিজ ওর জন্যি ভকমানকে ডাকতি নেগেলো। তারপর ভয়ে এক গিলাস্ ঠাণ্ডা পানি খায়ি অন্ধকারডায় বেছানার মধ্যে স্থতি গ্যালো।

উ রাতডার কথা বেওয়ারীর কোনো মানুষজন কখনো ভুলবি না। মনে করো সেডা ছ্যালো ১৯১৮ সালের আধকুড়ি সাত দিন আগষ্ট মাসের। ও মাসডায় রোজই গরম—কিন্তুক ঐ দিনডার গরম সবাকার সেরা। সুর্যি ঠ্যাকতাকে কালো-কালো ভীষণ ঠ্যাকতি ম্যাঘে ঢাকি ছ্যালো। কোথাও একটা তারা কী একটু হাওয়া কিছুই নাই। এরকম আঁধার যে তুমি তোমার হাত ঠ্যাকতে পাবা না। সে এ্যাক বিতকিচ্ছিরি অবস্থা সুব্রল বাবার। এ্যাকবার জাগে তো এ্যাকবার ঘুমোয়। সমস্ত দেহডায় কেডা যেন আগুনে পোড়ায়। মাঝি-মধ্যি শোনে কোথাও বা ফিস্‌ফিসানি। হাড়গুলা যেন ভাজা-ভাজা। কেডা কুথায় নাই। হঠাৎ কেডা বা মরাকান্না জুড়ি দ্যালো! বাবা মনে করতে নেগেলো কেড' বুঝি মারা গ্যালো। সময় সময়ডা তার মনডা বলে ভূতেরা বুঝি নেত্য করতিছে—

ঝুঝকো-বেলাডায় উঠে পড়ি বেছানার ধারে গবেষণা জুড়ি দ্যালো। জেনেত আর ঐ কালো মানুষডার কথা। হঠাৎ কী হতি কী হয়েলো তার মনডা বলি উঠলো—জেনেত আর ঐ কালো মানুষডার কিছু না কিছু সম্বন্ধ আছে। হয় এ্যাকজন না হয় দুজনাই ভূত। আর ঐ সময়ডায় তার পাশে জেনেতের ঘরডায় ঘোর শব্দ! তারপরডায় তার বাড়ীর চারডি কোনায় সে-কী ব্যতাসের ধূম। সময় গেলি আবার সব চুপ।

কিন্তুক সুলি বাবা না মানুষ না ভূত।

মোমবাতিডা ধরাই সেঁধুলেন জেনেতের বন্ধ ঘরডায়, লাথ মার্, দরজাপানে। হেই মা! কুথা-যাবা-গো। কেউ কুথাও নেই! আকেন, আকেন বড় ঘর। পাদরী-বাবার ঘরডার মতো বুঝ করো। চারপেয়ে খাটডায় চাদর-মাদুর কুথায় কিছু নেই। কুথায় নেই একফোঁটা ডা-শব্দ। কেবল একটা কালোছায়া মোমবাতিডা ঘিরে পাঁকখেতি নেগেছে। উরি-বাপ! তারপরডাই হলো সাংঘাতিক ব্যাপারডা। ডর প্যালেন বাবা আমার, ভীষণ ডর! শির-শির করি কাঁপন দেলো দাদুনি দে। চুলগুনা যেন খাড়া মাথাডার মধ্যি দাঁড়ায় গিয়েলো। একডা জেজীর্ণ আলমারির ধারডায় জেনেত-গলায় দড়ি দে ঝুলতে নেগেচে। ওপরে দড়িডা একডা প্যারেকি বাঁধা। ধরডা একদিক কাত করা, ব্যা-করা মুখ দে লাল জিভ্ হিরফুটানি থ্যাচে। মনি করো তার পা-দুখানি ভূঁই থেকে দু-হাত ওপরে দোল-খাতিচে।

"ভগবান আমাদের ক্ষমা করুন!" গবেষণা করেলো সুলি বাবা।

"জেনেতের দেহান্তর হয়েছে।"

আরো কাছে চলি গ্যালেন সে। মজা ছাকো একডা প্যারেক থাকে একডা পুরাণো তারে, তার দেহডা ঝুলতে নেগেচে!

সাবাশ মানুষ-করো পাদরী-বাবা সুলিকে। ওই ঝুঝকো-রাতে একলা-মানুষ ভূতের কাছে ছ্যাংেন। চলি অ্যালেন সে দরজাড। পেছুপানে বন্ধ করি। সিঁড়ি-দে আস্তে-আস্তে বাতি ধরি নেমি গ্যালেন তিনি। একদম নীচে বাতিডা রাখি পেরথনা করতি নাগলেন। কিন্তু হা হতোস্মি। না পারেন চিন্তাডা না পারেন পেরথনাডা। দাহুনি দে ঘর্ম ঝরতি নেগেলো। কতক্ষণ ঠায় দাঁয়ড়ানো ইয়াত্ত লাই। একপেহর, দু পেহর? কেডা বলে। ত্যাকনি সে শুনেলো একডা হাসি। সে কী বিকট হাসি, লহুডা যেন হিম মারি যায়। যেখানডায় মড়াডা দোলখেতি নেগেছে ঠিক ওই জায়গাডা পর কেডা যেন হাঁটি-বেড়াচ্ছে। পেতায় করে', দরজায় সে নিজে হুড়কো দিয়েলো, সে দরজাডা খুলিগ্যালো। মানুষডা স্পষ্ট পেতায় করেলো—জেনেত যেন ওপরডার রে লংয়ে ভংগি তারপানে ড্যাব্ ড্যাব্ করি তাকায়েচে।

পাদরী-বাবা সুলি মোমবাতিডা নে (ওলোক আলো-ব্যতিরেক ত্যাকন চলতি নারাজ) পাথুরি রাস্তাডার পথ ন্যালো। বুঝ করো ঘরের মধ্যে বাতিডা যেভাবি জ্বলতে নেলো ঠিক এ্যাকই ভাবডায় বাতিডা পাথুরি রাস্তায় জ্বলতে নেগেচে। ওদিকপানে গীর্জাডার দোতালার সিঁড়ি-বাই পায়ের শব্দ নামি আসতি নেগেছে। গবেষণাডার কামডা কী? ওডা তো জেনেতের পায়ের শব্দ। সে আসতিচে। আসতিচে ধাপে-ধাপে ক্রেমে-ক্রেমে সে তাঁর-দিকপানেই আসতিচে। ভগমানরে ডাক দিলো মানুষডা, বুঝ করো, এ পরাণডা তেনারই দান, আর মারো-কাটো সবই তেনার। "হে ঈশ্বর আমাকে শক্তি দাও, আমি যেন অশুভ আত্মার সাথে লড়তে পারি।"

এই সময়ডার মধ্যি সেই পায়ের আওয়াজডা বারান্দা-ধরি দরজার কাচে পৌছে গিয়েলো। পাদরী-বাবা স্পষ্ট বুঝ করেলো একডা হাত যেন হাত দে জামা ধরি এগিয়ে আসচে। হঠাৎ একডা হাওয়া উঠলো কালো-পাহাড়ার দিগপানে যে বাতিডার শিখা অনেক উঁচুডায় উটি গ্যালো! ওই-ওই যে জিনেত হোথায় দাঁয়ড়ে! মাথাডা কাঁধের ধারে ঝুঁকি পড়িচে। মুখডায় সেই হাসি……

সে আরো কাচে চলি এ্যালো ঠিক যেখানডায় পাদরী-বাবা দাঁয়ড়েছেলো। তার পরাণডা, তার সব মুরোদ মনি হ য়লো এবার বুঝি ফুয়েরে যাবি। জিনেত

মুখ হাঁ করেলো। অবশ্যাযে সে হাতডা নাড়া দেলো, ব্যস্, বাত্তিডা গ্যালো নিভি। হাত নাড়াতি শব্দডা উটেলো,—ফ্যাস্। যেন বেড়ালডা হেঁচে মারেলো। পাদরী স্থলি বুঝ করেলো পরনেড তার একেবারেই শ্বাস।

"পেত্নী, রাক্ষুসী, ডাইনী" চিক্কর মারলে সে, "ঈশ্বরের নামে আমি তোমাকে বলছি তুমি চলে যাও। যদি তুমি মৃত হও কবরে প্রস্থান করো আর যদি পাপী হও নরকে পালাও।"

ঠিক সেই সময়ডার ভক্‌মানের হাতডা জেনিতকে ঝাঁকি আলো আর ঝাঝুরি দে ছাই হয়ে গেলো পেত্নীডা, যেডা নাকী এ্যাতোদিন ধরি কবর থে উটি ব্যাড়ায়। ঝড় উঠেলো, বিষ্টি এয়েলো। পাদরী-বাবা স্থলি দোড় দে গীর্জাপানে ভিরি গ্যালো।

পাদরী-বাবা স্থলি অকেনদিন বিছানায় পডি রয়েলো, মানুষডা যেন পেল্টে গ্যালো একদম।

জিব্রালটার

—জুলে ভার্ণ

অন্তত সাত-আটশো জন হবে তারা সংখ্যায়! মাঝারি গড়ন, কিন্তু সবল, ক্ষিপ্র, নমনীয়; অদ্ভুত একেকটা লাফ দেবার ক্ষমতা আছে হাঁটুতে। সূর্যাস্তের শেষ রশ্মিতে তারা সার বেধে দাঁড়িয়ে আছে। রাজপথের পশ্চিমে প্রাচীরের মতো উঠে গেছে পাহাড়, তার ওপাশে সূয ডুবে যাচ্ছে। তার জ্বলন্ত লাল থালাটি এক্ষুনি মিলিয়ে যাবে। উপত্যকায় অন্ধকার নেমেছে। উপত্যাকার একপাশে দূর ছুঁয়ে চ'লে গেছে সানোরে আর রোনডা গিরিমালা, অন্য দিকে উষর রুষ ও বিষম কুয়েরভো।

এতক্ষণ তারা এগিয়ে আসছিলো একসঙ্গে, দলে-দলে; হঠাৎ তারা থেমে পড়লো। নিশ্চল। পাহাড়ের চূড়াটাকে দেখায় হাড়-জিরজিরে একটা অশ্বতরের পিঠের মতো—এইমাত্র তার উপরে দেখা দিয়েছে তাদের দলের নেতা।

দূরের পাহাড় গ্রেটরকের চূড়ায় সমর-বাহিনীর একটা ঘাঁটি আছে—সেখান থেকে এই পাহাড়ে, গাছের তলায় কী হচ্ছে না-হচ্ছে কিছুই দেখা যায় না।

"হিস্, হিস্" নেতার গলা শুনেই তারা মুরগির মতো ঠোঁট বেঁকিয়ে তীব্র স্বরে শিস দিয়ে উঠেছে।

"হিস্, হিস্" এই আশ্চর্য বাহিনী একযোগে আবার দিগন্ত জুড়ে তাদের ডাক পাঠিয়ে দিলে।

আশ্চর্য মানুষ নেতাটি। লম্বা; গায়ে বানরের চামড়ার পোশাক—লোমগুলো বেরিয়ে আছে, মাথায় চুলগুলো উশকোখুশকো, এলোমেলো মুখে গজিয়েছে ছাগল দাড়ি; খালি পা, গোড়ালিটা ঘোড়ার খুরের মতো শক্ত।

হাত বাড়িয়ে সে তার বাহিনীকে পাহাড়ের নিচের খাঁজটা দেখালে। সঙ্গে-সঙ্গে পলটনের লোকের মতো—না কি কলের পুতুলের মতো—একযোগে নিখুঁতভাবে হাত বাড়িয়ে তার ভঙ্গির নকল ক'রে দেখালে বাহিনী। নেতা তার হাতটা নামালে তারাও হাত নামিয়ে নিলো! নেতা মাটির দিকে ঝুঁকে পড়লো, তারাও হুবহু একভাবেই ঝুঁকে পড়লো মাটিতে। একটা লাঠি তুলে নিয়ে নেতা শূন্যে মারলো। তারাও হাওয়া-কলের মতো নিজেদের হাতের লাঠি শূন্যে ঘুরালো।

তারপরেই নেতাটি ফিরে দাঁড়ালে, ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়লো লাফ দিয়ে, গাছের তলা দিয়ে এগুতে লাগলো বুকে হেঁটে। বাহিনীও তার পিছন-পিছন বুকে-হেঁটে এগুতে লাগলো দেখাদেখি।

দশ মিনিটও গেলো না, তারা বৃষ্টি-ভেজা পাহাড়ি রাস্তায় নেমে এলো, কিন্তু, আশ্চর্য, অত বড়ো বাহিনীটা কুচকাওয়াজ ক'রে সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে এলো, অথচ তবু একটা পাথর গড়িয়ে পড়লো না পথে কোথাও।

প্রায় মিনিট পনেরো পরে নেতা হঠাৎ থেমে গেলো: তারাও সঙ্গে-সঙ্গে থমকে গেলো; যেন হঠাৎ মাটিতে জ'মে গিয়েছে দলটা!

দুশো গজ নিচে শহরটা, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। রাস্তা জুড়ে লোকাময়, অগুনতি আলো জালিয়ে ছায় এলোমেলো বাড়ি-ঘর, বাংলো, ব্যারাকগুলো। তারও ওপাশে আরো আলো দেখা যাচ্ছে। সমর-বাহিনীর পোত, সদাগরি জাহাজ, পনটুন—সব নোঙর বাঁধা; আর স্থির জলে পোতগুলোর আলো প'ড়ে চকচক করছে। আরো দূরে, অয়রোপা অন্তরীপের শেষ মাথায়, অন্ধকারের মধ্যে তেকোনা আলো ছড়িয়ে দিয়েছে বাতিঘর।

এমন সময় শোনা গেলো কামানের নির্ঘোষ, 'প্রথম তোপ দাগলো'—

লুকোনো গোলন্দাজ বাহিনীর একটা কামান আগুন উগরে দিলে। তারপরেই শোনা গেলো গুমগুমে ঢাকের শব্দ, আর তীক্ষ্ণ ধাতব ঝাঁঝরের আওয়াজ।

কাজ শেষ করার প্রহর পড়লো, এখন বাড়ী ফেরার পালা। কোনো বিদেশীর বা কোনো আগন্তুকেরই তারপরে আর বাইরে থাকার হুকুম নেই। কোনো দরকারে বেরুতে হ'লে কেল্লার পলটনকে জানাতে হয়, তারা সঙ্গে লোক দেবে। নাবিকদের জাহাজে ফিরে যাবার সময়ও এটাই। প্রায় সিকি ঘণ্টা পরে-পরেই রোঁদে-বেরুনো সেপাইরা গারদে নিয়ে হাজির করে মাতাল আর ভবঘুরেদের। তারপর আস্তে-আস্তে সব চুপ।

দুই চোখের পাতা বুজিয়েই সুখে নিদ্রা যেতে পারেন জেনারেল ম্যাক্যাকমেইল।

সে-রাত্রে ইংল্যাণ্ডের ভয় পাবার কিছুই ছিলো না ব'লে মনে হচ্ছিলো। জিব্রাল্টারের পাহাড় নিরাপদই মনে হচ্ছিলো তখন।

জিব্রালটারের সাংঘাতিক কথা কে না শুনেছে? যেন কোনো অতিকায় সিংহ গুঁড়ি মেরে ব'সে আছে লাফ মারবার জন্য। মুণ্ডুটা তার স্পেনের দিকে ফেরানো, ল্যাজটা আছড়ে পড়ছে সমুদ্রের জলে। দাঁত বেরিয়ে আছে মুখের। সার বেঁধে দাঁড় করানো আছে সাতশো কামান, নলগুলো উদ্যত—লোকে বলে 'ডাইনি বুড়ির বত্রিশ পাটি—কিন্তু কেউ আক্রমণ করলে এই বুড়ির দাঁতও কামড় বসাতে জানে!

ইংল্যাণ্ড এখানে দৃঢ়ভাবেই প্রতিষ্ঠিত—যেমন সে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে এডেনে, মল্টায়, হঙকঙে: সমুদ্রের দিকে মুখ ফেরানো সবগুলো পাহাড়কেই চলমান দুর্গে পরিণত ক'রে ফেলবে একদিন।

হারকিউলিসের মুগুর যেখানে অ্যাবিলা আর কাল্‌পের মাঝখানটা ছেড়ে ফাটিয়ে দিয়ে ভূমধ্যসাগর বানিয়েছিলো, সেই পনেরো-মাইল-জোড়া প্রণালীতে ইংল্যাণ্ডের যে-প্রবল প্রতাপ, তা এই জিব্রাল্টারের জন্যেই।

স্পেনের বাসিন্দারা কি এই উপদ্বীপ ফিরে পাবার আশা ছেড়েই দিয়েছে তাহ'লে? নিশ্চয়ই। ডাঙা, কিংবা সমুদ্র—দু-দিক দিয়েই জিব্রালটার দুর্ভেদ্য!

কিন্তু ছিলো একজন, যে এই আত্মরক্ষার ও আক্রমণের দুর্ভেদ্য দুর্গটি আবার দখল ক'রে নেবার আশা পোষণ করতো। সে হ'লো এই অদ্ভুত বাহিনীর নেতা—অদ্ভুত মানুষ—না কি অদ্ভুত খ্যাপা? তার নাম জিল ব্রালটার। আর এই নাম ব'লেই তার মনে হয়েছে জিব্রালটারকে স্বাধিকার করে নেবার জন্য সে দেশ-মাতৃকা কর্তৃক আদিষ্ট। তার মাথায় যুক্তি ততটা ছিলো না, যা তাকে

ঠেকাতে পারতো। তার উপযুক্ত জায়গা হয়তো ছিলো উন্মাদ আশ্রম। নামজাদা ছিলো সে—কিন্তু গত দশ বছর কেউ তার কোনো হদিশ পায়নি—কোথায় যে সে গেছে, কেউ কোনো পাত্তাই পায়নি। চ'লে গেছে তল্লাট ছেড়ে, দূরে বিদেশে। আসলে সে কিন্তু তার পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়েই যায়নি। আদিম মানুষ যেমন ক'রে বনে-পাহাড়ে গুহায়-গহ্বরে দিন কাটাতো, তেমনি ভাবেই সে কাটিয়েছে এই দশ বছর। সান মিগেল-এর গুহার গভীরেই তার দিন কেটেছে বেশি। শোনা যায় গুহাটা নাকি একেবারে সমুদ্রের তলায় গিয়ে শেষ হয়েছে। লোকে ভেবেছিলো সে বুঝি ম'রেই গেছে একসময়। কিন্তু বেঁচে আছে সে এখনও, জ্যান্ত ও উদ্দীপ্ত কিন্তু কেমন যেন বন্যের মতো বেঁচে আছে। মনুষ্যধর্ম লোপ পেয়েছে তার, শুধু জীবের ধর্মই তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

দুই চোখের পাতা বুজেই সুখনিদ্রায় ডুবে ছিলেন জেনারেল ম্যাক্যাকমেইল—যতটুকু তাঁর ঘুমোবার কথা, তার চেয়েও বেশি ঘুমোন তিনি রোজ। লম্বা হাত, ঝোপের মতো ভুরুর তলায় গোল দুটো কুৎকুতে চোখ, চিবুকে ছুঁচলো দাড়ি, অদ্ভুত সব মুখভঙ্গি, হাত-পা নাড়ার উদ্ধত অভ্যাস, চোয়ালের বহু বিস্তৃত ব্যবহার—সব মিলিয়ে অদ্ভুত কুৎসিত দেখতে, এমনকি কোনো ইংরেজ জেনারেলের পক্ষেও বড্ড মাত্রাতিরিক্ত কদাকার। বানরেরই কোনো অধস্তন পুরুষ, কিন্তু ওই বানর-মার্কা চেহারা সত্ত্বেও চমৎকার যোদ্ধা।

হ্যাঁ, ওয়াটারপোর্ট স্ট্রিটের সেই মস্ত আরামে-ভরা বাড়িতে খুশিতেই কাটান তিনি। আলেমেদা তোরণ থেকে ওয়াটারপোর্ট তোরণ পর্যন্ত বাড়ির সামনে দিয়ে বড়ো রাস্তাটা গেছে পেঁচিয়ে। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে কিসের স্বপ্ন ছাখেন তিনি? ইংল্যাণ্ড মিশর দখল ক'রে নিয়েছে? তুর্কিমুলুক, হল্যাণ্ড, আফগানিস্তান, সুদান, বুয়র প্রজাতন্ত্র—এক কথায় ভূমণ্ডলের সব অংশই ইংল্যাণ্ডের পায়ের তলায় হাঁটুজোড় ক'রে ব'সে আছে, এটাই কি তাঁর স্বপ্নের বিষয়? অথচ এখন যখন তিনি সুখনিদ্রায় স্বপ্নভারাতুর, তখন তাঁর সাধের জিব্রালটার বুঝি বেহাত হ'য়ে যায়!

মস্ত আওয়াজ ক'রে তাঁর শোবার ঘরের দরজা সপাটে খুলে গেলো।

'কী হচ্ছে?' চীৎকার ক'রে উঠলেন জেনারেল। শব্দ শুনেই তিনি বিছানার ওপর খাড়া হ'য়ে বসেছেন।

'সার,' তাঁর খাশ বেয়ারা ওরফে 'এডিকং' প্রায় বোমার মতো ফেটে পড়েছিলো ঘরের মধ্যে, 'শহর আক্রান্ত হয়েছে।'

'স্পেনের লোক ?'

'সম্ভবত।'

'তাদের কী দুঃসাহস যে—;

জেনারেল কথাটা আর শেষ করলেন না, উঠে দাঁড়িয়ে রাতের টুপিটা একটানে খুলে ফেললেন মাথা থেকে, লাফিয়ে গিয়ে গ'লে পরলেন পাৎলুনের মধ্যে টেনে পড়লেন উর্দি, পা গলালেন ভারি বুটজুতোয়, মাথায় শিরস্ত্রাণ চাপিয়ে, কোমরে তলোয়ার বাঁধতে-বাঁধতে বললেন, 'এই শোরগোল কিসের ?'

'পাথর পড়ছে, সার, শহরে। ঝড়ের মতো হুড়মুড় ক'রে একটার পর একটা পাথর নেমে আসছে কেবল।'

'তাহ'লে অনেক হবে তারা সংখ্যায় ?

'হ্যাঁ, সার, তা-ই তো বোধ হচ্ছে।'

'তাহলে তীরের সবগুলো ডাকাত আমাদের অজান্তেই গিয়ে ওদের সঙ্গে জুটেছে নিশ্চয়ই, তাক লাগিয়ে দিতে চায় আমাদের—রোনডার সব ফেরারি জোচ্চোর, সান রোথীর সব জেলে, গাঁয়ের সব উদ্বাস্তু—সব্বাই নিশ্চয়ই একজোট হয়েছে !'

'হ্যাঁ, সার। সেই ভয়ই হচ্ছে।'

'রাজ্যপালকে কেউ খবর দিয়েছে ?'

'না, সার। এ-রাস্তা পেরিয়ে অয়রোপা অন্তরীপে যাওয়াই যাচ্ছে না, ফটকগুলো সব দখল ক'রে নিয়েছে শত্রুরা, রাস্তাগুলো শত্রুসৈন্যে ভর্তি।'

'আর ওয়াটারপোর্ট তোপদের শিবির ? সেখানে কি কোনো খবর গেছে ?'

'সেখানেও যাওয়া যাচ্ছে না। গোলন্দাজরা সব্বাই নিশ্চয়ই শিবিরে বন্দী হ'য়ে আছে।'

'তোমার সঙ্গে ক-জন লোক আছে ?'

'জনা বিশেক হবে, সার—থার্ড রেজিমেন্টের যে-ক-জন লোক আসতে পেরেছে।'

'মা দুর্গা রক্ষে করুন,' জেনারেল ম্যাক্যাকমেইল চীৎকার ক'রে উঠলেন, 'ইংল্যাণ্ডের হাত থেকে আগু-ইংল্যাণ্ডকেই ছিনিয়ে নিলে কি না কতগুলো কমলা-ফেরি-ক'রে-বেড়ানো লোক। না, কিছুতেই তা হবে না! কিছুতেই না!'

ঠিক সেই মুহূর্তে শোবার ঘরের দরজা আবার খুলে গেলো সশব্দে: ঘরে লাফিয়ে ঢুকলো এক অদ্ভুত জীব—সোজা লাফিয়ে গিয়ে জেনারেলের কাঁধে পড়লো সে।

'আত্মসমর্পণ করো!' গর্জন ক'রে উঠলো সে। এমন একটা ক্রুদ্ধ কান-ফাটানো গর্জন, যেটা মানুষের গলা ব'লে মনে হ'লো না—বরং শোনালো কোনো ক্রুদ্ধ পশুর চীৎকারের মতো।

এডিকং-এর সঙ্গে যে-কজন লোক ঢুকেছিলো, তারা এই জীবটির গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েই বাতির আলোয় তাকে দেখতে পেয়ে আতঙ্কে তিন পা পেছিয়ে এলো।

'জিল ব্রালটার!' চেঁচিয়ে উঠলো তারা।

জিল ব্রালটারই; সেই বন্য মানুষ সান মিগেলের গুহার সেই আশ্চর্য অদৃষ্ট বর্বরটি, যাকে এই দীর্ঘকাল কেউ চক্ষে ছাখেনি।

জিল ব্রালটার আবার বন্যপশুর মতো গ'র্জে উঠলো, 'করবে আত্মসমর্পণ?,

'ককখনো না।' উত্তর দিলেন জেনারেল ম্যাক্যাকমেইল।

সৈন্যরা যেই তাকে ঘিরে ফেলেছে, তক্ষুনি হঠাৎ একটা তীব্র বিলম্বিত শিস দিয়ে উঠলো জিল ব্রালটার—'ব্রিস্।' তক্ষুনি পুরো বাড়িটা সেই দুরন্ত বাহিনীতে ভ'রে গেলো।

বিশ্বাস হয়? বানর এরা, মানুষেরই পূর্বপুরুষ—শ-য়ে শ-য়ে বানর এসে ঢুকেছে এখানে! ইংরেজদের কাছ থেকে জিব্রালটারের পাহাড় এরাই কেড়ে নিতে এসেছে? এরা? যারা এই পাহাড়ের সত্যিকার অধীশ্বর—স্পেনের লোকেরা আসবার আগেও যারা এই পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতো? যখন ক্রমওয়েল ইংলণ্ডের হ'য়ে এটাকে দখল ক'রে নেবার কথা স্বপ্নেও ভাবেননি, তখন যারা ছিলো এখানকার আদি বাসিন্দা!

হ্যাঁ তারাই! আর তাদের সংখ্যাই তাদের দুর্ধর্ষ ক'রে তুলেছে—এই ল্যাজহীন বানরগুলোর উৎপাত সহ্য ক'রেই এখানে মানুষকে থাকতে হয়, না-হ'লে রক্ষা থাকে না। এই ধূর্ত, উদ্ধত, ক্ষিপ্র জন্তুগুলোই জিল ব্রালটারের বাহিনী, যাদের কেউ স্পর্শ করতেও সাহস পায় না, কারণ একবার কারুর গায়ে চোট লাগলে লোকে দেখেছে একের পর এক মস্ত পাথর গড়িয়ে ফেলে তারা নিষ্ঠুরভাবে প্রতিশোধ নেয়!

আর যখন এরাই এসেছে দল বেঁধে, ঝাঁকে-ঝাঁকে, আর এদের চালিয়ে নিয়ে এসেছে এক আস্ত উন্মাদ, যে এদের মতোই হিংস্র, ভীষণ আর খ্যাপা—এই জিল ব্রালটার, যাকে তারা চিনতো, যে এই বানরদের মতোই স্বাধীনভাবে বিচরণ করতো এখানে, এই চারপেয়ে হুবললেস্ম টেল যে সারা জীবন ধ'রে

কেবল এই কথাই ভেবেছে, কী ক'রে স্পেনের মাটি থেকে বিদেশী আক্রমণকারীদের হটিয়ে দেয়া যায়।

চেষ্টা যদি সফল হয়, তবে কী লজ্জা! কী লজ্জা! কোথাও মুখ দেখাবার জায়গা থাকবে না ইংল্যাণ্ডের! হিন্দুদের তারা জয় করেছে, হাবশিদের, হারিয়ে দিয়েছে তাশমানিয়ার মানুষদের, অস্ট্রেলিয়ার, অধিবাসীদের, হটেনট্‌টদের, আরো, আরো কত কাউকে—আর শেষকালে তাদের উপর টেক্কা দিয়ে জিতে যাবে কিনা কতকগুলো বানর!

এ-রকম বিপত্তি যদি কখনও হয়, তাহ'লে জেনারেল ম্যাকাকমেইল রিভলভারের গুলিতে নিজের মাথার খুলি নিজেই উড়িয়ে দেবেন। এই লজ্জা তিনি সইবেন কী ক'রে?

নেতার শিষ শুনে বানররা ঘরে ঢোকবার আগেই কয়েকটি সৈন্য জিল ব্রালটারের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলো। উন্মাদ জিল ব্রালটার—তার গায়ে তখন অমানুষিক শক্তি—ঝটপট করতে লাগলো। তবু সব্বাই মিলে অনেক কষ্টে তাকে কাবু ক'রে ফেললে, বানরের চামড়ার পোশাকটা টেনে ছিঁড়ে ফেলা হ'লো, তার গা থেকে, প্রায় উলঙ্গ ক'রে তাকে একটা কোণায় ঠেশে রাখা হলো,—নগ্ন, মুখে কাপড় পোরা, হাত-পা বাঁধা—নড়বার শক্তি নেই, আওয়াজ করার ক্ষমতা অন্তর্হিত। তার একটু পরেই জেনারেল ম্যাক্যাকমেইল বেরিয়ে এলেন বাড়ি থেকে—হয় জিতবেন, নয় তো হারাবেন. সেরা যোদ্ধার মতো এই তাঁর ভীষণ পণ।

বাইরেও বিপদ মোটেই কম নেই। সৈন্যদের কয়েকজনে শেষটায় পাল্টা আঘাত হানতে পেরেছে, বোধহয় ওয়াটারপোর্ট তোরণের কাছেই ফিরে দাঁড়িয়েছিলো প্রথম ধাক্কাটা শামলে নিয়ে—এখন তারা জেনারেলের বাড়ির দিকে ছুটে আসছে। বাজারে আর ওয়াটারপোর্ট স্ট্রিটে কয়েকটা বন্দুকের শব্দ শোনা গেলো। তবু বানররা সংখ্যায় এতই বেশি যে জিব্রালটারের দুর্গ প্রায় বেহাত হ'য়েই যায় আর কি—সৈন্যরা পিছোবার জোগাড় করছে। এখন যদি এস্পানিয়রাও বানরদের সঙ্গে হাত মেলায়, তো সব ছেড়েছুড়ে স'রে পড়তে হবে—কেল্লা, শিবির ছাউনি—কোথাও কোনো সৈন্যই থাকবে না, সব পড়ে থাকবে ফাঁকা ও প্রতিরোধহীন।

হঠাৎ পুরো অবস্থাটাই সম্পূর্ণ পালটে গেলো।

মশালের আলোয় দেখা গেলো বানরসেনা কেবলই পিছিয়ে যাচ্ছে। তারা যে পিছোচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। যান্ত্রিকভাবে কুচকাওয়াজ ক'রে

তারা ফিরে যাচ্ছে, সবচেয়ে আগে রয়েছে তাদের নেতা, লাঠি উঁচিয়ে। আর বাকি বানরাও হুবহু নকল করছে তাকে—তেমনি ছুটে-ছুটে শহর ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে।

তাহ'লে কি বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়েছে জিব্রালটার? যে-ঘরে তাকে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছিলো, সেখান থেকে তাহ'লে সে পালিয়ে এসেছে? সন্দেহ কি! কিন্তু কোথায় যাচ্ছে সে এখন? যাচ্ছে কি অয়রোপা অন্তরীপের দিকে? রাজ্যপালের বাড়িতে গিয়েই চড়াও হবে তাহ'লে? বলবে তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে?

না! সেই উন্মাদ তার বাহিনী নিয়ে ওয়াটারপোর্ট স্ট্রিট ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে। আলামেদা তোরণ পেরিয়ে তারা এঁকে-বেঁকে পার্কটা পেরিয়ে গিয়ে পাহাড়ের ঢালে পড়লো।

এক ঘণ্টা পরে আর একটি আক্রমণকারীও রইলো না জিব্রালটারে।

হয়েছে কী তাহলে?

পরে সেটা খোলাখুলি বোঝা গেলো, যখন জেনারেল ম্যাক্যাকমেইল এসে দেখা দিলেন পার্কে।

তিনি—তি নি ই সেই উন্মাদের ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনিই তাদের চালিয়ে নিয়ে গেছেন শহর ছেড়ে পাহাড়ের কোলে। সেই বানরের চামড়াটা গায়ে জড়িয়ে নিয়েছিলেন তিনি। দেখতে একেই তো বানরের মতো—কাজেই বানরসেনাকে ঠকাতে তাঁর বেগ পেতে হয়নি। কেবল গিয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি রাস্তায়, তিনি, ইংল্যাণ্ডের প্রতিনিধি, আস্ত এক নরবানর, আর বানরসেনা তাঁর অনুসরণ করেছে।

প্রতিভার বিদ্যুৎবিকাশ যাকে বলে। সেই জন্যেই সেণ্ট জর্জের ক্রুশ পাবেন তিনি।

আর জিব্রালটার? ইংল্যাণ্ড তাকে নগদ দামে বেচে দিলে এক সার্কাসের দলকে—তারা তাকে ইয়োরোপ আর আমেরিকায় দেখিয়ে টাকা লুঠে নিলে। সার্কাসওলা এমনকি এ-কথাও রটিয়েছিলো যে, সে সান মিগেলের বন্য মানুষকে দেখাচ্ছে না, দেখাচ্ছে স্বয়ং জেনারেল ম্যাক্যাকমেইলকে।

কিন্তু ইংরেজ সরকারের টনক নড়বার পক্ষে এক রাতের এই আক্রমণই যথেষ্ট হ'লো। সরকার বুঝতে পারলে যে মানুষ আর এটাকে দখল করতে পারবে না, বানরের দয়ায় নির্ভরশীল স্থানটা। আর তাই ইংল্যাণ্ড—তার ব্যাবহারিক বুদ্ধি তো জগৎবিখ্যাত ঠিক করলে যে, ভবিষ্যতে সেখানে সব সময়েই সবচেয়ে

বদখৎ দেখতে মানুষকে জেনরেল ক'রে পাঠাবে—যাতে বানররা আরেকবার ঠকে যায়।

একমাত্র এই সাবধানতার উপরেই জিব্রালটারের উপর প্রভুত্ব বজায় রেখে দেবে।

এ যে দেখি জলে ভাসে শিলা

জি কে. চেষ্টারটন

"হ্যাঁ" কর্ণেল ক্রেণ বল্লেন, "আমি খামারটা একবার দেখবো ভাবছি।"

"এসব খামার-টামারে গণ্ডগোল ভর্তি। সব বেটা শয়তান এক সঙ্গে জোট বেঁধেছে" খুবই উত্তেজিত হয়ে ছোকরা বক্তৃতা জুড়ে দিলো, "হোমড়া-চোমড়াগুলি তাদের সব রকমের বদমাশী নিয়ে ছোটো চাষীদের ধ্বংস করে দিতে চাইছে ওরা এমন অভিযোগও করে যে ওদের পেছনে একজন আমেরিকান আছে। রোসেনবোঁ লো, গোল্ডষ্টোন, এবং গাগেনহিমাররা কতো দুঃখ পেতো যদি তাঁরা জানতো সে ইংলন্ডের ব্যাপারে একজন বিদেশী নাক গলাচ্ছে? ভাবো তো ব্যাপারটা একবার। আমি বুঝতে পারছি না একজন বাইরের লোক তার যতোটা জমি আছে তারও কম ইংরাজদের দিয়ে কেটে ওঠে কেন? তারা আমাকেই জমির দখলদারি দিয়েছে। নিশ্চয়ই তারা ঠিকই করেছে। এই হিসেবে আমি ওটাকে মনে করি আমার সম্পত্তি, আমার শিষ্য, বন্দী এমন কী আমার ধনুক আর বর্শা হিসেবে।"

"তোমার হরধনুর বন্দী বলো," উত্তরে বল্লেন কর্ণেল, "আমি বাজী ধরে বলতে পারি তুমি তাঁকে এমন অনেক কিছু বলেছো যা অনেকেই বিশ্বেস করতো না। কিন্তু একজন ধূর্ত ব্যবসায়ী না বোঝায় ভাণ করে ব্যাপারটা আঁচ করে নিতো।"

"যদি হরধনুই ব্যবহার করি" ঠোঁট দেখিয়ে পিয়ের্স বল্লো, "বহু স্মৃতির সঙ্গে জড়িত এ হরধনু। ইংলন্ডের প্রকৃত জোতদারের পক্ষেই যা সম্ভব। এই হরধনু ছাড়া আর উপযুক্ত কী অস্ত্র আছে যা দিয়ে জোতদারী প্রতিষ্ঠা করা যায়?"

ভদ্রভাবে বল্লেন ক্রেণ, "ওখানে কিছু একটা ব্যাপার হচ্ছে—দেখে মনে হচ্ছে ওটাও বোধহয় কোনো অস্ত্র-শস্ত্র।"

ইতিমধ্যে তাঁরা ঢালু জমিতে এসে পড়েছে। ঐ ঢালু জমির ওপরই

খামার বাড়িগুলি। রান্নাঘর আর একটা গোলাপ-ঝাড়ের আড়ালে দেখা যাচ্ছে দশরথের আমলের জাফরী কাটা জানলা। শেষের জানলাটা খোলা। বাড়ীগুলির ধারে ঐ দিয়ে বেরিয়ে আছে বিরাট কালো একটা জিনিস। শক্ত আর দূর থেকে মনে হচ্ছে গোল মতো। বাগানের ওপর দিয়ে সকালের আলোয় বাইরে কালোর মেলায় হারিয়ে গেছে ঐ বস্তুটা।

"কামান দেখছি!" অসচেতন ভাবে বলে উঠলো পিয়ের্স, "মনে হচ্ছে যেন ওটা বলছে, 'কে যায়?' না কী ওটা বিমান-নামাবার বন্দুক?"

"নিঃসন্দেহে বিমান—বিধ্বংসী কামান." কথাটা বল্লেন ক্রেণ, "এরা মনে হয়, এরা তোমার উদয়ের কথা শুনেছে, তাই সাবধানতা নেওয়া আর কী।"

"কিন্তু বন্দুক উঁচিয়ে ফয়দা কী?" নিজের মনে বল্লে পিয়ের্স কালো জিনিষটার দিকে তাকিয়ে।

"যদি বন্দুকই হয়, ওখানে লোকটা থাকে কে?" বল্লেন কর্ণেল।

"কে, ঐ জানলার ওপারে," খুলে বল্লে পিয়ের্স "ঐ জানলা যে ঘরটায় সেই ঘরটায় থাকে একজন সবেতন অতিথি। মনে পড়েছে লোকটার নাম গ্রীণ। নির্জন-বিলাসী কিছুটা ক্ষেপাটে ধরনের।"

"মনে হয় না কী অস্ত্র-বিরোধী এক পাগল," এক সময় বল্লেন কর্ণেল।

"জর্জের দোহাই।" নীচু লয়ে শিষ দিলে পিয়ের্স, "আমরা যা ভাবছি—তার থেকেও তাড়াতাড়ি ঘটনা ঘটছে। শেষমেষ কোনটা আরম্ভ হলো গৃহ-যুদ্ধ না বিপ্লব? দেখে শুনে আমাদের সৈনিকই ভাবতে ইচ্ছে করছে। আমি নিজে বিমান বাহিনীর, আর তুমি হলে পদাতিক"

"উহু, তুমি হলে বালখিল্য দলের," উত্তর দিলেন কর্ণেল, "তুমি আর তোমার বিপ্লব, এই পৃথিবীর কাছে শিশু বিশেষ! আসল ব্যাপারটা হলো, কামানের মতো দেখতে হলেও ওটা কামান নয়। হ্যা, বুঝতে পেরেছি, ওটা কী।"

"জিনিষটা কী তাহলে?" তাঁর বন্ধু জিজ্ঞাসা করলো।

"ওটা হচ্ছে একটা দূরবীক্ষণ যন্ত্র," বল্লেন ক্রেণ, "মান মন্দিরে যে সব দূরবীক্ষণ আছে তাদেরই মতো ওটা একটা।"

"আচ্ছা, ওটা তো দূরবীন কামানও হতে পারে। কখনো দূরবীনের কখনো কামানের কাজ করছে," ওকালতী শুরু করলো পিয়ের্স, তার প্রথম কল্পনা কিছুতেই নস্যাৎ না হতে দিয়ে, "আমি এরকম অনেক অলংকারযুক্ত শব্দ শুনেছি 'গোলার মতো তারা', বোধ হচ্ছে ব্যাকারণ ও মানে তুই আমার

বোধগম্য হয়নি। জোতদারের অতিথি বোধহয় স্থানীয় কোনো খেলা—মনে করো, হাঁস-শিকারের খেলা বকলমে অভ্যাস করছে!”

“কী সব যাতা বলছো?” চিৎকার করে উঠলো তার সাথী।

“ওদের অতিথি বোধহয় তারাদেরই শিকার করে বেড়াচ্ছে।” পিয়েস ব্যাখ্যানা জুড়লো।

“ভয় হচ্ছে অতিথি মশাই আবার চাঁদকেই না শিকার করে বসেন,” বল্লেন আমুদে কর্ণেল। তাঁরা যখন কথা বলছিলো কুঞ্জের গোধূলির আঁধো আলো-আঁধো ছায়ার মধ্য দিয়ে একজন তাম্রকেশী মেয়ে এলো। চোখে পড়ে এমন চৌকোনো মুখ তার। খামার বাড়ীর মেয়ে সে। পিয়েস যথেষ্ট সৌজন্য দেখালেন তাকে। সে এই সমস্ত খামার বাড়ীর লোকদের সঙ্গে ব্যবহারে যথেষ্ট সচেতন। এদের সঙ্গে ব্যবহার তাঁর ছোটো খাটো জমিদার সঙ্গে যেমন হওয়া উচিৎ। এরা মোটেই বর্গদার বা ভূমিদাস নয় তার কাছে।

“আপনার বন্ধু গ্রীণ দেখছি দূরবীক্ষণ যন্ত্রটা ওখানে খাটিয়েছেন,” সে বল্লে। “ঠিকই ধরেছেন বাবু,” উত্তর দিলো মেয়েটা, “লোকে বলে শ্রীযুত গ্রীণ একজন বিরাট জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ।”

কথাটা গায়ে লাগলো যেন পিয়েসের, “আমাকে বাবু, বলাটা ঠিক নয়। আগের সামন্তবাদ থেকে বর্তমানের সাম্যবাদে আমার পচ্ছন্দ। আমাকে যদি সন্তুষ্টই করতে চান, তাহলে বরংচ বলুন” হ্যাঁ, নাগরিক মশাই।” আর তখনই আমরা নাগরিক গ্রীণের কথায় সমান তালে আসতে পারবো। ভালো কথা, এখানে আমাদের নাগরিক ক্রেণের সঙ্গে আপনাদের আলাপটা করিয়ে দিচ্ছি। নাগরিক ক্রেণ নুতুন উপাধিতে খুব একটা উৎসাহ না দেখিয়ে যুবতীকে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান দেখালেন। পিয়েস তার বক্তৃতা চালিয়ে গেলো, “মজাটা হলো নগর থেকে দূরে এসে আমরা নাগরিক হলাম! আমরা এমন একটা সম্বোধন চাই গ্রাম আর শহর যা এক করে দেবে। সমাজবাদীরা ‘সাথী’ কথাটা নষ্ট করে নিয়েছে। তোমার স্বাধীনতা মার্ক টাই আর ছুঁচলো দাঁড়ি না থাকলে তুমি নিশ্চয়ই সাথী হচ্ছো না। মরিস অবশ্য সদিচ্ছা চালিয়ে ছিলো পরস্পর পরস্পরকে ‘প্রতিবেশী’ বলবে। এটা আবার গ্রাম্যতায় ভরা। ‘মনে হয়, সকাতরে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে কথার তোড় চালালে, ‘মনে হচ্ছে আমাকে বুড়ো বলে ডাকতে আপনাকে অনুপ্রাণিত করিনি?’

“যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে,” মন্তব্য করলে ক্রেণ, “ঐ যে আপনাদের

ভ্রাম্যমান জ্যোতিষ-শাস্ত্রবিদ বোধহয় একজন উদ্ভিদ-শাস্ত্রবিদও বটে। ঠিক গ্রীণের বাংলা করে যা হয়।”

“হ্যা, উনি বাগানে, মাঠে-ময়দানে, আর গোয়াল ঘরগুলিতে মাঝে মাঝেই ঘুরে বেড়ান,” যুবতীটি বল্লো, “নিজে নিজে হড়বড় করে কী সব বলেন। ভদ্রলোক বিরাট কিছু একটা আবিষ্কার করেছেন। আর যাকে দেখেন তাকেই তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে বলে বেড়ান। কখনো-সখনো আমি গরুর দুধ দোয়াই আমাকেও তিনি ব্যাখ্যা করে শোনান।

“ভরসা করি। আপনি-ও আমাদের আবিষ্কারটা ব্যাখ্যা করে শোনাবেন?” আগ্রহ দেখালেন পিয়েৰ্স।

“খুব একটা খারাপ কিছু নয়, হাসতে হাসতেই জবাব দিলে মেয়েটি,” লোকে যে চতুর্থ পরিমাপের কথা বলে, —ব্যাপারটা ঐ নিয়েই। আমার বিন্দুমাত্রই সন্দেহ নেই ভদ্রলোকও আপনাদের সংগে দেখা হলে সবিস্তারে বলবেন।”

“শুনে আমার খুব একটা লাভ হবে না,” পিয়েৰ্স বল্লেন, “আমি সরল চাষা-ভুষো আমার পক্ষে তৃতীয় পরিমাপ আর গরুই যথেষ্ট।”

“তাহলে মাপের চতুর্থ পরিমাপটা গরুই দাঁড়ালো, কী বলো”, ক্রেণ এবার বল্লেন। হেসে মেয়েটি বল্লে “তাহলে আমি এবার চতুর্থ পরিমাপকে যত্ন নিতে চল্লাম।”

“চাষীরা সকলেই জোড়াতালি দিয়ে চালায়। তিন-চার রকম কাজ ওদের কাছে কিছুই নয়,” মন্তব্য করলো পিয়ের্স, “খামারে দেখছি অদ্ভুৎ অদ্ভুৎ সব জন্তু জানোয়ার। মজাটা কেমন? একটা খামারে একই সংগে আছে গরু-মুরগী আর জ্যোতিষ-শাস্ত্রবিদ।”

যে পথে মেয়েটি অন্তর্ধান করেছিলো সেই পথেই জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ তাঁদের কথার ফাঁকে উদয় হলেন। চোখ-জোড়া তাঁর হাড়ের ফ্রেমের চশমায় ঢাকা। চশমার কাঁচের রং মৃদু নীলাভ। কারণ তাঁর জ্যোতিষ্ক দর্শনের দরুন চোখ-জোড়া বাঁচাবার জন্যই এই ব্যবস্থা। এই চশমা-জোড়ায় তাঁকে কিছু অদ্ভুৎ দেখাচ্ছে। অথচ চশমা ছাড়া অবস্থায় নিশ্চয়ই তাঁকে সরল আর সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী মনে হয়। ঝুঁকে চল্লেও সে বেশ লম্বা চওড়া। খুবই অন্যমনস্ক। ইতিউতি-ই সে মাটির দিকে তাকায় আর মুখ সিঁটকায়—যেন ব্যাপারটা তাঁর পছন্দ নয়।

অলিভার গ্রীণ ‘দুধও খাবো টামাকও খাবো’ গোছের ক্ষুদে অধ্যাপক। বাচ্চাদের যেমন শখ থাকে সে রকম ছোটো বয়সে তাঁর বিজ্ঞানে শখ জন্মালো। ঐ শখ মধ্য বয়সে উচ্চাশায় এলো অন্য কোনো প্রলোভন না থাকায়। তাঁর

বাতিক এককালে স্থির হয়ে গেলো যেটা তাঁর বংশের লোকেদের বেলায় একের পর এক সার্থকতা এনে হয়। তাঁর অধীত বিষয়ে উঁচুস্তরের সমাজে সভ্য সে একজন। এরপরেই এলো তাঁর বাতিক—মহান বিশ্বচরাচরজনিত এক হামবড়া ভাব। দিনের আলো যেমন দিনকে ভরিয়ে দ্যায়, থিওরীও তাঁর জীবনকে সে রকম ভরিয়ে দিলো। যদি সেই থিওরীকে আমরা এখানে উন্মুক্ত করি ভয় হচ্ছে ওটার কাজ দিনের আলোর মতো হবে কী না। অবশ্য অধ্যাপক গ্রীণ সব সময়ই তাঁর থিওরীর পক্ষে প্রমাণ দিতে উন্মুখ। এখন এই লেখার মধ্যে সেই প্রমাণ উত্থাপন করতে আমাদের চার-পাঁচটি পাতায় ঘন-সন্নিবেশিতভাবে ছোট হরফে লেখা সাজাতে হবে। অবশ্যই এখানে সেখানে থাকবে কিছু জ্যামিতিক অংক যেগুলি কোনো রোমাঞ্চকর গল্পেই শোভন নয়। পরিশেষে, ভদ্রলোকের থিওরীর সংগে আপেক্ষিকবাদের কিছু মিল আছে—সেখানে আছে স্থির বস্তু আর চলমান বস্তুর মধ্যে পরস্পর স্থান পরিবর্তন। বৈমানিক পিয়ের্স—সে নাকী তাঁর জীবনের অনেকটা সময়ই চলমান বস্তুর সংগে কাটিয়েছে। অবশ্যই মাঝে মাঝে স্থির বস্তুর সংগে হঠাৎ ধাক্কা লাগিয়ে। গ্রীণের সংগে কিছু কথাবার্তা চালান বৈজ্ঞানিক বিমান চালনায় ঔৎসুক্য থাকায়। পিয়ের্স তার বন্ধুদের থেকে ভাবগত বিজ্ঞানের অনেক কাছের মানুষ। ক্রেণের উৎসাহ পল্লী-গীতিতে, হুডের ঝোঁক পুরাতন সাহিত্যে আর উইল্ডিং হোয়াইট ভালোবাসে মিষ্টিক। যুবক বৈমানিক খোলাখুলি ভাবে স্বীকার করলো তার উড়োজাহাজ যতো না উড়তে পারে তার চেয়ে বেশী দূর গতিশীল অধ্যাপক গ্রীণের উচ্চস্তরের অংকশাস্ত্রের প্রতিভা।

আরম্ভ করলেন অধ্যাপক গ্রীণ। সাধারণত তিনি যে ভাবে আরম্ভ করেন—ব্যাপারটা খুবই সোজা। অবশ্যই তিনি যে ভাবে বলেন—ব্যাপারটা তাঁর পক্ষে সোজাই। শেষমেষ তিনি বলেন আমি তো আগেই বলেছিলাম ব্যাপারটা সত্যি খুবই সোজা। হ্যা, সত্যি তাই। তিনি যেভাবে বল্লেন তাতে ব্যাপারটা সোজা বলাটাই বেশী। যা হোক, সেই সময়ই তিনি বাথে অনুষ্ঠিত বিখ্যাত জ্যোতিষশাস্ত্র সম্মেলনে তাঁর বিখ্যাত গবেষণার বিষয়বস্তু পড়তে যাচ্ছিলেন। ঠিক তারই জন্য তিনি সে সময় সমারসেটের পাহাড়ে অবস্থিত জোতদার ডালেন খামারে তাঁর জ্যোতিষ-তাঁবু, ভালো করে বলতে গেলে জ্যোতিষ কামান বসিয়েছিলেন। শ্রীএনেক ওয়েটস তখনই কিছুটা ইতঃস্তত করেছিলেন যখন শুনলেন তাঁর অনুগত ডালের জোতদার তাঁদের অপরিচিত এক আগন্তুককে বাড়ীতে ঠাঁই দিচ্ছেন। কিন্তু পিয়ের্স তাঁকে বেশ শক্তভাবে স্মরণ করিয়ে

দিয়েছিলেন যে এসব পৈতৃকসুলভ মনোভাব এখন অচল। একজন স্বাধীন চাষীর যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে সে কাকে রাখবে না রাখবে এবং ব্যাপারটা আত্মঘাতী হলেও। স্বাধীনতাটা একজন জ্যোতিষশাস্ত্রবিদের ওপর ঠেকতে সে খুবই নিশ্চিত বোধ করলো। অবশ্য সে যদি হস্তরেখাবিদ হতো তাহলেও ক্ষতি ছিলো না। খামারে আসবার আগে জ্যোতিশাস্ত্রবিদ তাঁর দূরবীক্ষণ যন্ত্র খুব খারাপ খারাপ জায়গায়—ব্রামসবেরীতে আর মিডল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জায়গায় রেখেছিলেন। তিনি ভাবতেন, এবং সত্যি তিনি তাঁর পরিবেশ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। কিন্তু চারধারের হাওয়া আর রংয়ের ঝলসানিতে মনে মনে দমে গেলেন আশ্চর্যভাবেই এক সময়।

"ব্যাপারটা হলো সরল " পিয়ের্স যখন আবার তাঁকে তার থিওরী শোনাতে পাকড়াও করলো। "ব্যাপারটা হলো সমানসাপেক্ষ এবং সেটা নামে মাত্র কারিগরী। মোটা সুরে আর চিরাচরিত প্রথায় বলতে গেলে অংকের সূত্রে পৃথিবী উল্টে দেওয়া।"

"যা আমরা বলি,—পৃথিবীর এ প্রান্তকে উল্টে ও প্রান্তে করে দেওয়া," পিয়ের্স উৎসাহ দেখালো. "আমি ব্যাপারটা পছন্দ করি।"

"আপেক্ষিকবাদকে গতিশীলতায় প্রয়োগ করলে, সকলেই বুঝতে পারেন," বলে চল্লেন অধ্যাপক ভদ্রলোক. "যখন আপনি মোটর-গাড়ীতে ছোটেন—আপনার মনে হয় গ্রামগুলি যেন ছুটে পালাচ্ছে।"

"হ্যা গ্রামগুলি ছুটেই পালায় পিয়ের্স যখন প্লেন চালায়।" মন্তব্য করলো ক্রেণ, "এবং গ্রামবাসীরাও। যদিও সে তাদের উড়োজাহাজ দিয়ে ভয় দেখাতে পছন্দ করে।"

"তাই নাকী?" কিছুটা উৎসাহ নিয়ে অধ্যাপক-মশাই প্রশ্ন রাখলেন। "কাজ চালানোর জন্য এরোপ্লেন ভালো একটা মডেল হতে পারে। এবার তুলনা করুন স্থির বস্তুর স্থিরতা আর উড়োজাহাজের গতি!"

"যদি কিছু মনে না করেন তাহলে বলি। পিয়ের্স যখন ধাক্কা মারে তখন স্থির বস্তুও নড়ে ওঠে," বল্লেন কর্ণেল।

দুঃখ মেশানো দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন অধ্যাপক গ্রীণ। কিছুটা বিষাদও বা আছে সেখানে। বহিরাগত অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষদের সংগে কথা বলে তিনি বুঝি বা কিছুটা নিরাশ হলেন। তাঁদের মন্তব্য চোখা চোখা হলেও ঠিক মর্মে গিয়ে বেঁধে না। ধীরে ধীরে তিনি বুঝলেন যারা মন্তব্য করে না তারাই তাঁর কাছে ভালো। ফুল আর গাছ কোনো মন্তব্য করে না। সারিবদ্ধ ভাবে

দাঁড়িয়ে থাকে তারা আর চলতে থাকে তাঁর গ্রহীত জ্যোতিষশাস্ত্রের ছন্দপতন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। গরুও মন্তব্য করে না। এমন কী দুধ দোয় যে মেয়েটা সে-ও কিছু বলে না। আর যদিও কিছু কখনো বলে সেগুলো সুন্দর আর শোভন। চালাকীর ধার দিয়েও যায় না। সঙ্গে গেলেন তিনি, অনেক সময় তিনি যা করে থাকেন গরুদের কাছে চলে গেলেন তিনি।

কুমারী মেয়েটা—যে নাকী দুধ দোয়ায়। প্রচলিত নিয়মে মোটেই গোয়ালিনী নয়। আশপাশে পরিচিত অবস্থাপন্ন জোতদারের মেয়ে মার্গারী ডাল্। স্কুলেও গিয়েছিলো সে। এখানে ফিরে আসবার আগে সহজবোধ্য অনেক কিছু শিক্ষা সে পেয়েছিলো। তারপর এখানে এসে হাজারো কাজে সে নিজেকে নিয়োগ করে যা নাকী সে ইস্কুল-মাষ্টারদের ধরে ধরে শেখাতে পারে। তাঁর জ্ঞান ঠিক বা বেঠিক যেটাই হোক অধ্যাপককে গরুদের কাছে টেনে আনে আর তিনিও বক্তৃমে জুড়ে স্থান। কখনো বা স্বগোক্তিতে। কারণ তাঁরও মনে হয় তার মনের পাশে ধীর গতিতে জংগলের মতো অনেক কিছু গড়ে উঠছে। সবকিছুই তিনি পেয়েছেন মেয়েটার সহজ-সরল কাজে আর ব্যাপকতায়। মাঝে মধ্যে তাঁর সন্দেহ হয়—তিনি কী নিজেই ইস্কুল মাষ্টার যাকে জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে।

সায়হ্নের আলোয় মাটি আর আকাশ আলোয় ভরে গেছে। আপেল গাছের পেছনের নীলাভা গাছগুলি সবুজের সমারোহে দীপ্ত। প্রকৃতির এই বেষ্টনীতে খামার বাড়ীর অনেকটাই অন্ধকারে! এরই মধ্যে তাঁদের দিকে উঁচু হয়ে থাকা কাঞ্চনটা যেন কিছুটা অদ্ভুৎ বা উদ্ভট—তিনি বলতে পারেন না কেন,—মনে হচ্ছে সমস্ত ব্যাপারটা একটা গল্পের উৎস। হলিহক ফুলগুলিও অবিশ্বাস্যভাবে লম্বা।—ডেসী বা ডানডালিওন ফুল গাছকে মনে হয় যেন ল্যাম্প পোষ্ট বিশেষ। ব্লুমসবারীতে যে এরকম কিছু নেই সে সম্বন্ধে সে স্থির। এই লম্বা ফুল গাছগুলিও যেন গল্প বলতে চায়। কাঁঠাল বা নীম গাছ যেমন গল্প বলে।.........

"আজ রাতে আমার গবেষণাপূর্ণ লেখাটা পড়তে হবে," হঠাৎ-ই তিনি বল্লেন, "এ-সম্বন্ধে আমার চিন্তা ভাবনা করার কিছু দরকার।" "মনে হয় না খুব একটা লাভ হবে," বল্লে মেয়েটি, "যদিও আমি দেখছি আপনি সব সময় এনিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছেন"

"মানে আমি সাধারণত", ব্যোম্ মেরে গেলেন অধ্যাপক। আর এই তিনি প্রথম উপলব্ধি করলেন যে তিনি এ সম্বন্ধে মোটেই চিন্তা ভাবনা করেননি। কিছুই তিনি গুছিয়ে ভাবতে পারেন না।

নেহাৎ কথা বলতে হয় এভাবেই বল্লেন মার্গারী ডাল "মনে হয় আমার ব্যাপারটাই বা কী চিন্তা করতেও আপনাকে প্রচুর বুদ্ধি খাটাতে হবে।"

"আমি জানি না", উত্তরে বল্লেন তিনি নিজেকে বাঁচাতে, "আমি তোমাকে বোঝাতে পারবো কি না, অবশ্যই আমি বলছি না যে তুমি বোকা। বরংচ তুমি ব্যাপারটা বোঝার পক্ষে খুবই চালাক, শুধু ওটাই বা কেন যে কোনো জিনিষ।"

"কিছু কিছু জিনিষ, বুঝলেন কী না", হাসতে হাসতে বল্লে সে "আমার মনে হয়, এই ধরুন গরু আর গরুর দুধ দোয়াবার যন্ত্রপাতির সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনার থিওরীর কোনো যোগ নেই?"

"যে কোনো জিনিষের সঙ্গেই আমার গবেষণাপ্রসূত ব্যাপারের মিল আছে" উৎসাহ নিয়ে তিনি বল্লেন, "গরু আর তার যন্ত্রপাতি কী অন্য যে কোনো জিনিষ। ব্যাপারটা খুবই সোজা। চলতি অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মকে পাল্টে দিয়ে তুমি একই ফল পাবে—চলমান বস্তুকে যদি তুমি স্থির বস্তু ধরো আর স্থির বস্তুকে যদি তুমি চলমান ধরো। ফল সে একই। তোমাদের বলা হয় পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘোরে আর চাঁদ ঘোরে পৃথিবীর চারপাশে। কিন্তু প্রথমেই আমার সূত্রে সূর্যই ঘুরছে পৃথিবীর চারপাশে।"

মেয়েটি খুশীতে ঝিকমিকিয়ে বল্লে "আমার সবসময়ই তাই মনে হয়।"

"এরপর তুমি নিজেই দেখবে," যেন বাজীমাৎ করেছেন এভাবে অধ্যাপক বলে চলেন "প্রমাণিত তর্কশাস্ত্র উল্টে দিয়ে আমরা অবশ্যই মনে করবো পৃথিবীও চাঁদের চারদিকে আবর্তিত হচ্ছে।"

উজ্জ্বল মুখে এই প্রথম সন্দেহের ছায়া নাবলো। বলে উঠলো মেয়েটি "ও"।

"তুমি যে কোনো জিনিষ বলো, হোক না কেন সেটা দুধ দোয়াবার যন্ত্র বা গরু একই জিনিষ প্রমাণ করেছে; কারণ তারা সকলেই হচ্ছে স্থির বস্তু" আকাশের গাঢ় অন্ধকারের পটভূমিকায় চাঁদ উঠেছে আর সেটা ক্রমে বড়ও হচ্ছে। শূন্যমনে তিনি সেই চাঁদের দিকে তাকালেন।

"তোমরা যে-সব জিনিষ নিয়ে নাড়াচাড়া করো, সেগুলির কথাই ধরো", বক্তৃতা চালালেন তিনি কিছুটা অনুপ্রাণিত হয়ে উত্তেজনার আগুনে, "বনের পেছনে চাঁদ উঠলো, তুমি তো দেখলে আর সেই চাঁদ আকাশ পরিক্রমা করে পাহাড়ের পেছনে অস্ত ও গেলো এক সময়। আমার অঙ্কশাস্ত্র অনুসারে প্রমাণ করা যায় চাঁদ হচ্ছে এক কেন্দ্রবিন্দু আর তার পরিক্রমার পথটা হচ্ছে যে কোনো একটা জিনিষ, যেমন ধরো গরু"—মাথাটি পেছনে হেলিয়ে মেয়েটি তাঁর দিকে

তাকিয়ে রইলো আর চোখ দিয়ে যেন হাসলো। একটুও নেই তাতে উপহাসের ছোঁয়া, মনে হচ্ছে মেয়েটাকে একটা শিশুসুলভ আনন্দ পেয়ে বসেছে—পরীর গল্পে চরম উত্তেজনা মুহূর্তে যে নাকী পৌঁছে গেছে। "সুন্দর!" লাফিয়ে উঠলো যেন মেয়েটা "তাহলে সত্যি গরু চাঁদকে লাফিয়ে পার হয়!"

গ্রীন তাঁর নিজের চুলে হাত চালালেন। কিছুটা সময়ের পর হঠাৎ মানুষের যেমন দুবোধ্য সংস্কৃত শ্লোক মনে পড়ে যায়, সেভাবেই বল্লেন তিনি, "হ্যা, হ্যা, ব্যাপারটা আমিও যেন কোথায় শুনেছি। হ্যা, আরো যেন কিছু আছে —ছোট্ট কুকুরটা হেসেছিলো—"

তারপরেই এমন একটা ঘটনা ঘটলো সেটা ভাবজগতে অসম্ভব। এমন কী কুকুরের হাসির থেকেও মারাত্মক। জ্যোতিষশাস্ত্রের অধ্যাপক নিজেই হাসলেন। ভাবজগতের ঘটা জিনিষ আর মাটির পৃথিবীর ঘটা জিনিষের যদি মিল থাকতো তাহলে আপেল গাছগুলি ভয়ে যেতো কুঁচকে, আকাশ থেকে পাখীগুলিও লটকে মাটিতে নাবতো আর হয়তো গরুটাই সত্যি করে হেসে দিতো।

সংক্ষিপ্ত গোলমালটা থেমে যেতে নেবে এলো নীরবতা। যে হাত তাঁর মাথায় উঠেছিলো, সেই হাত নাববার সময় বিরাট চশমা জোড়াও সরিয়ে দিলো। বেরিয়ে পড়লো প্যাট্ প্যাট্ বিরাট নীল চোখ। তাঁকে দেখতে বাচ্চাদের মতো, না।বাচ্চার-ও বাচ্চা।

"আপনি কী সবসময়ই চশমা পরেন?" মেয়েটি বল্লে, "আমার মনে হয় নীল চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকার জন্য আপনার চোখও নীলচে হয়ে গেছে। আচ্ছা কী যেন একটা প্রবাদ আছে না পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকালে লোকের কী যেন হয়?"

ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি গগল্সকে আর ভেঙেও গেলো সেটা। "ভগবানের দোহাই!" বিস্ময়ে বল্লে মেয়ে, "হঠাৎ-ই আপনি সব জিনিষের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লেন কেন? আমি ভেবেছিলাম আপনি বোধহয় চশমা জোড়া-টা পরে থাকবেন যতোদিন না, কী যেন বলে কথাটা--ন্যাবারোগী সবকিছু দেখে হলদে।"

মাথা নাড়লেন তিনি, "সবই সুন্দর, হ্যা, তুমিও সুন্দর।"

যে সব ভদ্রলোক এ-উক্তি করে তাদের সঙ্গে ব্যবহারে সে সবসময় মহৎ ও সরল, বিশেষতঃ ভদ্রলোকের মুখোশধারী মানুষগুলি যখন ভদ্রলোক নয়। কিন্তু এর বেলায় সে মোটেই আত্মরক্ষায় উদ্যোগী হলো না। যেহেতু অপরপক্ষ আক্রমণ তো দূরের কথা আত্মরক্ষারই সক্ষম নয়। কিছুই মেয়েটা বল্লে না।

কিন্তু অপরপক্ষ বক-বক করেই গেলো। এবং ক্রমেই ক্রমেই তাঁর কথাবার্তা এলোমেলো হয়ে গেলো সেই মুহূর্তে দূর শহরে কোনো এক ঘরের মধ্যে হুড আর ক্রেন এবং হরধনুর অন্যান্য সভ্যরা নতুন জ্যোতিষশাস্ত্রে নিয়মটার মানে আর সম্ভাবনা নিয়ে গভীর আলোচনায় মত্ত। বাথ-এর বক্তৃতা ঘরে এর জন্য উদ্যোগ আয়োজন বিরাট। কিন্তু থিওরীর যে মালিক সে-ই ব্যাপারটা একদম ভুলে মেরে দিয়েছে।

"আমি ব্যাপারটা সম্বন্ধেই ভাবছি" হেনরী পিয়ের্স বলছিলো, "মানে ঐ জ্যোতিষশাস্ত্রের লোকটার ব্যাপারে যে নাকী বাথ-এ আজ বক্তৃমে মারবে। লোকটার তেজ ঘুমিয়ে আছে আর কিছুদিনের মধ্যেই আমরা ওর সঙ্গে জড়িয়ে পড়বো। অথবা উল্টোভাবে ঐ আমাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে। অবশ্য আমি বলতে চাই না আমাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটা খুব আরামের। হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছি শীঘ্রি গোলমাল একটা পাকিয়ে উঠলো বলে। আমার কথায় ভাবছো। আমি বোধহয় একজন হস্তবিদের সঙ্গে আলোচনা করে এসেছি। ঐ গ্রীন সাহেব যেন গোল-টেবিল বৈঠকের কেষ্ট-বিষ্টু বিশেষ। যাহোক সেই হস্তরেখা বিশারদ একটা জ্যোতিষশাস্ত্রের থিওরী উগরিয়েছে।"

"কেন?" ইউল্ডিং হোয়াইট অনুসন্ধিৎসা দেখালো কিছুটা বা বিস্ময়ে "তোমার তার থিওরীর দরকারটা কী?"

"কারণ সে লোকটা যতোটা মনে করে তার চেয়ে বেশী আমি তার থিওরী বুঝি। তোমাদের বলছি শোনো তার থিওরী হলো জ্যোতিষশাস্ত্রের রূপকথা।

"রূপকথা" পুনরুচ্চারণ করলো ক্রেন, "কাদের নিয়ে?"

"আমাদের নিয়ে" পিয়ের্স বল্লে, "রূপকথায় যা ঘটে, আমাদের অজ্ঞাতসারে আমরা এতে অংশ নিয়েছি। তার কথাবার্তায় আমাদের ইতিহাসও এলো। আগে যা কখনো ভাবিনি তা ও ওর কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম।"

"কী সব যা তা বলছো?" কথায় জোর দিয়ে বললেন কর্ণেল।

"ওঁর থিওরী," প্রায় ধ্যানস্থ অবস্থায় গুণগুণিয়ে বললো পিয়ের্স, "চলমান জিনিষ বস্তুতপক্ষে নিথর আর জংগম বস্তু হচ্ছে সত্যিকারের চলমান, ভালো কথা, তোমরা তো সবসময়ই বলো আমি ঝাঁ ঝাঁ করে চলি।"

"কখনো বা হৃদয়বিদারক কোনো বস্তুর ভূমিকা নও" আন্তরিক সহানুভূতিতে উৎসাহ দিলেন কর্ণেল।

"বলছি" ঠাণ্ডাভাবে উত্তর দিলো পিয়ের্স, "তোমরা সব সময় ভাবো আমি মোটরে খুব জোরে ছুটি বা প্লেনে চড়ি। তোমরা যা আমাকে বলো সেই কথাই

আবার লোকে তোমাদের সম্বন্ধে বলে। বুদ্ধিমান মানুষ ভাবে সব সময়ই আমরা নেচে নেচে দূরে যাচ্ছি। ওরা ভাবে আমরা সব পাগলের দল যারা পুলিশকে ধোঁকা দিচ্ছে আর গোলক ধাঁধায় ঘোল যাচ্ছে। আর সব সময় নূতুন কোনো ধাঁধার নকশা ছকছি। কিন্তু ভালোভাবে চিন্তা করলে তুমি দেখবে যে আমরা ঠিক একজায়গায় দাঁড়িয়ে আছি আর পৃথিবীর অন্য সকলে পরিবর্তিত ও আবর্তিত হচ্ছে।"

"হ্যাঁ," বল্লে ওয়েন হুড, "তুমি যা বলতে চাইছো তা যেন আমার ক্রমে ক্রমে পরিস্কার হচ্ছে।"

"আমাদের ছোটো-খাটো অভিযানগুলিতে", অপরজন বল্লো, "আমাদের মধ্যে সকলেই কিছু না কিছু কাজে ব্যাপৃত, সে যতো কঠিনই হোক না কেন কিন্তু আমাদের সমালোচকরা তাঁদের সমালোচনায় স্থির নন। মজাটা হচ্ছে ঐখানেই। তাঁরা তাদের চরাচরিত প্রথায় সমালোচনায় এমন কী বনেদী সমালোচকেরও এটা ঘটিয়ে থাকেন। প্রত্যেকটা গল্পেই তাঁরা অস্থির মস্তিষ্কের পরিচয় দেন। কিন্তু আমরাই একমাত্র লোক যারা ঠিক থাকি।"

"তুমি যা বলছো তার মধ্যে কিছু সততা আছে," বল্লে ওয়েন হুড্।........

"মনে হচ্ছে তুমি কিছু একটা ফাজলামো করতে যাচ্ছো," এবার বল্লেন কর্ণেল সায়েব।

"আমার কল্পনায় যতোবড় ধ্যাষ্টামো আসে।" আনন্দের সংগে বল্লে পিয়েস্, "একটা জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা চক্রে যোগ দিতে যাচ্ছি আমি।"

পরের দিন সকাল বেলায় গবেষণাকারীদের বন্ধুরা খবরের কাগজ পড়ে যতো দূর হতভম্ব হওয়া উচিৎ ছিলো তারও বেশী হলো অবাক। আলোচনা-চক্রের গবেষণা নিয়ে ধ্যাষ্টামো কোন্ পর্যায়ে উঠেছিলো এর দ্বারাই সেটা সম্পূর্ণ আর খোলামেলা ভাবে বোঝা যায়। ক্লাবে কর্ণেল গম্ভীরভাবে বসেছিলেন। তাঁর সামনে মেলা রয়েছে সেদিনের খবরের কাগজের একটা কলম। খবরটার শিরোনামা হলো:—"বিজ্ঞান সম্মেলনে অভূতপূর্ব দৃশ্য! বক্তার পাগল হয়ে সভাকক্ষ হইতে পলায়ন!"

"বাথে বর্তমান অনুষ্ঠিত তৃতীয় জ্যোতিশাস্ত্র সম্মেলনে দুঃখজনক কিন্তু অভূতপূর্ব একটা ব্যাপার ঘটে। অত্যন্ত সম্ভবনাপূর্ণ একজন জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ অধ্যাপক অলিভার গ্রীণের কার্যক্রম অনুসারে পাঠ করার কথা ছিলো—গ্রহসমূহের আবর্তনের আপেক্ষিকবাদ। বক্তৃতার এক ঘণ্টা আগে অধ্যাপক গ্রীণের কাছ থেকে একটা টেলিগ্রাম এলো। তাতে তিনি জানাচ্ছেন যে তিনি তাঁর বক্তৃতার

বিষয়বস্তু বদলিয়ে তাঁরই আবিষ্কৃত একটি তারকার সম্বন্ধে পৃথিবীর বিজ্ঞান-পিপাসুদের বলবেন। অখ্যাত সেই তারকাটি তাঁর নূতুন আবিষ্কার। সভায় প্রবল উত্তেজনা আর চরম ঔৎসুক্য দেখা গেলো। কিন্তু সে ভাব বক্তৃতা চলাকালে বদলিয়ে হতাশায় পরিণত হলো। বক্তা ঘোষণা করলেন কোনো একটা নির্দিষ্ট তারকার এ কটি নূতুন গ্রহের আবিষ্কারের ঘটনা। কিন্তু তিনি ওখানেই না থেমে গ্রহটির মাটি প্রকৃতি এবং অন্যান্য বিষয়বস্তু এমন ভাবে বলতে লাগলেন যেন সেগুলি বর্ণালি আর দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়েছে। জীবের পরিণতি সেখানে অদ্ভুৎ। জীবেরা সেখানে স্তম্ভাকৃতি, আর অনবরত তারা দ্বিধা বিভক্ত হচ্ছে যতোক্ষণ না সেগুলি চেপ্টা ঝুরির আকৃতি নিচ্ছে। কখনো বা তাদের আকৃতি জিহ্বার মতো। রংয়ে সেগুলি উজ্জল নীল। তিনি হয়তো গবেষণালব্ধ বিষয়ে অসম্ভব সব বিষয় বলতেন, যেমন দৈত্যাকৃতি জীবগুলি চারটি অংগে বাতাসে দুলে দুলে ঘোরে আর ক্রমে প্রত্যংগগুলি দাড়ার আকার নেয়। এমন সময়ই হরিষে বিষাদ ঘটলো! সভার প্রথম সারির প্রাণবন্ত এক যুবক হঠাৎ-ই বলে উঠলো, "কেন, বলুন না একটা গরুর কথা।" ফলে অধ্যাপক ভুলে গেলেন তাঁর বিজ্ঞানজনোচিত গাম্ভীর্য। চিৎকার করে উঠলেন তিনি বজ্রনাদে,—"হ্যা নিশ্চয়ই ওরা গরু! এবং আপনারা কেউ-ই গরুর দিকে ফিরে তাকান না, এমন কী সেটা চাদ লাফিয়ে পার হবার চেষ্টা করলেও! এরপর সেই হতভাগা অধ্যাপক ভদ্রলোক হাত-পা ছুঁড়ে বলতে আরম্ভ করলেন তিনি এবং তাঁর সহকর্মী সেবা করা একপাল পাগল যাঁরা নাকী ধরিত্রী-মায়ের দিকে একবারও ফিরে তাকান না যে মাটির পৃথিবীর ওপর তাঁরা সদা সর্বদা পরিক্রমা করেন। অথচ এই পৃথিবীতেই আছে চরমতম আশ্চর্যজনক সব ঘটনা। এরপরই তিনি বক্তৃতার মোড় ঘোরালেন আর চলে গেলেন নারী প্রসংগে, নারীর সৌন্দর্যের স্নিগ্ধরূপ অনর্গল বলে চল্লেন। সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ এবং সভাপতি মহাশয় চিকিৎসা আর আরক্ষ বাহিনীর সাহায্য নিলেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন স্যার হোরেস হাণ্টার প্রখ্যাত মনঃশারীরবিদ যিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে সমান উৎসাহী। তিনি তৎক্ষণাৎ হতভাগ্য গ্রীণকে পরীক্ষা করে ঘোষণা করলেন যে স্পষ্টতঃ মনঃরোগে ভুগছেন তিনি। তৎক্ষণাৎ স্থানীয় একজন চিকিৎসক সেটায় সমর্থন জানালেন যাতে নোংরামি বেশী দূর না গড়ায়।

"এরপরই ঘটলো অদ্ভুৎ এক ঘটনা। পূর্বোল্লেখিত যুবকটি যে নাকী বার-বার ঘটনাকে ব্যাহত করেছিলো অযৌক্তিক কথাবার্তায়। খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলো অধ্যাপক ভদ্রলোকই একমাত্র সভায় উপস্থিত স্বাভাবিক মানুষ।

যে দল অধ্যাপককে ঘিরে রয়েছিলো তার দিকে ছুটে গেলো সে। মঞ্চ থেকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলো স্যর হোরেস্ হাণ্টারকে, একজন দলীয় গুণ্ডার সাহায্যে উন্মাদকে চিকিৎসক আর আরক্ষ বাহিনীর হাত থেকে মুক্তকরে সভাকক্ষ আর অট্টালিকার বাইরে নিয়ে গেলো তাকে। অনুসরণকারীরা ঐ পাগলের দলকে একদম অদৃশ্য হতে দেখে পুরোপুরি হতভম্ব হয়ে গেলো প্রথমে। পরে অবশ্য ধরা পড়লো তাঁরা বিমানে পালায়। যুবকটির নাম পরে জানা যায়। তিনি হচ্ছেন পিয়েস প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক। উড়ন্ত সংঘের ভূতপূর্ব সদস্য। অপর জন, যে তাকে গুণ্ডামিতে সাহায্য করেছিলো আর সহকারী বৈমানিকের কাজ করেছিলো, তার নাম জানা যায়নি।"

রাত ঘনিয়ে এলো। তারারাজি ডালের থামারে এক সময় ঝিকমিক করতে আরম্ভ করলো। মিথ্যাই দূরবীনটা আকাশের দিকে মুখ উঁচিয়ে। বিরাট বিরাট আতস কাজগুলি বৃথাই চাঁদের ছবি তুলছে এমন—যার সম্বন্ধে অধ্যাপক মহাশয় এতোদিন ব্যর্থ বাগাড়ম্বর করেছেন। কিন্তু কামানের মালিক অধ্যাপক গ্রীণ আর ফিরে এলেন না। কুমারী ডোল তাঁর অনুপস্থিতে ভীষণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লে। দুয়েকবার কথাটা বল্লোও। পরিবারের অন্যান্যরা স্বাভাবিক ভাবেই বল্লো যে রাতের জন্য তাঁর পক্ষে রাতের কোনো হোটেলে ওঠাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে বাঘা বাঘা জ্যোতিশাস্ত্রবিদদের গবেষণার বিষয়বস্তু যদি বিরাট কিছু একটা হয়। জোতদার-গিন্নী কিছুটা বা ভারমুক্ত মনেই বল্লেন, "এটা তো আমাদের ব্যাপার না। মিনসে তো আর কচিখোকা নয়।" জোতদারবালা অবশ্য খুব একটা জোর দিয়ে সেটা অস্বীকার-ও করলো না।

পরের দিন সকালে সে অন্যান্য দিনের চেয়েও সকালে উঠে ঘরের কাজে মন দিলো। যে কোনো কারণেই নিত্য কর্মগুলি তার কাছে তুচ্ছাদিতুচ্ছ বলে মনে হলো। সকালের শান্ত পরিবেশে খুবই স্বাভাবিক যে তার মন আগের দিন বিকেলের ঘটনায় চলে যাবে। আর সে ঘটনা যাহোক—তা হোক বলে কোনো মতেই উড়িয়ে দেবার মতো নয়। নিজেকেই নিজে শোনালো সে, "লোকটা যে বাচ্চা নয় বলাটা খুবই সোজা। আমি নিশ্চিত হতাম মানুষটা আর যাহোক নির্বোধ নয়। হোটেলে গেলেই লোকে ওকে ঠকাবে।"

নিজের চারপাশে সূচিতীক্ষ্ণ আর গন্ধময় পৃথিবীর রূপটা দিন বাড়বার সংগে সংগে তার নীল চশমা পরা নীল চাঁদের দিকে উঁকি ঝুঁকি মারা মানুষটার সম্ভাব্য পরিনতির কথা ভেবে ভয় হলো। ভাবলো ও বটে এক সময়, লোকটা কী করে না করে তার জন্য কী তার পরিবার দায়ী নাকী। সত্যি সে নাবালক। কখনো মানুষটাকে আপনজনদের সম্বন্ধে কিছু বলতে শোনেনি। যদিও সে তাকে

অনেক ভালো ভালো কথা বলতে শুনেছে। কোনো বন্ধুর সংগেই তাঁকে কখনো কথা বলতে দেখা যায়নি। অবশ্য একবার সে জ্যোতিশাস্ত্র ব্যাপারে কাপ্তেন পিয়েসের্র সংগে আলোচনারত দেখেছিলো। পিয়েসের্র সংগে যুক্ত আর একটা কথা তার পিয়ের্স প্রসংগেই মনে এলো। পাহাড়ের ওপারে 'নীল শূকর সরাই'য়ে পিয়ের্স থাকেন। উনি আগের বছর দুয়েক আগে সরাইওলার মেয়ে জোয়ানকে বিয়ে করেছেন। জোয়ান তার পুরনো দিনের সোহেলী। জেলা শহরের একই স্কুলের ছাত্রী তারা। নিজেকেই নিজে শোনালো আবার, "জোয়ান এ ব্যাপারে কিছু জানতে পারে অন্তত ওর স্বামী—দেবতা তো বটেই।"

ঐ সকালে ঐ ভাবে বন্ধুকে সে হঠাৎ-ই অপ্রচলিত ভাবে চমকে দিলো। সে বয়সে জোয়ানের চেয়ে ছোটো আর প্রাণ ভবপুরে ওর থেকে বেশী টগ্‌বগ্‌। জোয়ানের ছেলেমানুষীও এখন আর নেই। তবুও জোয়ান তার ইস্পাতের বাঁকা তরোওয়ালের মতো কৌতুকে মরচে ধরায়'নি। চোখে চোখ রেখে সে বন্ধুর দুঃখের আসল কারণটা জেনে নিলো।

"আমরা জানতে চাই আসলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো", অমনোযোগের সংগে ডাল বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলো, "যদি খারাপ কিছু ঘটে থাকে, তাহলে লোকে আমাদেরই মন্দ বলবে যেহেতু আমরা জানি লোকটা ঐ প্রকৃতির।"

"কোন্ প্রকৃতির?" হাসতে হাসতেই জোয়ান জিজ্ঞাসা করলো।

"ঐ যে" অপরজন উত্তর দিলো, "ঐ যে তিনি সব সময় বলেন গরু, চাঁদ আর ঐ যে তিনি একটা পুরনো তারা না কী আবিষ্কার করেছেন—"

"ভাগ্য ভালো তুমি এখানে এসেছো।" শান্তভাবে জোয়ান বল্লো, "কারণ আমি ছাড়া মনে হয় না পৃথিবীর আর কেউ জানে ঠিক এই মুহূর্তে তিনি কোথায় আছেন।"

"তিনি কোথায়?"

"অবশ্যই পৃথিবীর বুকে নেই।" উত্তর দিলো জোয়ান পিয়ের্স।

"তুমি নিশ্চয়ই বলছো না—মারা গেছে?" অস্বাভাবিক কণ্ঠে বলে উঠলো অপর জন।

"আমি বলতে চাই তিনি আকাশের ওপর" বল্লে জোয়ান "বা অন্যভাবে বলা যায় তিনি আমার স্বামী দেবতার সংগে আছেন। যে মুহূর্তে লোকেরা তাঁকে ধরলো হিলারি তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে উড়োজাহাজে চম্পট। ভাবলো তাঁরা, সেই মুহূর্তে মেঘের আড়ালো কিছুক্ষণ লুকিয়ে থাকা তাদের পক্ষে

ভালো। তুমি জানোই তো ভদ্রলোকের কথাবার্তা। বিপদ কাটলে যে কোনো সময় উদয় হবে।"

'পালিয়ে গেছে! ধরেছে! নিরাপদ!' চোখ বড় বড় করে কুমারী ডাল্ আউড়ে গেলো, "কিন্তু এ-সবের মানেটা কী?"

"ভালো কথা," তার বন্ধু উত্তরে বল্লো, 'বাথে এক ঘর লোকের সামনে ঠিক সেই কথাই বল্লো যা না কী তোমাকে তিনি বলে বেড়ান। বুঝে দেখো ব্যাপারটা, যা হবার তাই হলো। অন্যান্য বৈজ্ঞানিকরা বলে উঠলো লোকটা পাগল! আর আমার নিজের মত-ও তাই। তাই লোকেরা তাকে গারদে ঢোকাবার ব্যবস্থা করতে হিসারি ছুটে গেলো—"

জোতদার কন্যা রাগে গর্ গর্ করতে করতে এমনভাবে উঠে দাঁড়ালো যেন—পারে তো ছাদই ফুঁটো করে যায়, যেন বিরাট এক সূর্য-গোলক যে ন কি এক ধাক্কায় ছাদ ভেংগে দেবে।

"তাকে নিয়ে যাবে!" চিৎকার করে উঠলো ডাল, "কতো বড় সাহস? সে পাগল? ওরা যে ধরণের কথাবার্তা বলে ওরাই পাগল! ওদের সবগুলি টেকো মাথা গুঁড়িয়ে মস্তিকগুলি যদি একসংগে অধ্যাপকের বুট জুতোয় ঢোকানো হয় তাহলেও অনেক জায়গা থেকে যাবে। দাঁড়াও ওদের সবকটা গোবরে পোরা মাথা ভাংগছি। ওদের মাথাগুলি হচ্ছে ডিমের খোলসের মতো ভংগুর আর ওঁর মাথা ঢালাই লোহার। তুমি কী জানো না ও তাঁর তারকার ব্যাপারে গবেষণায় বুড়ো-হাবড়াগুলোকে হারিয়ে দিয়েছে। আমার মনে হয় ওরা সবকটা হিংসুটে—ওই লোকগুলোর কাছ থেকে এর বেশী আর কী আশা করতে পারো?"

সত্যি বলতে ওই সব বৈজ্ঞানিকদের একটারও নাম ও জানতো না। অথচ সবকটার নামে কথার ফুলঝুরি ছুটিয়ে বাপান্ত করে ছাড়লো। "থুৎকারের মতো ঘৃণ্য জলপী ওলা তিন কেলে বুড়োর দল!" রাগে গর্জন করলো ডাল্, "মাকড়সার মতো সব নোংরা জাল বিছিয়েছে সুন্দর সুন্দর কীট পতঙ্গ ধরবে বলে। নিশ্চয়ই এ সব শয়তানি। ওরাই হচ্ছে পাগল তাই সুস্থ মানুষ ওকে হিংসা করে।"

"তাহলে তুমি বলছো ভদ্রলোক সুস্থ মস্তিক সম্পন্ন?" গম্ভীর ভাবে তার বন্ধু জিজ্ঞাসা করলো।

'সুস্থ? কী বলতে চাও? নিশ্চয়ই সে সম্পূর্ণ সুস্থ?" উত্তর দিলো মার্গারী। চূড়ান্ত মহানুভবতা দেখিয়ে জোয়ান ব্যাপারটা চেপে গেলো।

কিছুক্ষণ বাদে বল্লে, "এখন ব্যাপারটা হিলারির হাতে আর তোমার বন্ধুও নিরাপদে। ব্যাপার যতো অদ্ভুৎ আর আশ্চর্যই হোকনা হিলারি ঠিক ফাল্ হয়ে বেরিয়ে আসবে। বন্ধু হিসেবে বলছি তোমাকে অসম্ভব সম্ভব করতে পারে ও। লড়াকু মন হলে তুমি কোনো কাজ থেকে ওকে নিবৃত্ত করতে পারবে না। এখন এই মুহূর্তে ও পৃথিবীর বিরুদ্ধে লড়াই-য়ে নেমেছে। সুতরাং ঐ বুড়োগুলোর মাথা যদি একসংগে গুঁড়ো হয়ে যায়, তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ওর আর এক বন্ধু বেলুন নিয়ে তৈরী, মনে হচ্ছে তুলকালাম কিছু একটা ঘটবে। এবং এর আগুন সমস্ত ইংলণ্ডে ছড়িয়ে পড়তে পারে।"

"সত্যি না কী?" অন্যমনস্কভাবে বলে উঠলো ডাল (দুঃখজনক ভাবে তার নাগরিক ও রাজনৈতিক জ্ঞানের অভাব), "ঐটেই কী তোমার বাচ্চা?" এর পর তারা বাচ্চাটির কথা আর অন্যান্য অবান্তর কথায় চলে এলো: কারণ তাদের ছিলো নিজেদের মধ্যে সুন্দর বোঝাপড়া।...

জলবৎ তরলং

এইচ. জি ওয়েলস্

"এবার এটা," বীজাণুতত্ত্ববিৎ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কাচের নীচে আয়তাকার কাঁচ একটা চালান করে দিয়ে বল্লেন, "হচ্ছে বহু কথিত কলেরা বীজাণুর আরং-এর একফোঁটা মাত্র।"

বিবর্ণ মানুষটা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দেখবার জায়গায় একটা চোখ রাখলেন। লোকটা ঐ কাজে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত। একটা হাত দিয়ে মড়ার মতো অপর চোখ ঢাকলেন, "কিছুই দেখতে পাচ্ছি না আমি" বল্লেন তিনি।

"স্ক্রু-টা ঘোরান" বল্লেন বীজাণুতত্ত্ববিৎ "মনে হচ্ছে কাঁচ-পাত্রটা আপনার চোখের দৃষ্টির বাইরে। মানুষের চোখের দৃষ্টিশক্তির যে কতোরকম মাপ। স্ক্রু-টা'র এদিক বা ওদিক একচুল ঘোরান।"

"বাঃ! এই তো দেখতে পাচ্ছি।" আগন্তুক বল্লেন এবার "খব একটা আহা মরি কিছু নয়। লালচে ছেঁড়া ছেঁড়া কিছু জিনিষ; তবুও ঐ ক্ষুদে জিনিসগুলি ঐ পরমাণু আকৃতির জীবগুলি বাড়তে বাড়তে একটা গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়তে পারে। কিমাশ্চর্যম্ অতঃপরম্!"

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। কাঁচ পাত্রটা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আংটা থেকে বার করে জানলার কাছে ধরলেন, "প্রায় দেখাই যায় না," জিনিষটা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে মন্তব্য রাখলেন তিনি। কিছুটা ইতঃস্তত করলেন। তারপর বলেই ফেল্লেন—"এগুলি কী জীবন্ত? এই মুহূর্তে কী ওরা মারাত্মক?"

"এগুলির ওপর রং ফেলা হয়েছে, হ্যা, ওরা এখন মৃত," উত্তর দিলেন বীজাণুতত্ত্ববিৎ, "যদি আমার কথা ধরেন তবে বলবো বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যতো বীজাণু আছে তারা যেন এই মুহূর্তে মারা যায়।"

"মনে হয় বিবর্ণ মানুষটা কাষ্ঠ-হাসি দিয়ে বল্লেন, "আপনি বোধহয় ঐসব বীজাণু জীবন্ত বা কার্যকর অবস্থায় রাখতে পছন্দ করেন না?"

"ঠিক উল্টোটা আমরা ওদের জীবন্ত অবস্থায় রাখতে বাধ্য," বল্লেন বীজাণুতত্ত্ববিৎ। "উদাহরণ স্বরূপ ধরুন," ঘরের একদিকে সরে গিয়ে অনেকগুলি সীল করা পরীক্ষা নলের মধ্য থেকে একটা তুলে নিলেন, "এই যে এখনটায় রয়েছে জীবন্ত জীবাণু। এটা কার্যকরী বীজাণুর একটা আরং। কিছুটা বা ইতঃস্তত করে বল্লেন, ''এক বোতল কলেরা রোগ বলা যেতে পারে।''

বিবর্ণ মানুসটার ওপর দিয়ে সন্তুষ্টির একটা ক্ষণিক আভা খেলে গেলো, "এ-সব জিনিষ রাখা যে মারাত্মক ব্যাপার," বল্লেন মানুষটি আর দৃষ্টি দিয়ে যেন কাঁচ-নলটা গিলতে চাইলেন। বীজাণুতত্ত্ববিৎ আগন্তুকের ঘৃণ্য আনন্দ কিছুটা বা লক্ষ্য করলেন। লোকটা তাঁর কোনো এক বন্ধুর কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে এসেছে। কিন্তু তার ঘরে ঢোকার মুহূর্ত থেকে ভাবসাব যেন কেমন, পাতলা কালো-গভীর ধূসর চোখ-জোড়া, হতচ্ছাড়া চেহারা, ঘাবড়িয়ে যাওয়া ভাব। ভীত অথচ গভীর অনুসন্ধিৎসা তাঁর সহকর্মীদের উন্নাসিকতা থেকে অনেক ভালো। অবশ্য বিষয়টার মারাত্মকতার ব্যাপারে এই অদ্ভুৎ আচরণ-ই বোধহয় স্বাভাবিক।

চিন্তান্বিতভাবে সে কাঁচ নলটা হাতে ধরে রইলো, "হ্যা, মড়ক এখানে বন্দী। এরকম একটা কাঁচ-নল ভেংগে পানীয় জলে মিশিয়ে দিন। হ্য এই ক্ষুদ্রতম জীবগুলি যেগুলি রং আর অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দূর পাল্লার আতস-কাঁচ ছাড়া দেখা যায় না। স্বাদহীন-গন্ধহীন, এদের বলুন 'যাও, বাড়ো আর বাচ্চায় গড়িয়ে যাও!" তখন খেল শুরু হবে মৃত্যুর—রহস্যময়, যোগসূত্রহীন, দ্রুত আর ভয়ঙ্কর মৃত্যুর লীলা-খেলা। আর কী ধরণের মরণ? ব্যথা আর লজ্জাকর! যদি বীজাণুদের এ-শহরে ছেড়ে দেওয়া হয়? এখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়বে ওরা শিকারের আশায় ওৎ-পেতে, স্বামীকে বৌয়ের কাছ থেকে,

ছেলেদের মার থেকে রাজনীতিবিদদের কার্যধারা থেকে। শ্রমিক খসে যাবে শ্রম থেকে। জলের নালী দিয়ে ছড়িয়ে পড়বে। রাস্তা থেকে অন্য রাস্তায়। এ-বাড়ীটা ধরলো তো ও বাড়ীটা ছাড়লো। এবং তারাই মরবে যারা জল ফুটিয়ে খায় না। শৌখিন জল প্রস্তুতকারকদের কুঁয়োয় ঢুকে যাবে ওরা। খাবারের চাটে ঢুকবে, বরফে থাকবে ঘুমিয়ে। ঘোড়ার পানীয় জলে ঢুকবে। সাধারণের পানীয় জল হয়তো অসতর্ক বাচ্চারা খেয়ে বসবে। মাটিতে পড়লে জলের সঙ্গে চুঁইয়ে মাটির ভেতর সেঁধোবে। তারপর একসময় উঠবে কুঁয়ো আর ঝরণা ধারার সঙ্গে। একবার কেবল ছেড়ে দাও, আর সম্পূর্ণ নিঃশেষ করার আগে শহরের বেশ কিছু মানুষকে ধ্বংস করবে ওরা। হঠাৎই থেমে গেলেন তিনি। লোকে বলে গদ্গদ্ ভাবই তাঁর দুর্বলতা। 'কিন্তু এখানে, এই জায়গায়, সে নিশ্চয়ই নিরাপদ?"

বিবর্ণ মানুষটা মাথা নাড়লেন। জ্বলে উঠলো চোখ তাঁর। গলাটা পরিষ্কার করলেন, "আর ঐ সন্ত্রাসবাদী বদমাসগুলি" বল্লেন তিনি, "বোকা একেবারে চোখে দেখে না—বোমা মারতে যায়! হাতের কাছে এমন একটা জিনিষ থাকতে। মনে হয়—"

মৃদু আঘাত, নখের ছোঁয়াই বলা যেতে পারে দরজায় শোনা গেলো। দরজা খুল্লেন বীজাণুতত্ত্ববিৎ, "এক মিনিট এদিকে এসো।" বল্লেন বীজাণু তত্ত্ববিৎ-গৃহিনী।

ফিরে এলেন যখন পরীক্ষাগারে তখন আগন্তুক তাঁর ঘড়ি দেখছেন, "আরে ব্যাস্! আপনার একটা ঘটাই দেখছি নষ্ট করে দিয়েছি," বল্লেন তিনি "চারটে বাজতে মোট বারো মিনিট। সাড়ে তিনটেয় যাবার কথা আমার। কিন্তু আপনার আলোচনা এতো হৃদয়গ্রাহী। মাপ করবেন আর একমুহূর্ত সময় নষ্ট করবার নেই আমার। ঠিক চারটেয় অন্য একজনের সঙ্গে দেখা করবার কথা।"

ঘর ছাড়বার মুহূর্তে আর একবার ধন্যবাদ জানালেন তিনি। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন বীজাণু তত্ত্ববিৎ। চিন্তাক্লিষ্ট মনে বারান্দার পথে ফিরে এলেন পরীক্ষাগারে। ভাবতে লাগলেন তিনি আগন্তুক কী ধরণের মানুষ! লোকটা না ল্যাটিন না টিউটন। "একটা অদ্ভুত মানুষ যেভাবেই ধরা যাক যাক না কেন," নিজেকেই নিজে শোনালেন যেন তিনি।—'এই বীজাণুদের আড়ং-জাত করার ব্যাপারটা কেমন যেন গ্রাসে গিলছিলো। হঠাৎ-ই একটা অশুভ চিন্তা তাঁর মাথায় খেলে গেলো। জল গরম করবার গোসাপের পাশে

সরে গেলেন তিনি। তারপর চলে এলেন লেখবার টেবিলটার কাছটায়। পকেটে হাত দিলেন তাড়াতাড়ি। শেষমেষ ছুটে গেলেন দরজার কাছে। "বোধহয় হল ঘরের টেবিলে ফেলে রেখেছি।" প্রবোধ দিলেন নিজেকে।

"মিনি!" হল-ঘর থেকে কর্কশ-স্বরে চিৎকার করে উঠলেন। "কি গো!" দূর থেকে উত্তর ভেসে এলো।

"এক্ষুনি, এই যখন তোমার সঙ্গে কথা বলছিলাম, তখন কী আমার হাতে কিছু ছিলো ?"

কিছুক্ষণ চুপচাপ। "না কিছুই তো ছিলো না, কারণ আমার মনে আছে—"

"জাহান্নামে যাও!" আবার চিৎকার করে উঠে বীজাণুতত্ত্ববিৎ সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজার দিকে ছুট দিলেন। তারপর সিঁড়ি দিয়ে সোজা রাস্তায়।

দরজা বন্ধ হবার ভীষণ শব্দে মিনি দেবী জানলার কাছে ছুটে গেলেন সভয়ে। রাস্তায় রোগা মতো একটা মানুষ সবে ঘোড়ার গাড়ীতে উঠেছিলো। খালি মাথায় আর শুধুমাত্র কার্পেট চটি পরে স্বামী দেবতা ছুটছেন আর হাত-পা ছুঁড়ে কিছু বলতে চাইছেন। হঠাৎ চটিজোড়া খসে গেলে। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর। মানুষটা কী পাগল হয়ে গেলো না কী!

বল্লেন মিনি দেবী "ঐ বিজ্ঞান ওকে শেষ করলো " জানলা খুলে ডাকতে—ও যাচ্ছিলেন। কিন্তু রোগা লোকটা হঠাৎ চারদিক তাকালো একই রকম পাগলামীর দৃষ্টিতে। বীজাণুতত্ত্ববিদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলো গাড়োয়ানের আর কিছু বল্লো-ও তাকে। গাড়ীর দরজা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেলো। সপাসপ চাবুক উঠলো, ঘোড়ার পা থেকে ছুটে চলার টগবগ ছন্দ উঠতে না উঠতেই বীজাণুতত্ত্ববিৎকে দূরে রেখে রাস্তা আর দৃষ্টি ছাড়িয়ে উধাও হলো ঘোড়ার গাড়ী রাস্তার কোণায়।

সে যেন ঐ পথে রোজই ঘোড়া চালিয়ে থাকে।

হ্যাভারষ্টক পাহাড়ের ঘোড়ার গাড়ী চালক আর ভবঘুরেদের জটলাটা থমকে গেলো যখন একটা সাদা-রংয়ের মাথায় ক্রু-চিহ্ন আঁকা ঘোড়া ঝড়ের বেগে একটা গাড়ী টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

গাড়ীটা যাওয়া পর্যন্ত তারা চুপ করেছিলো। শব্দটা মিলিয়ে যেতে বুড়ো টোকটেল বলে উঠলো, "কেডা গেলো র‍্যা? হ্যারি জিক্ না? ভেতরে কে ডা-রে?

"ঠিক বয়েছো, চ্যামনা-টা চাবুক শানাচ্ছে, নিশ্চয় ওর চাবুক মারবার লাইট আছে," মুখ খোলে মদের দোকানের ঘোড়া-ওলা। 'মাই বাপ্!' হাঁ

হয়ে গেলো। বুড়োধেড়ে টমি বাইলস্, "আরেক হেঁআটে পাগলা আসছে। হাওয়ায় উড়বে না কী?"

মিন দেবী জানলা দিয়ে কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। জানলা থেকে মাথা সরিয়ে নিলেন ঘরের ভেতর। বোকা বনে গেলেন, "নিশ্চয়ই লোকটি পাগল, ধারণা করলেন তিনি। কিন্তু বছরের এই সময় শুধুমাত্র মোজা পরে লণ্ডনের রাস্তায় ছুটে বেড়ানে।" একটা সান্ত্বনার উপায় মনে এলো তাঁর। খুব তাড়াতাড়ি টুপি চড়ালেন মাথায়, স্বামীর জুতো-জোড়া তুলে নিলেন, আর নিলেন কোট ঝোলাবার জায়গা থেকে পাতলা লম্বা কোট। সদর দিয়ে বেরোতে না বেরোতে ভাগ্যক্রমে একটা ঘোড়ার গাড়ী পেয়ে গেলেন। "এই রাস্তায় সোজা আমাকে হ্যাভলক বাঁকের দিকে নিয়ে চলো। যেতে যেতে খুঁজবে ভেলভেটের কোটওলা আর খালি মাথার এক ভদ্রলোককে।"

"ভেলভেট কোট আর খালি মাথা তো? ঠিক আছে," বলেই মত্যন্ত তৎপরতায় ঘোড়ার পিঠে চাবুক চালালো গাড়োওয়ান। হাবভাবে মনে হলো এ-রাস্তা যেন তার মুখস্থ।

"আরে, এ যে দেখছি ঘটের মড়া জর্জ," বল্লো বুড়ো ধেড়ে টোটেল, "ঠিকই বোয়েছো। হাঁদা-টা আরেকটা পাগলকে টানছে। ওর আবার হাতে ওটা কোনডা? লে হালুয়া, ও ব্যাটা কী হ্যারিহিকের পেছু ধাচ্ছে?"

খুবই মজা পেয়ে গেলো ঘোড়া চালকদের জটলা-টা। সকলে মিলে এবার গলা মেললো, "চালাও জর্জ, খুব জোর দিচ্ছো, চলবে চলবে, ধরে ফেলো, চালাও চাবুক গুরু!"

মদের দোকানের ছেলেটা বল্লো এবার, "লে চকাচক! এবার একটা মেয়ে ছ্যানা ওর যে পেছু নিয়েছে!"

"মাথাটা চড়কি খাচ্ছে!" বুড়ো টোটেল বলে উঠলো, "হয় এসপার নয় এসপার, আমিও লেগে যাই! আরে মলো যা, আরেকটা যে আসছে! ব্যাপারটা কী ঠাউরাচ্ছ তো? হ্যাম্পষ্টেডের সব কটা কী আজ সকালে পাগল হলো না কী গো?"

"এবার কিন্তু মেয়ে," বল্লে বুড়ো টোটেল।"

"আরে, ওর হাতে ওটা কী রে?"

"মনে লয় কানাওলা টুপি বটে!"

"কী একটা কপাল রে। বুড়ো জজের বাজী লণ্ড তিন এক!" মদের দোকানের ছোকরা গাড়োয়ানটা বল্লো এবার, "হ্যাদা।"

চারধারের তুমুল চিৎকারের মাঝে সময় কেটে যায়। ব্যাপারটা তার অপছন্দ হলেও মি-দেব'র এটা কর্তব্য-ও বটে। ক্রমে ক্রমে হ্যাভারষ্টক পাহাড়, ক্যামাডন শহরের বড় সড়ক-কে পেছনে ফেলে এলেন তিনি। সব সময়ই তিনি বুড়ো জর্জের গাড়ীর পেছনের দিকটায় চোখ আটকে রাখলেন। ঐ গাড়ীটায় আবার তাঁর স্বামী বসে আছেন। কিন্তু গাড়ীটার অবস্থা যেন, "ও কেবল পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায় ডাক দিয়ে যায় ইংগিতে।"

একেবারে প্রথমের গাড়ীটার যাত্রী গাড়ীর কোনায় জড়সড় হয়ে বসে আছেন। হাত দুটো জড়ো করা। একটা হাতের মধ্যে আছে আবার কাঁচ-নল যার ধ্বংসের ক্ষমতা অপরিসীম। মুখে তার ভয় আর আশার মিশ্রিত ভাব। কাজ শেষ হবার আগেই যদি সে ধরা পড়ে—ভয় তার জন্যেই। তার চেয়েও বড় ভয় হচ্ছে তাঁর অপরাধের বিভীষণত্ব। কিন্তু সব ভয়কে ছাপিয়ে উল্লাসে সে ভরপুর কারণ তাঁর আগে অপর কোনো সন্ত্রাসবাদী তার এই মুহূর্তের কাজের সম্ভবনাটা ভাবতেও পারেনি। র‍্যাভাকল, ভ্যাঁলা যাদের সে সব সময় হিংসে করে আসছে, তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎকর। তাঁকে এখন শুধু খুঁজতে হবে একটা জলের ট্যাংক। তারপর সীলটা ভেংগে কাঁচ-নলটা তার মধ্যে উপুর করে দিতে হবে। কী সুন্দর ভাবে কাজটা উৎরিয়ে নিয়ে গেছে সে। চিঠি জাল করা থেকে আরম্ভ করে আর পরীক্ষাগারে ঢুকে সুযোগের সৎ ব্যবহার করা পর্যন্ত। পৃথিবী তাঁর নাম তাহলে শেষ কালে জানবে। একদিন যারা তাঁকে নাক কুঁচকেছিলো, অবহেলা দেখিয়েছিলো, অমান্য করেছিলো, নিঃসংগ রেখেছিলো আজ তারাই আবার তাঁর কথা চিন্তা করবে। মৃত্যু, মৃত্যু আর শুধুই মৃত্যু! তাঁকে এতোদিন তারা হীন ভেবে এসেছিলো। সমস্ত জগৎ-টাই যেন তাঁর বিরুদ্ধাচরণে মেতেছিলো এতদিন আজ তাদের সে হাড়ে-হাড়ে টের পাইয়ে দেবে তাঁকে অমান্য করার ফল। আরে, এটা কোন জায়গা —মহান ঋষি এণ্ড্রুজর নামে রাস্তাটা না? নিশ্চয়! আর ছুটে লাভ কী? সারসের মতো গাড়ী থেকে গলা বাড়ালে লোকটা। জীবাণুতত্ত্ববিৎ খুব জোর পঞ্চাশ গজ পেছনে তাঁর থেকে। খুব খারাপ। ধরা পড়বে, তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে? পকেটে হাত চালাতে একটা আধ-সোনার পয়সা ঠেকলো। ফুটো দিয়ে সেটা ওপরে গাড়োয়ানের দিকে চালিয়ে দিলেন তিনি, "আরো জোরে, তবেই তুমি ওকে এড়াতে পারবে।"

হাত থেকে কেড়ে নিলো পয়সাটা, "আজ্ঞে কর্তা, যা বলেছেন," বন্ধ হয়ে গেলো ফুটো। তারপরেই আরম্ভ হলো ঝকঝকে ঘোড়ার পিঠে চাবুকের ওপর

চাবুক। দুলে উঠলো গাড়ীটা। গর্তের তলায় দাঁড়িয়ে টাল সামলাতে পারলেন না সন্ত্রাসবাদী। কাঁচ-নল ধরা হাত দিয়েই তিনি নিজের ভারসাম্য রক্ষা করতে চাইলেন গাড়ীর দরজা আঁকড়িয়ে। মড়মড়ে জিনিষটা হাতে ভাংগায় স্পষ্ট অনুভূতি পেলেন। মুখ খারাপ করে আসনে বসে পড়লেন তিনি আর গভীর বিষাদে দরজায় লেগে থাকা দু তিন ফোঁটা তরল বস্তুর দিকে চেয়ে রইলেন তারপর। কেঁপে উঠলেন মানুষটা।

"আমিই বোধহয় প্রথম যে সুযোগটা হারালো, দুর্ভাগ্য আমার! যা হোক শহীদ হওয়া থেকে তো আর কেউ আটকাতে পারছে না। সেটা অবশ্য কথা। কিন্তু মরণটা যে বড়ই নুক্কারজনক, কিন্তু ব্যথাটা ওরা যা বলে ঠিক কী তাই?"

হঠাৎই চিন্তাটা তাঁর মাথায় এলো। পায়ের কাছে গুঁড়ি মেরে এলো সে। ভাংগা কাঁচ-নলে তখনো এক ফোঁটা বীজাণুর আডৎ রয়ে চ। সেটা যথার্থ কিনা দেখতে মুখে ঢেলে দিলেন তিনি।

নিশ্চিত হওয়াটাই ভালো। যাই হোক, পরাজয় তিনি কিছুতেই স্বীকার করবেন না ভাবলেন এবার। বীজাণুতত্ত্ববিৎ লোকটার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াবার আর দরকারটা কী? গাড়োওয়ানকে ওয়েলিংটন স্ট্রীটে আসতে বলে নেমে এলেন গাড়ী থেকে তিনি। পাদানিতে পা পিছালালো আর মাথাটাও যেন কেমন করে উঠলো। এই কলেরার বীজাণুগুলি খুব তাড়াতাড়ি বংশ বিস্তার করে। হাত নেড়ে গাড়োওয়ানকে চলে যেতে বলে বুকের ওপর হাত জড়ো করে ফুটপাথে তিনি জীবাণুতত্ত্ববিদের অপেক্ষায় রইলেন। দাঁড়ানো ভংগীটাই তার কেমন বিষাদময়। আসন্ন মৃত্যু যেন তাকে গরিমায় ভরিয়ে দিলো। অপরাজেয় হাসি পশ্চাদপদধারীকে আহ্বান করলো এক সময়।

"সন্ত্রাসবাদ চিরজীবী হোক! বন্ধু আপনার বেশ দেরী হয়ে গেছে। পান করে ফেলেছি আমি। কলেরা রোগ এখন আমার ভেতরে!"

বীজাণুতত্ত্ববিৎ ঘোড়ার গাড়ীর ভেতর থেকে তার চশমার আড়ালে অদ্ভুৎ হাসলেন। "তুমি খেয়ে ফেলেছো! সন্ত্রাসবাদী এবার ব্যাপারটা সরল হলো।" আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। না, সংযত করে নিলেন নিজেকে। ঠোঁটের কোন দিয়ে বাঁকা হাসি হাসলেন। গাড়ীর দরজা খুলে ভাব দেখালেন যেন তিনি নাববেন। খেয়াল করলেন সন্ত্রাসবাদী নাটকীয়ভংগীতে বিদায় জানিয়ে ওয়াটার্লু সেতুর দিকে যতোগুলি সম্ভব মানুষের গা নিজের বীজাণু কলংকিত দেহ ঘষতে ঘষতে এগিয়ে যাচ্ছে। বীজাণু-তত্ত্ববিৎ মানুষটার আচরণে এতো দূর মগ্ন ছিলেন যে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থেকেও তিনি স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলে

গেলেন। এই তন্ময় ভাব মিসিসদেবী জুতো, টুপি, ওভারকোট নিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ানো সত্ত্বেও বিন্দুমাত্র কেটে গেলো না ” “আমার জিনিসপত্র আনার জন্য তোমায় ধন্যবাদ,” বলেই আবার সন্ত্রাসবাদীর চিন্তায় হারিয়ে গেলেন।

“তুমি ভেতরে থাকলেই ভালো করতে,” দেখতে দেখতে মন্তব্য ছুঁড়ে দিলেন তিনি। ভদ্রমহিলার এখন বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে স্বামীটি তাঁর পাগল হয়ে গেছেন। এরপরই তিনি নিজের দায়িত্বে গাড়োওয়ানকে ফিরে যেতে বল্লেন। “জুতো পরেছি তো?” গাড়ীটা চলতে আরম্ভ করলে বল্লেন তিনি নিজেকে উত্তরও দিলেন নিজে, “হ্যা তাইতো।” সন্ত্রাসবাদীর চেহারাটা ছোটো হতে হতে একসময় দূরে মিলিয়ে গেলো। তারপর হঠাৎ-ই অদ্ভুৎ কিছু মনে এলো তাঁর আর হেসে উঠলেন তিনি। এবার মন্তব্য করলেন, “যাই বলো. ব্যাপার কিন্তু সাংঘাতিক।”

“ঐ যে লোকটা আমার সংগে দেখা করতে এসেছিলো, ও হচ্ছে সন্ত্রাসবাদী। না-না মাথা ঘুরে পড়ে যেওনা। তা'হলে আমি কিছুই বলতে পারবো না। আমি তাকে বোকা বানাতে চেয়েছিলাম—অবশ্য সে যে একজন সন্ত্রাসবাদী সেটা তখন অবশ্য জানতাম না। আমি মজা মারার জন্য নুতুন জীবাণুর কাচ-নলটা তুলে নিলাম—ঐ যে সেই কাঁচ-নলটা সেটা বাঁদরদের খাওয়াতে গায়ে নীল রংয়ের ছোপ ধরে, সে-টাকে আমি বোকার মতো বলে ফেলেছি এশিয়াদেশীয় কলেরা রোগের বীজাণু। আর সে-ও সমস্ত লণ্ডন শহরের জল বীজাণুদুষ্ট করতে চল্লো। এতোক্ষণে বোধহয় সে শহরটাকে নীল করে ফেলেছে। বীজাণুটা আবার নিজে খেয়ে ফেলেছে। অবশ্য জানিনা তার বেলায় ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে। তুমি তো দেখেছো একটা বেড়াল ছানাকে বীজাণুটা নীল করে দিয়েছে। তিনটি কুকুর-ছানার বেলায় ছাপ ছোপ নীল রং। আবার চড়ুই পাখীটা উজ্জল নীল রংয়ের হয়ে দাঁড়ালো এক-সময়। ঝামেলাটা হলো আমাকে আবার পয়সা আর মেহনৎ খরচা করে সবটা কেঁচে গণ্ডুষে আরম্ভ করতে হবে।…

উছলিল ফেনিল অনিল

—আগাথা ক্রিষ্টি

বিরাট মেহগেনী টেবিলের ওপাশে যিনি বসে আছেন তাঁর দিকে চিন্তান্বিত চোখে তাকালেন এরিকুল পোয়ারো। খুঁটিয়ে দেখলেন মোটা ভুরু, মাঝারি ধরনের মুখ, বড় চোয়াল আর অন্তর্ভেদী জ্বল জ্বলে চোখের চাহনি। লোকটাকে ভালো করে দেখে তিনি বুঝতে পারলেন কেন এমেরি পাওয়ার বিরাট ধনকুবের হয়েছেন।

এক সময় তার চোখ এমেরি পাওয়ারের টেবিলে ছড়ানো সুন্দর হাত জোড়ার ওপর গিয়ে থামলো। কী সুন্দর গড়ন। এ-ও বুঝতে পারলেন কেন এমেরি পাওয়ার সংগ্রাহক হিসেবে নামী। আটলান্টিক মহাসাগরের দু-কূলে শিল্প রসিক বলে সুপরিচিত। তিনি ও ইতিহাস দুই বিষয়বস্তুই তাঁর সংগে হাত ধরাধরি করে চলে। কোনো একটা জিনিস সুন্দর বলেই তার কাছে পার পায় না, তার অবশ্যই ঐতিহ্য থাকা চাই।

কথা বলছিলেন এমেরি পাওয়ার। শান্ত কণ্ঠস্বর খাদে চল্লেও বক্তব্য ঠিক জায়গায় গিয়ে পৌঁছায়। খুব জোরে কথা বলা লোকের বক্তব্য এর থেকে বেশী স্পষ্ট নয়।

"আপনি যে আমার কেসটা নেবেন না, জানতাম। আজকাল অনেক কেস-ই পাচ্ছেন তাহলে? কিন্তু আমার মনে হয় কেসটা নিলেই ভালো।"

"—তাহলে বিরাট কিছু এটা ভাবছেন?"

"হ্যা, আমার কাছে তো বটে।" এমেরি পাওয়ার বল্লেন—জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন পোয়ারো। মাথাটা একদিকে ঝুঁকে পড়েছে। তাকে দেখাচ্ছে ধ্যানস্থ রবিন পাখীর মতো।

অপর জন বলে চল্লেন,—"শিল্পকলা—যুক্ত কোনো একটা জিনিষের ব্যাপার এটা। পরিস্কারভাবে বলতে গেলে,—রেনেসাঁস আমলের সোনার কাজ করা একটা পানপাত্র। প্রবাদ আছে পোপ ষষ্ঠ আলেকজাণ্ডার রোডারিগো বোরজিয়া নিজে এই পানপাত্র ব্যবহার করতেন। তিনি কখনো-সখনো তার কোনো প্রিয়পাত্রকে এই পানপাত্র ব্যবহার করতে দিতেন। মজা হচ্ছে, সেই অতিথি এতে পান করার পরই মারা যেতেন।"

"বেশ মজার ইতিহাস," ছোট করে পোয়ারো বললেন।

"যেই এটা পেয়েছে সেই মারামারির সংগে জড়িয়ে গেছে। অনেকবার চুরি-ও হয়েছে। এটা-কে করায়ত্ত করতে খুন যে হয়নি তা নয়। রক্তের রেখা এই পানপাত্রকে যুগ থেকে যুগে অনুসরণ করে গেছে।"

"এর অন্তর্নিহিত মূল্য কোনো কারণে?

"অবশ্যই এর স্বাভাবিক মূল্য বিচার্য। পানপাত্রের ওপরের কাজ অপূর্ব (বেনভেনিউটো সেলিনি খোদইয়ের কাজ করেছেন বলে অনমান করা হয়)। খোদাইয়ের কাজটা হলো একটা গাছকে বেড়ে মনিমুক্তা খচিত সাপ। গাছের আপেলগুলি হলো সুন্দর সুন্দর পান্না।

বেশ কিছুটা আগ্রহ নিয়ে পোয়ারো মনে মনে গুঞ্জরণ তুললেন—"আপেল?"

"পান্নাগুলি সত্যি সুন্দর। সাপের গায়ের চুনিগুলিও তাই। কিন্তু কাপটার স'ত্যকারের দাম তার ঐতিহাসিক যোগসূত্র। প্রায় দশ বছর আগে মারচেস্ ডি সান্ ভেরাট্রিনো এটাকে নিলামে তোলেন। খদ্দের এলোপাথারি দাম হাঁকে। শেষমেষ এটা আমি-ই পাই ত্রিশ হাজার পাউণ্ড মূল্যে (অবশ্য তখনকার দিনের বিনিময় মূল্য হিসেবে)।"

পোয়ারো ভুরু তুল্লেন। ছোট করে বল্লেন,—"সত্যি রাজ-রাজড়ার দাম! ভাগ্যবান বটে মারচেস্ ডি সান্ ভেরাট্রিনো।

এমেরি পাওয়ার বল্লেন,—"বুঝলেন পোয়ারো সাহেব, যখন আমি সত্যি কোনো জিনিস কিনবো, তখন অবশ্যই তার ঠক্ মূল্য দেবো!" ঠাণ্ডা গলায় উত্তর দিলেন এরিকুল পোয়ারো,—"আপনি অবশ্যই স্পেনদেশীয় প্রবাদটা শুনেছেন,—ভগবান বলেন, তুমি যা চাও, তাই নাও মূল্যের বিনিময়ে।"

এক মুহূর্তের জন্য ধনকুবের মুখ ভংগী করলেন। রাগের একটা ঝিলিক তার চোখে নেচে গেলো। ঠাণ্ডা গলায় কথা পারলেন,—"পোয়ারো সাহেব আপনি দেখছি দার্শনিক হয়ে উঠলেন।"

"আমার স্মৃতিচারণের বয়স হয়েছে মশাই।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। কিন্তু শুধু স্মৃতিচারণ কী আমার হারানো পানপাত্রটা আমার কাছে ফিরিয়ে দেবে?" আমার মনে হয় দেবে না। কাজও দরকার।

ধীরস্থির ভাবে মাথা নাড়েন পোয়ারো,—"অনেক লোকই এই ভুলটাই করে।" মাপ করবেন পাওয়ার সাহেব। আমরা যে-জায়গায় চলে যাচ্ছি। আপনি বোধহয় বলছিলেন কাপটা আপনি মারচেস্ ডি সান্ ভেরাট্রিনোর কাছ থেকে কিনেছিলেন?"

"ঠিক তাই। এখন যেটা বলতে চাইছি তা হলো কাপটা আমার কাছে আসবার আগেই চুরি যায়।"

"কী করে?"

"মারচেসের প্রাসাদ নিলামের রাতেই চুরির খবরে পরে। আট দশটা মূল্যবান্ জিনিষের সংগে কাপটাও চুরি যায়।

"কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিলো?"

পাওয়ার কাঁধ ঝাঁকালেন, "পুলিশ অবশ্য ব্যাপারটা হাতে নিলো। তল্লাসীতে জানা গেলো চুরিটা একটা আন্তর্জাতিক চোরের দল করেছে। দু-জনের মধ্যে একজন ফরাসী, নাম দিবলা। অপর জন রিকোভেত্তি নামের ইটালী। দু-জনে বিচারের সম্মুখীন হয়। চোরাই মালও উদ্ধার হলো কিছু কিছু।"

"কিন্তু বোরজিয়ার পানপাত্রটা পাওয়া যায়নি?"

"হ্যা বোরজিয়ার পানপাত্রটা পাওয়া যায় নি। পুলিশ যতোদূর বুঝতে পেরেছিলো,—তিনজন লোক মোট এই চুরির ব্যাপারে জড়িত। দু জনের নাম আগেই বলেছি। তৃতীয় জন হলো এক আইরিশ। প্যাটিক কেসী নাম। এই শেষের জন বিড়ালের মতো সঞ্চরণশীল দক্ষ সিঁধেল। এই লোকটাই আসলে চুরি করেছিলো বলে লোকে অনুমান করে। দলের মাথা দিবলা। চুরির অন্ধিসন্ধি ওই ঠিক করে। রিকোভেত্তি গাড়ী চালিয়ে ঠিক জায়গায় অপেক্ষা করে যেখানে মাল গাড়ীতে তোলা হবে।"

"আর চোরাই মাল? জিনিষগুলি তিনভাগে ভাগ হয়ে যায়?"

"সম্ভবত! মজাটা হলো উদ্ধার করা চোরাই মালগুলি হচ্ছে নিকৃষ্ট মূল্যের। মনে হয় দামী এবং সুন্দর জিনিসগুলি খুব তাড়াতাড়ি বিদেশে পাচার হয়ে যায়।"

"তৃতীয় জনের খবরটা কী? ঐ কেসী? তাকে কী কখনো আইনের সম্মুখীন করেননি?"

"আপনার অনুমান মতো কাঠগড়ায় তাকে তোলা যায় নি। বয়েসে সে ছোকরা মোটেই নয়। মাংসপেশীও তার শক্ত হয়ে এসেছে। দু-সপ্তাহ পরে একটা বাড়ীর পাচতলা থেকে পড়ে যায় আর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু এসে গ্রাস করে তাকে।"

"ব্যাপারটা কোথায় ঘটলো?"

"প্যারীতে! কোটিপতি ব্যাংকের মহাজন দিবোগলিয়ের বাড়ীতে চুরি করতে গিয়েছিলো সে।"

"তারপর থেকে বোধহয় আর কাপটাকে দেখা যায় নি ?"

"ঠিক তাই।"

"বিক্রীর জন্যও এটাকে আর তোলা হয়নি ?"

"আমি দৃঢ় নিশ্চত! না এটাকে তোলা হয় নি। আমার বলা উচিৎ শুধু পুলিশরাই নয় বেসরকারী গোয়েন্দারাও এর পেছনে লেগে আছে।"

"আচ্ছা আপনি এই পাণপাত্রটা কেনার জন্য যে টাকাটা দিয়েছিলেন তার কী হলো ?"

"মারচেস ভদ্রলোক—ব্যবসার ব্যাপারে খুবই সৎ। টাকাটা ফেরৎ দিতে চেয়েছিলেন যেহেতু কাপটা তারই বাড়ী থেকে চুরি যায়।"

"কিন্তু আপনি টাকাটা ফেরৎ নেননি ?"

"না।"

"কিন্তু কেন ?"

"সত্যি কথা বলতে ব্যাপারটা যাতে আমার হাতে থাকে তারই ব্যবস্থা করতে।"

"আপনি বলতে চান বোধহয় কাপটা উদ্ধার হলে মারচেসের সম্পত্তি বলে গণ্য হতো। কিন্তু এখনও এটা আপনার।"

"বা! সুন্দর।"

পোয়ারো আবার জিজ্ঞাসা রাখলেন, "আচ্ছা, সত্যি করে বলুন তো আপনি ঠিক কী চাইছিলন এই ব্যবহারের পেছনে ?"

হাসলেন এমেরি পাওয়ার, "ব্যাপারটা দেখছি আপনারও মনে লেগেছে। ভালো। খুবই সহজ এটা পোয়ারো সাহেব। মালটা যে কার কাছে আছে সেটা মনে করুন আমি বুঝতে পেরেছিলাম।"

"বা! খুবই মজার তো। মহাশয়টি কে ?"

"স্যর রুবেন রোসেনথলি, সে কেবল আমার সহযোগী—মহাজন নয় আমার ব্যক্তিগত শত্রুর ও বটে। অনেক লেনদেনে আমার প্রতিযোগী। কিন্তু মোটামুটি ভাবে কোনোবারই সে আমার সংগে এঁটে উঠতে পারেনি। বোরজিয়ার ঐ কাপটার বেলায় শত্রুতা তুংগে ওঠে। দুজনেই এটা পাবার জন্য পাগল হলাম। ব্যক্তিগত সম্মানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো শেষমেষ। আমার লাগানো দালালেরা একে-একে দাম চড়ালো।

"এবং আপনার দালালের চরম দামই সম্পত্তিটা আপনাকে পাইয়ে দিলো ?"

"ঠিক তা নয়। আমি দ্বিতীয় একজন এজেন্টের সাহায্য নিয়েছিলাম। প্যারীর এক সংযোগীর প্রতিনিধি। আমরা দুজনে কেউ কাউকে দাম ছাড়তে রাজী নই। বুঝে দেখুন ব্যাপারটা। যদি তৃতীয় কোনো লোক নেয় সে-ও স্বীকার। পরে তৃতীয় লোকটার সংগে ভুজুং-ভাজুং করার যা ওয়াস্তা?"—

"আসল কথাটা বলুন না মশাই। ছোট্ট করে একটু ঠকানো।"

"সে আর বলতে।"

"তাই ঘটলো। এবং কিছুকালের মধ্যেই স্যর রুবেন বুঝলেন কীভাবে তিনি গ্যাড়াকলে পড়েছেন।' পাওয়ার হাসলেন। পরিতৃপ্ত-ভাবেই হাসলেন।

পোয়ারো বল্লেন,—"ব্যাপারটা এবার পরিষ্কার হলো। আপনি মনে করেন রুবেন হার স্বীকার করবেন না। স্বেচ্ছায় এই চুরির ব্যাপারটা ঘটিয়েছেন?"

"আরে না, না, ব্যাপারটা অতো কাটখোট্টার মতো সহজ-সরল নয়। ব্যাপারটা দাঁড়াতো—কিছু পরেই স্যর রুবেন একটা রেনেসাঁস-যুগের পাণপাত্র কিনতেন—যার ইতিহাস ঠিকমতো পরিষ্কার নয়।"

"পুলিশ-তো অন্ততঃ তার বর্ণনা সকলকে জানাতে পাবে?"

"কিন্তু সেই পাণপাত্র-তো আর সাধারণের কাছে তুলে-ধরা হতো না?"

"আপনি কী বলতে চান পাণপাত্রটা তার কাছে আছে—এই আনন্দেই তিনি ডগমগ থাকতেন?"

"ঠিক তাই। উপরন্তু আমি যদি মাবচেসের প্রস্তাব মেনে নিতাম, তাহলে গোপনে কোনো চুক্তি করা রুবেনের পক্ষে সম্ভব হতো পরের দিকে। ফলে আইনানুগ ভাবেই পাণপাত্র তার কব্জায় আসতো।"

কিছুটা সময় তিনি বিরতি দিলেন। তারপর বল্লেন একসময়, "কিন্তু যেহেতু পাণপাত্রের আইনমাফিক মালিক আমি সেইহেতু সম্পত্তি উদ্ধারের তুরুপের তাস আমার হাতে।"

"আপনি বলতে চান" সরাসরিই বল্লেন পোয়ারো। "স্যর রুবেনের ওখান থেকে আপনি আবার ওটা চুরি করাতেও পারতেন?"

"না চুরি করা নয় পোয়ারো সাহেব। আমি শুধু আমার সম্পত্তি উদ্ধার করছি মাত্র।"

"কিন্তু যতোদূর জানি ও ব্যাপারে আপনি খুব একটা সুবিধে করতে পারেন নি।"

"তার কারণটাও সুন্দর। বোসেনথালির তাঁবে কাপটা কোনো দিনই হারায়নি।"

"জানলেন কী করে ?"

"কিছুদিন হলো সব তেল-ব্যবসায়ী হাত মিলিয়েছে। বোসেনথলি আর আমার ধান্দা এখন একই। বন্ধু আমরা এখন শত্তুর নই। তাকে খোলাখুলি বলতে সংগে-সংগেই বল্লো কোনোদিন কাপটা তার কাছে ছিলো না।"

"আপনি তাকে বিশ্বাস করলেন ?"

"হ্যাঁ।"

চিন্তা করতে করতেই বল্লেন পোয়ারো একসময়—"তাহলে লোকে যা বলে, দশ বছরের বাক্সে তাসে আপনি বাজী ধরেছেন ?"

কিছুটা তিক্ততা নিয়ে মহাজন মশাই বল্লেন,—হ্যাঁ, ঠিক তাই যা আপনি বলছেন।"

"আবার ফের-ফিত্তি শুরু করতে হবে ?"

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন অমরজন,—

"এর জন্য আমাকে লেলিয়ে দেওয়া। কিন্তু খুব পুরণো গন্ধ—যে গন্ধ ধরে আমি ছুটবো, সে গন্ধের যে আর কিছুই নেই"

শুকনো ভাবে এমেরি পাওযার বল্লেন,—"ব্যাপারটা যদি সহজ-সরল হতো তবে আর আপনাকে ডাকবো কেন ? অবশ্য আপনি যদি অপারগ হন—"

তিনি তাঁর উপযুক্ত কথাই বলেছেন। সোজা হয়ে বসলেন এরিকুল পোয়ারো। ঠাণ্ডাভাবে বল্লেন—"অসম্ভব কথাটা আমি মানিনা মশাই! আমি সবসময় নিজেকে শুধাই— কেসটা কী তোমাকে অনুপ্রাণিত করছে ?"

হাসলেন আবার এমেরি পাওয়ার। বল্লেন,—"অনুপ্রাণিত নিশ্চয়ই করবে। আপনার ফী-টা কতো ?"

ছোট্ট মানুষটা বড় মানুষটার দিকে তাকালেন। নরম গলায় বল্লেন,—"এই শিল্পের ব্যাপারটা, এটা কী আপনি বিরাট কিছু মনে করেন ? নিশ্চয়ই নয় !" এমেরি পাওয়ার উত্তর দিলেন,— "কথাটা ঘুরিয়ে বলুন-না কেন ? আপনিও আমার মতো হার স্বীকার করতে চান না।"

এরিকুল পোয়ারো মাথা ঝাঁকিয়ে অভিবাদন জানালেন। বল্লেন,—"হ্যাঁ ঐ ভাবেই বলুন—আমিও হার স্বীকার করতে চাই না।"

ইনেসপেক্টর ওরাগষ্ট্যাফ আগ্রহ দেখালেন. "সেই ডেরাট্রিনো কাপ ? হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমার মনে আছে। মামলা তখন আমার হাতেই ছিলো। কিছুটা ইটালী ভাষা জানা থাকায় ম্যাকারোনিসের সংগে আলাপ আলোচনা

চালাই। সেদিন যে জায়গায় ছিলাম আজো ঠিক সেই জায়গায় পড়ে আছি। খুবই মজার ব্যাপার বটে।"

"কী মনে হয় আপনার? গোপনে বিক্রি-টিক্রী?"

ওয়াগষ্ট্যাফ মাথা ঝাঁকালেন—"সন্দেহ আছে। হলেও হতে পারে। না, আমার ব্যাখ্যা আরো সহজ সরল। দল ধরা পড়লো। কিন্তু যে জানতো মালটা কোথায় সরানো হয়েছে—সেই মারা পড়লো।"

"আপনি কী কেসীর কথ বলছেন?"

"হ্যাঁ সে মালটা ইটালীতে কোথায় সরিয়ে রেখেছে। অথবা এ-ও হতে পারে সে মালটা দেশের বাইরে পাচার করে দিয়েছে। কিন্তু সে যেখানেই মালটা লুকিয়ে রাখুক—সেটা সেখানেই আছে"

এরিকুল পোয়ারোর কথায় একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো,—"খুব রোমাঞ্চকর কল্পনা। প্লাষ্টারের জিনিস লুকানো মুক্তা,—কী যেন গল্পটা—সেই নেপোলিয়নের মূর্তিটা? কিন্তু এখানে মণি মুক্তার কোনো ব্যাপার নেই। এখানে ব্যাপারটা হলো শক্ত সোনার একটা কাপ। জিনিষটা লুকানো মোটেই সহজ নয়। ব্যাপারটা মনে রাখবেন।

ওয়াগষ্ট্যাফ্ শূন্যমনে উত্তর দিলেন,—ওরে বাবা, তাতো জানতাম না। হ্যাঁ, এ-ও লুকানো যায়। কাঠের পাটাতনের নিচে বা ঐজাতীয় কিছু।

"আচ্ছা কেসীর কী নিজের কোনো বাড়ী আছে?"

"হ্যাঁ, আছে লিভারপুলে।" হাসলেন তিনি, "না, সেই কাঠের পাটাতনের নীচে ওটা নেই। আমরা বেশ নিশ্চিত।"

"ওর পরিবারের আর সবের খবর কী?

"ওর স্ত্রী সুন্দরী ভদ্রমহিলা। যক্ষ্মা রুগী। স্বামীর স্বভাব চরিত্রে একেবারে মরমে মরমে মরে থাকতেন। ধার্মিক—ভগবানের পায়ে উৎসর্গীকৃত প্রাণ, ক্যাথলিক। কিন্তু মনস্থির করতে পারেননি স্বামীকে ত্যাগ করবেন কী না। কয়েক বছর আগে মারা যান ভদ্রমহিলা। মার পথে চলেন তাদের মেয়ে—গীর্জার যাজিকা হন এক সময়। ছেলে একেবারে ভিন্ন চরিত্রের। বাপকা ব্যাটা। আমার শেষ সংবাদ বলছে সে এখন আমেরিকায় করে কর্মে খাচ্ছে।"

এরিকুল পোয়ারো তাঁর ছোট্ট নোট বইয়ে লিখে চল্লেন "আমেরিকা।" বল্লেন, "আচ্ছা কেসীর ছেলের পক্ষে লুকানো জায়গাটা জানা সম্ভব?"

"মনে হয় না।"···

"কাপটার সোনা তো গলিয়ে ফেলা হতে পারে।"

"হতেও পারে। হ্যা, সম্ভব আমি বলবো। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না— সংগ্রাহকদের কাছে এর চরম মূল্য বা উৎকর্ষতা—এবং যা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয় সংগ্রাহকদের মাঝে, কী যে হয় আপনি ভাবলে অবাক হবেন। মনে হয় মালের বেচা-কেনার লোকদের চরিত্র বলে কিছু নেই।"

"আচ্ছা! আপনি কী আশ্চর্য হবেন, যদি দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলি, স্যর রুবেন রোসেনথলি এই মজাদার ব্যাবসায়ে জড়িত আছেন?"

হাসলেন ওয়াগষ্টাফ, "তাঁকে এই ব্যাপারটায় আমি ঠিক জড়াতে চাই না। শিল্পের যেখানে ব্যাপার মানি, সেখানে তিনি বিতর্কিত পুরুষ নন।"

"দলের আর সব চেলা-চামুণ্ডারা?"

"রিকোভেত্তি এবং দিবলার কঠিন সাজা হয়। মনে হয় জেল থেকে তাদের ছাড়া পাবার সময় হয়েছে।

"দিবলা তো ফরাসী তাই নয় কী?"

"হ্যা! দলটার সেই ছিলো মাথা।"

"দলের এদের ছাড়া অন্য কোনো লোক ছিলো কী?

"একটা মেয়ে ছিলো। 'লাল কোট' বলা হতো তাকে। কোনো ভদ্র-মহিলার চাকরাণীর পরিচয়ে বাড়ী ঢুকতো। তারপর মালের সুলুক—সন্ধান তল্লাশ করে দলে চালান করতো তার সংবাদ। দল ভেংগে গেলে সে অষ্ট্রেলিয়ায় কেটে পড়ে।"

"আর কেউ?"

"যুগুর্য়া বলে এক ছে করা এই দলে ছিলো বলে অনুমান করা হয়। ব্যবসায়ী। প্যারীতে তার একটা দোকান ও আছে।...সে বোধহয় নীরব কর্মী। না, তার বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করা যায় নি।"

দীর্ঘশ্বাস ফেল্লেন পোয়ারো। ছোট্ট নোট বইটার দিকে তাকালেন। তাতে লেখা আছে, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ইটালী, ফ্রান্স, তুর্কি। বল্লেন, "দেখছি পৃথিবীকে বেড় দিতে হবে।"

"কী বল্লেন?"

"চিন্তা করছি," বল্লেন এরিকুল পোয়ারো "পৃথিবী পরিভ্রমণটা বোধহয় হবে।"

এরিকুল পোয়ারোর স্বভাব হচ্ছে তার সক্ষম দেখাশোনার করার লোক জর্জের সংগে কেসের বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করা। আরো খুলে বলতে গেলে বলতে হয়, কতোগুলি ব্যাপার এরিকুল পোয়ারো ছেড়ে দেন জর্জের ওপর।

আর জর্জও পার্থিবজ্ঞান—যে জ্ঞানটা সে ভদ্রলোকের ভদ্রলোক সংগী হিসেবে আয়ত্ত করেছে, সেই জ্ঞান দিয়ে সেই ব্যাপার গুলির সমাধান করে দেয়।

"মনে করো" পোয়ারো এক সময় বল্লেন, "পৃথিবীর বিভিন্ন পাঁচটি জায়গায় তোমাকে অনুসন্ধানে যেতে হবে। কী ভাবে তুমি আরম্ভ করবে?"

"আপনি কী সেই বাইসেকেলের ছোকরাটার কথা বলছেন?"

"অথবা" এরিকুল পোয়ারো বলে চলেন, "সে কী করতো? উত্তরটা হলো সে উৎসাহ নিয়ে কাজ করতো। কিন্তু শেষমেষ তাকে সংবাদ সংগ্রহ করতেই হতো—যে রকম লোকে বলে প্রমেথিয়াস—যা নাকী নেরিয়াসের থেকে অন্য।"

"সত্যি-ই স্যর?" জর্জ বল্লো, "ঐ দু-জন ভদ্রলোকের কারোর নামই আমি শুনিনি। ওরা কী ভ্রমণ সহায়ক?"

এরিকুল পোয়ারো নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই চমৎকৃত হয়ে বলে চল্লেন, "আমার মহাজন এমেরি পাওয়ার কেবল একটা জিনিষই বোঝোন-কাজ। অহেতুক কাজে উৎসাহ নষ্ট করে ফয়দাটা কী? জর্জ জীবনের বেলায় স্বর্ণাক্ষরে একটা নিয়ম লেখা আছে—যে কাজটা অপরে তোমার জন্য করতে পারে—সেটা তুমি নিজে করতে যেয়োনা।

"বিশেষত" জায়গা ছেড়ে বইয়ের সেলফের কাছে এগিয়ে আরো বল্লেন, "সেখানে খরচটা কোনো ব্যাপারই নয়।"

সেল্‌ফের থেকে ডি নামাঙ্কিত ফাইলটা তুলে নিলেন। ফাইলটা খুল্লেন যেখানে "নির্ভরযোগ্য রহস্য সন্ধানকারীদের সাহায্যকারী" লেখা আছে।

"আধুনিক প্রমেথিয়াস" গুঞ্জরণ তুল্লেন ভদ্রলোক, "এতো সুন্দর যে, বুঝলে জর্জ, আমার জন্য খুঁজে পেতে কতোগুলি নাম আর ঠিকানা লিখে রেখেছে। মেসার্স হেংকারটন নিউইয়ক, মেসার্স লেভান ও বোসার, সিডনী, সিনর জিওভান্নি মেজী, রোম, মঁসিয়ে নাউঁ, ষ্টামবুল, মেসার্স রোজে এ ফাঁকোয়া প্যারী।"

দম নিলেন ভদ্রলেক ততক্ষণে জর্জ পোঁ ধরলো। পোয়ারো বল্লেন এক-সময়, "এখন দয়া করে তুমি দেখো তো লিভারপুলের গাড়ী কখন ছাড়ছে।"

"তাহলে বাবু, আপনি লিভারপুলে যাচ্ছেন?"

"হ্যা তাই তো মনে হচ্ছে। বুঝলে জর্জ হয়তো আমাকে আরো দূরে যেতে হবে। ভরসা হচ্ছে এখনই যেতে হচ্ছে না।"

তিন মাস পরে। এরিকুল পোয়ারো একটা পাথরের কিনারায় দাঁড়িয়ে এটলান্টিক মহাসাগর দেখছিলেন। সুতীক্ষ্ণ করুণ শব্দ করে সমুদ্রপাখী গাল

গুলি জলের উপর তেড়ে এসে ছোঁ মারছে। শান্ত ভাবে জলীয় বাতাস বয়ে যাচ্ছে।

ইনিস্‌গোওল্যানে যারা প্রথম আসে তাদের সকলের মতোই এরিকুল পোয়ারোর মনোভাব—সে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে। জীবনে আর কখনো সে এমন একাকী, নির্জন, আর পরিত্যক্ত অবস্থা কল্পনা করেনি। এর সৌন্দর্য হলো বিষাদ, অপার্থিব একাকীত্ব আর অবিশ্বাস্য অতীত মিশিয়ে। এই আয়ারল্যাণ্ডের পশ্চিমে রোমনেরা কখনো আগে বাড়ো, আগে বাড়ো আরো আগে বাড়ো বলে এগিয়ে যায় নি। এখানে কখনো তারা দুর্গ-ও গেড়ে বসেনি। তারা কখনো সুশৃঙ্খলিত প্রয়োজনীয় মসৃণ রাস্তার পত্তন করেনি। এই 'কেসে' সাধারণ জ্ঞান আর জীবনের সুশৃঙ্খলিত আইন কানুন অজ্ঞাত।

এরিকুল পোয়ারো তার পেটেন্ট চামড়ার বুট জুতোর আগার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেল্লেন। নিজেকে বড় একাকী আর নিঃস্ব বোধ হলো তাঁর। যে জীবন-যাত্রার মানের সংগে তিনি অভ্যস্ত তার বড় অভাব এখানে।

চোখ-জোড়া তাঁর নির্জন সমুদ্র সৈকতের সীমারেখায় আনাগোনা করলো। আবার সমুদ্রে গিয়ে তা থামলো এক সময়। ওখানেই বোধহয় কোথায় হবে—শ্রেষ্ঠ দ্বীপ আর যুবকদের বাসভূমি।

তাঁর মন গুঞ্জরণ তোলে—আপেল গাছ, গান আর সোনা। হঠাৎ-ই এরিকুল পোয়ারো নিজেকে ফিরে পেলেন। ভাবালুতা কাটে তার। পেটেন্ট চামড়ার বুট জুতো আর ভদ্রজনচিত এক প্রস্থ কাপড়ের স্যুট কোটে ছন্দময় হয়ে উঠলেন তিনি। ধারে কাছে কোথাও গীর্জার ঘন্টা-ধ্বনি শুনলেন। ঘন্টার ভাষা তিনি বুঝলেন। ছোটো বেলা থেকেই তিনি ঘন্টাধ্বনির সংগে অভ্যস্ত।

ধীরগতিতে চূড়ার বন্ধুর পথ ধরলেন। দশ মিনিটের মধ্যে চূড়ার ওপর বাড়ীটা তার চোখে পড়লো। একটা উঁচু প্রাচীর বাড়ীটাকে ঘিরে আর প্রাচীরের মধ্যে বিরাট এক কাঠের দরজা। দরজাটার মধ্যে গজাল গাঁথা। এরিকুল পোয়ারো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চেন নাড়া দিলেন। ভিতরের লোক ডাকার জন্য লোহার বিরাট একটা যন্ত্র। মরচে-ধরা একটা চেনে টান দিলেন তিনি সাবধান হয়ে। দ্রুত আর তীক্ষ্ণ একটা ছোটো ঘন্টা নীচু পর্দায় দরজার ভেতরে বেজে চল্লো।

ঠেলায় খুলে গেলো দরজার একটা অংশ আর প্রকাশ পেলো এক মুখ। সংশয় কুটিল, শস্যদানার মতো একটা ফরসা মুখ। ওপরের ঠোঁটে স্পষ্ট গোঁফের

রেখা। কিন্তু কণ্ঠস্বর মেয়ের। এই কণ্ঠস্বরের মালিকদের এরিকুল পোয়ারো বলেন জাঁদরেল মহিলা। কাজটা কী জানতে চাইলেন।

"এটাই কী" সেণ্ট মেরী এণ্ড অল এনজেলের কনভেণ্ট? জাঁদরেল মহিলা কিছুটা ঝাঁঝ দিয়ে বল্লেন,—"এ ছাড়া আর কী হতে পারে?"

এরিকুল পোয়ারো উত্তর দেবার চেষ্টাও করলেন না। বল্লেন তিনি···, "আমি মাতাজীর সাক্ষাৎপ্রার্থী।"

প্রথমে উত্তর দেবার চেষ্টা করলেন না জাঁদরেল মহিলা। পরে হাল ছেড়ে ছিলেন। হুড়কো তোলা হলো, দরজা এখন খোলা। এরিকুল পোয়ারোকে একটা খোলা মেলা ছোটো ঘরে নিয়ে এলেন তিনি। কনভেন্টের দর্শন প্রার্থীদের এই ঘরেই বসানো হয়।

জন্ম সূত্রে এরিকুল পোয়ারো ক্যাথলিক ধর্মী। যে ঘরটায় তিনি বসে আছেন তার আবহাওয়া তিনি ভালোই উপলব্ধি করলেন, "মাজী আপনাকে বিরক্ত করার জন্য মাপ চেয়ে নিচ্ছি, বল্লেন তিনি, "পার্থিব জগতে কেউ কেসী নামে পরিচিত একজন ধর্মপ্রাণ এখানে আছেন?"

মাথা ঝাঁকালেন মাতাজী। বল্লেন,—"হ্যাঁ-ভাই। ভগ্নী মেরী আরসুলা-নামে তিনি ধর্মীয়-জীবনে পরিচিত ছিলেন।"

বলে চল্লেন এরিকুল পোয়ারো, "কোনো একটা ব্যাপারের ভুল-সংশোধন করা দরকার আমার মনে হয়। মনে হয় ভগ্নী-মেরী আরসুলা আমাকে সাহায্য করতে পারেন। তাঁর কাছে যে সংবাদ আছে তা অমূল্য।"

মাথা নাড়লেন মাতাজী। মুখে নেই চাঞ্চল্য। কণ্ঠস্বর ঠাণ্ডা আর সংযত। বল্লেন তিনি,—"ভগ্নী মেরী আরসুলা আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন না।"

"আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি—"

চুপকরে গেলেন পোয়ারো। বল্লেন মাতাজী, "দু-মাস আগে ভগ্নী মেরী আরসুলা মারা গেছেন।"

জিম্মী ডোনোভানের হোটেলের মধ্যকার বারের দেওয়ালের কাছে অস্বচ্ছন্দের সংগে বসলেন এরিকুল পোয়ারো। হোটেল বলতে তাঁর যে ধারণা ছিলো তার সংগে কোনো মিল নেই এই হোটেলটার। বিছানার খাট ভাংগা, জানলার শার্সী দুটোরও সেই অবস্থা। রাত্রিবেলায় ঐ শার্সির ফাঁক দিয়ে হাওয়া ঢুকে তাঁকে বেশ বিরক্ত করেছে। গরম জল বলে যা দেওয়া হয়েছিলো তা হচ্ছে কুম কুম গরম। খাবার খাওয়ার পর থেকেই তার পেটের ভেতর ভুটভাট শব্দ আর কষ্টের উৎপত্তি।

ঘরের মধ্যে পাঁচজন লোক ছিলো। এবং তারা সকলেই রাজনীতির রাজা-উজির মারছে। তারা যে কী বলছে—অনেকক্ষণ এরিকুল তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলেন না। সে য-হোক, তিনি ওসব কিছু গ্রাহ্যই করলেন না।

চোখ ফেরাতেই দেখলেন একজন লোক তাঁর পাশে বসে আছে। অন্য লোকগুলির থেকে সে যেন স্বতন্ত্র। তার মধ্যে যেন কিছুটা শহুরে ভাব রয়েছে।

প্রচুর গাম্ভীর্য নিয়ে সে বল্লে—"আমি আপনাকে বলছি মশাই, আপনি দেখে নেবেন, পিজিন প্রাইজের কোনো আশা নেই। একদম কোনো আশা নেই।······দৌড়ের শুরুতেই হিক্কা তুলবে। একেবারে গোড়াতেই আমি যে সুতো ছাড়লাম সকলেরই সেটা নেওয়া উচিৎ। আপনি, আপনি জানেন আমি লোকটা কে? এটলাস্, আমি হচ্ছি সেই এটলাস্, ডাবলিণ মানের। সারাটা মরশুমই ভয়ীদের তাক দিয়ে বেড়াই। লারীর ঘুড়ীটার কথা আমিই কী বলিনি কো? পচিশের বিরুদ্ধে এক-একেবারে পাঁচশের বিরুদ্ধে একবাজী। এটলাসের বান্ডী ধরুন আপনাকে হারায় কে, বোয়েকা?"

এরিকুল পোয়ারো অদ্ভুৎ এক শ্রদ্ধা-মেশানো ভাব নিয়ে তাকে দেখলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর কেঁপে গেলো বিড়-বিড় করতে,—"হে ভগবান, এ-যে অদ্ভুত যোগাযোগ।"

কয়েক ঘণ্টা পরের ব্যাপার। চাঁদটা মাঝে মাঝে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি-ঝুঁকি মেরে দুষ্টামি করছে! বেশ কয়েক মাইল পোয়ারো এবং তাঁর নতুন বন্ধু হেঁটে এসেছে। খোঁড়াচ্ছে পোয়ারো। মনে পড়লো তাঁর পৃথিবীতে আরো অন্য ধরণের জুতোর কথা। সেগুলি পেটেন্ট চামড়ার জুতোর চেয়ে গ্রাম্য পরিবেশে হাঁটার পক্ষে বেশ মজবুত। জর্জ-ও সসম্মানে এ-কথাই মনে করিয়ে দিয়েছিলো। "সুন্দর একজোড়া বরগি" এই কথাই জর্জ বলছিলো।

এরিকুল পোয়ারো কিন্তু তা পাত্তা দেয়নি। তাঁর পা-জোড়া সুন্দর আর সুসভ্য দেখাক এই তিনি চেয়েছিলেন। কিন্তু এখন এই পাথুরে জমিতে হাঁটতে-হাঁটতে তিনি বুঝতে পারলেন পৃথিবীতে আরো অন্য ধরণের জুতো আছে।

হঠাৎ তার সংগী বলে উঠলো। "দেখুন এর জন্য পুরোহিতগুলি-তো আমার পিছু ধাওয়া করবে না? আমি কিন্তু আমার বিবেকের ওপর কোনো নোংরা দাগ ফেলতে চাইনিকো।"

বল্লেন এরিকুল পোয়ারো, "তুমি কেবল সীজারের জিনিষ সীজারকে ফিরিয়ে দিচ্ছো।"

তাঁরা কনভেন্টের দেওয়ালের কাছটায় এসে পড়লেন। এটলাস তার কাজ করার জন্য তৈরী। করুণ একটা শব্দ বেরিয়ে এলো তার কাছ থেকে যখন সে চিৎকার করতে চাইলো যে, সে শেষ হয়ে গেছে একদম। কর্তৃত্বের সংগে এরিকুল পোয়ারো হুকুমজারী করলেন, "গোলমাল নয় একটুও। তোমার মাথার ওপর আকাশ ভেংগে পড়েনি। তুমি কেবল এরিকুল পোয়ারোর ওজনটাই মাথায় ধরে রেখেছো!"

দুটো কড়কড়ে পাঁচ পাউণ্ডের নোট হাত-বদল করে আশাব্যঞ্জকস্বরে এটলাস বল্লে,—"মনে হয় ভুলে যেতে পারবো আজ সকালে এই টাকাটা কীভাবে পকেটস্থ করলাম। শুধু ভয় হচ্ছে পাদরী-বাবা এরেলী আমার পেছু না ধাওয়া করে।"

"বেমালুম ভুলে যাও বন্ধু! কালকের দিনটাই তোমার।"

বিড়বিড় করলো এটলাস নিজের মনে. "কিন্তু আমি ব্যাটা কোন্ ঘোড়াটার পেছু বাজী ধরি? হ্যাঁ, ওয়াকং ল্যাড বলে ঘোড়াটা সত্যি ভালো। ভারী চমৎকার, সুন্দর! অবশ্য শীলা-বয়ওনও আছে। সাতের বিরুদ্ধে এক ওর ওপর বাজী ফেলা যায়।" থামলো সে একসময়।

"আচ্ছা আমি কী ভুল শুনলাম না আমি সত্যি শুনেছি আপনি হারকিউলিস্ বলে এক হিদেন দেবতার নাম করলেন? হারকিউলিসের কথাই আপনি বলেছিলেন। বাড় বাড়ন্ত হোক সেই দেবতার। কালকে হারকিউলিস্ বলে সত্যি একটা ঘোড়া দৌড়াচ্ছে। তার পেছু বাজী হলো তিন-তেত্রিশ।"

"বন্ধু" বল্লেন এরিকুল পোয়ারো, "তুমি তোমার টাকা ঐ ঘোড়াটার পিছনে ঢালো। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, হারকিউলিস তোমায় নিরাশ করবে না।"

সত্যিই তাই ঘটলো। পরের দিন শ্রীরসানের হারকিউলিস্ ঘোড়া অপ্রত্যাশিতভাবে বায়ওন বাজী মেরে দিলো। প্রথমে তার দাম উঠেছিলো ৬০ এর বিরুদ্ধে এক।

দক্ষতার সংগে এরিকুল পোয়ারো সুন্দর প্যাকেটটা খুল্লেন। পরপর বাদামী ......একদম শেষে টিস্যু কাগজ।

এমেরী পাওয়ারের সামনে টেবিলের ওপর উজ্জল সোনার কাপটা রাখলেন। কাপটার গায়ে বেড় দিয়ে একটা গাছ যার থেকে ঝুলছে সবুজ পান্নার আপেল।

মহাজন মশাই একটা বিরাট শ্বাস টানলেন। বল্লেন একসময়, অভিনন্দন জানাচ্ছি পোয়ারো সাহেব।"

মাথা নোয়ালেন পোয়ারো। হাত বাড়িয়ে দিলেন এমেরি পাওয়ার। কাপটার কানায় নিজের একটা আংগুল বুলিয়ে বল্লেন গাঢ়স্বরে,—"আমারই এটা।"

রাজী হলেন এরিকুল পোয়ারো, "হ্যাঁ আপনারই।" পাওয়ার ব্যবসায়ী স্খলভকণ্ঠে বল্লেন, "কোথায় পেলেন এটা?"

অরিকুল পোয়ারো বল্লেন, "কোনো একটা বেদীর ওপর এটা পেয়েছি।"

"কেসীর মেয়ে হলো সন্ন্যাসিনী।····· লিভারপুলে তাঁর বাবার বাড়ীতেই কাপটা লুকানো ছিলো। মনে হয় কাপটা সে কনভেন্টে নিয়ে গিয়েছিলো তার বাপের পাপমুক্তির জন্য। সে চেয়েছিলো ভগবানের সেবায়ই এটা উৎসর্গীকৃত হোক, আমার মনে হয়না অন্যান্য পাদরীরা এর মূল্য বুঝেছিলো।··· বল্লেন এমেরি পাওয়ার, "অসাধারণ কাহিনী। আচ্ছা আপনার মাথায় ওই জায়গায় যাবার ব্যাপারটা ঢুকলো কী করে?"

কাঁধ ঝাঁকালেন পোয়ারো, "বোধহয় বাদ দিয়ে অংক কষার পরিকল্পনা থেকে। তারপর এলো ঐ অদ্ভুৎ ব্যাপারটা,—কাপটা কেউ পাচার করার কথা শোনেনি। ওতেই আমার মনে হলো, বুঝলেন! যে জিনিষটা এমন কোনো জায়গায় আছে—যার কাছে পার্থিব মূল্য অর্থহীন। মনে এলো প্যাট্রিক কেসীর মেয়ে হচ্ছে সন্ন্যাসিনী।

······পরিতৃপ্তির সংগে বল্লেন এমেরি, "বলুন আপনার ফী-টা কত? আমি চেকে লিখে দিচ্ছি।"

বল্লেন এরিকুল পোয়ারো, "আমার কোনো ফী নেই।"

"কী বলতে চান আপনি?"

"বাচ্চা বয়সে কখনো পরীদের গল্পো পড়েছেন? ঐসব গল্পে আছে, রাজা বলতো, "বলো তোমার কী বর চাই?"

"তাই বলুন আপনি আমার কাছে কিছু চান?"

"হ্যাঁ, কিন্তু টাকা নয়। শুধু একটা অনুরোধ।"

"বলুন সেটা কী? ব্যবসা-ব্যাপারে কোনো সাহায্য······"

"ওটা ঘুরিয়ে টাকা চাওয়ারই সামিল। আমার অনুরোধ ওর থেকেও অকিঞ্চিৎকর।"

"জিনিষটা কী?"

এরিকুল পোয়ারো তাঁর হাত কাপটার ওপর রাখলেন, "এটাকে কনভেণ্টে ফিরিয়ে দিন।"

কনভেণ্টের সেই ছোটো ঘরটায় মাতাজাকে সম্পূর্ণ গল্পটা বলে কাপটা ফিরিয়ে দিলেন পোয়ারো।

বিড়বিড় করে বল্লেন মাতাজী, "আমাদের ধন্যবাদ তাঁকে জানাবেন আর আমরা তাঁর মংগলের জন্য অবশ্য প্রার্থনাও করবো।"

শান্তভাবে কথা রাখলেন এরিকুল পোয়ারো, "ভদ্রলোকের আপনাদের প্রার্থনার দরকার আছে।"

"তাহলে কী তিনি অসুখী?"

উত্তর দিলেন পোয়ারো "এতই অসুখী যে সুখ জিনিষটা যে কী তা তিনি ভুলে গেছেন। এতোই অসুখী যে তাঁর বোধগম্যও হয়না তিনি অসুখী।"

সন্ন্যাসিনী সুন্দর আর ছোট্ট করে বল্লেন, "ও একজন ধনী ....."

এরিকুল পোয়ারো কোনো মন্তব্য করলেন না আর। কারণ তার বলার আর কিছুই ছিলো না।

প্রাগৈতিহাসিক মানুষ

ইয়ান ফ্লেমিং

জেমস বণ্ড বলছিলো, "যদি কখনো বিয়ে করি তবে আমি বিমান সহায়িকা-কে আমার জীবন—সাথী হিসেবে বেছে নেবো।"

নৈশ-ভোজ শেষ হয়ে গেছে। রাজ্যপালের পার্শ্বচর অতিথি দুজনকে বিমানে তুলে দিতে চলে গেছেন। জেমস্ বণ্ড ও রাজ্যপাল দুজনেই অভ্যর্থনা ঘরে। সোফায় গা এলিয়ে গল্পে মত্ত। বণ্ড এর ব্যবহারিক কার্য-কলাপ কখনো কখনো বা হাসির খোরাক হয়ে ওঠে। নরম গদী-ওলা সোফায় বসে কখনোই সে আরাম পায় না। বরংচ উঁচু পিটওলা হাতল বিশিষ্ট চেয়ারে মাটিতে পা ঠেকিয়ে ঋজু ভংগীতে বসে আরাম পায়। একটা অবিবাহিত বুড়ো ভামের সংগে ছড়ানো পায়ের মধ্যেকার টেবিলে কফি আর মদের দিকে আঁকু পাঁকু দৃষ্টি মারতে নিজেকে বোকা বোকা মনে হয় তার। অস্বস্তিকর ঘরোয়া

না হলে মেয়েলি মেয়েলি ধরনের পরিবেশ এটা। না, পরিবেশটা কেন জানি না তার রেঠিক মনে হয়।

বণ্ড নসো জায়গাটাই বরদাস্ত করতে পারে না। সকলেই বিরাট বিরাট ধনী। শীতের ভ্রমন বিলাসী আর স্থায়ী বাসিন্দা সকলেরই কথার বিষয়বস্তু হলো টাকা পয়সা রোগ-শোক আর খিদমৎগারের সমস্যা। তারা আবার খোলামনে কথাবার্তা বলে না। অবশ্য গল্প করার আর কী-ই বা আছে। ভ্রমনবিলাসীরা সকলেই বয়স্ক, সুতরাং প্রেমের ঝটঝামেলা তাদের আসতেই পারে না। আর বড়লোকদের যা হয়, পড়শীর নিন্দায় মুখর হতে অত্যন্ত সতর্ক। যে অতিথি দুজন এইমাত্র চলে গেলেন সেই হার্ভে মিলার্স দম্পতি সত্যি অদ্ভুত। ভদ্রলোক ভালো কিন্তু কিছুটা বা বোকা বোকা। ভদ্রলোক প্রথম অবস্থা থেকেই "ন্যাচরাল গ্যাস" এ রয়েছে। এখন কোটিপতি। বৌ-টা সুন্দর কিন্তু সব সময়ই কথায় সাত কাহন। মনে হয় ভদ্রমহিলা জন্ম সূত্রে ইংরেজ। ভদ্রমহিলা বণ্ডের পাশেই বসেছিলেন আর অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিলেন। কথার বিষয়বস্তু হলো শহরে কী কী নাটক দেখেছে আবার জিজ্ঞাসাও করেছে বণ্ডকে, আপনার কী মনে হয় না রাতের খাবার জায়গা হিসেবে "সভয় গ্রিল" সবচেয়ে ভালো। কতো মজাদার মানুষ সে দেখেছে। অভিনেত্রী প্রভৃতি। বণ্ড যতোদূর সম্ভব জোড়াতালি দিয়েছে। মজা হয়েছে বণ্ড দুবছর কোনো থিয়েটার দেখেনি। আর যে-টা-ও বা দেখেছিলো সে-টা আবার ভিয়েনার এক বদমাসকে অনুসরণ করতে গিয়ে দেখা। সুতরাং তাকে পুরনো ধুলোপড়া স্মৃতি শক্তির ওপর নির্ভর করতে হলো। কিন্তু রাতের লণ্ডনের পুরনো দিনের ছবি শ্রীমতী হার্ভে মিলার্সের অভিজ্ঞতার সংগে মিল পেলো না।

বণ্ড জানতো রাজ্যপাল তাকে কর্তব্যের খাতিরে এবং কিছুটা মিলার্স দম্পতিকে সংগদানের জন্য আপ্যায়ন করেছেন। উপনিবেশটায় বণ্ড প্রায় সপ্তাহ খানেক আছে। আগামীকাল সে মিয়ামি-তে ফিরে যাবে। সচরাচর যা হয়। সেই ধরনের অনুসন্ধানের কাজ ছিলো এটা। ধারে কাছের সব দেশগুলি থেকে কিউবার কাস্ত্রোপন্থী বিদ্রোহীদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র যাচ্ছে। অস্ত্রশস্ত্রগুলির প্রধান উৎস হলো মিয়ামি ও মেক্সিকো। কিন্তু সীমান্তরক্ষীরা যখন দু জাহাজ ভর্তি অস্ত্রশস্ত্র ধরে কাস্ত্রোপন্থীরা তাদের কর্মভূমি জামাইকা আর বাহামাতে সরিয়ে নিলো। এখন লণ্ডন থেকে এখানে আসার কারণটাই হলো ওদের কাজের উৎসগুলি গুঁড়িয়ে দেওয়া। কাজটা তার মনঃপূত নয়। সব কিছু বাদ দিয়েও বলা যেতে পারে তার সহানুভূতি কাস্ত্রোপন্থীদের দিকে।

কিন্তু সরকার কিউবার সংগে একটা সর্তে লিপ্ত,—সে কিউবা থেকে বর্তমানে যে পরিমাণ চিনি আমদানি করছে, তার চেয়েও বেশী পরিমাণ চিনি নিজের দেশের জন্য নেবে। হ্যাঁ, এর মধ্যে ছোটো একটা কথা আছে। বৃটেন বিদ্রোহীদের কোনো প্রকার সাহায্য তো দূরে থাক, এমন কোনো কাজ করবে না যাতে কাস্ত্রোপন্থীরা উৎসাহ পায়। বণ্ড একদিন অস্ত্রশস্ত্র ভর্তি দুটো ক্রুজার দেখলো। জাহাজ দুটি চলাকালীন গ্রেপ্তার না করে সে এক অন্ধকার রাতে পুলিশ লঞ্চে চেপে জাহাজ দুটির সম্ভাব্য জায়গায় টাইমবোমা রেখে দিয়ে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে এলো। তারপরই দূর থেকে দেখলো জ্বলন্ত দুই জাহাজের বহ্নিশোভা। জীমনবীমা কোম্পানীর অবশ্যই দুর্ভাগ্য। কিন্তু সৌভাগ্যের কথা হলো কোনো মানুষ মারা যায়নি। বুড়ো 'এম' যা করতে বলেছিলো সেটা সে তাড়াতাড়ি আর পরিচ্ছন্নভাবে সমাধা করে এসেছিলো।

বণ্ড নিশ্চিত ছিলো উপনিবেশের পুলিশ প্রধান আর তাঁর দুই অফিসার ছাড়া ব্যাপারটা বিশেষ কানাকানি হয়নি। বণ্ড শুধুমাত্র লণ্ডনে 'এম'কে তার রিপোর্ট পেশ করেছিলো। বণ্ড এ ব্যাপারে রাজ্যপালকে জড়াতে চায়নি। কারণ তাহলে ভদ্রলোক কিছুটা অস্বস্তি বোধ করবে। এবং কোনো প্রকারে যদি বিধানসভায় পৌছে যায়—তাহলে রাজ্যপাল যে কী অবস্থায় পড়বে সেটা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু রাজ্যপাল ভদ্রলোক বোকা নন। কেন যে-বণ্ড নসো উপনিবেশে এসেছে, তিনি সেটা জানেন। আর ঐদিন বিকেল বেলা বণ্ড যখন ওনার হাত ঝাঁকাঝাঁকি করতে এলো সেটা ফুটে উঠতে দেরী হলো না। একজন শান্তিপ্রিয় মানুষের মারামারির প্রতি অনীহা তাঁর গুটিয়ে নেওয়া ব্যবহারে আর আড়ষ্টতায় স্পষ্ট বোঝা গেলো সেটা নৈশ-ভোজের আয়োজন-এর ফলে কিছুটা বা ব্যাহত হলো। এবং ব্যাপারটা আরো নীরস হয়ে দাড়াতো যদি না প্রাণবন্ত রাজ্যপাল-পত্নী নিজের প্রাণচ্ছল আর বকবকানির মধ্যে নিজেই আয়োজনটার হাল না ধরতেন।

এখন সাড়ে নটা। রাজ্যপাল আর বণ্ডের কাছে আরো ঘণ্টা-খানেক সময় আছে সেটা নিশ্চিন্ত ঘুমের আগে গল্প গুজবে কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে। দুজনেই ভাবছে, যাক্ ও ব্যাটার দ্বিতীয়বার আর মুখ দর্শন করতে হবে না। না, বণ্ডের রাজ্যপালের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। রাজ্যপাল ভদ্রলোক গতানুগতিক একজন। যাদের পৃথিবীটকে একবার বেড় দিয়ে ঘুরলে অনেক দেখা যায়। ভদ্রলোক কর্মক্ষম, বিনীত, ন্যায়নিষ্ঠ, আনুগত্য এবং বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন। উপনিবেশ সংক্রান্ত সরকারী কাজের প্রথম সারির লোক

এরা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তাঁর চারপাশে ভেংগে পড়া সত্ত্বেও ত্রিশ বছর ধরে তাঁর কাজ ঠিক ঠিক আগের বলা গুণগুলির মাধ্যমে করে যাচ্ছিলেন। আর এখন চাকরির সর্পদংশনগুলি এড়িয়ে উন্নতির সিঁড়ি চেপে একদম ওপরে গেছেন। বছর দুয়েকের মধ্যে সরকারী নাইট খেতাব নিয়ে তিনি অবসর নেবেন—হয় গোডালমং নয় চেলটেনহ্যাম অথবা টার্নব্রিজওয়েলস্-এ। সংগে থাকবে সরকারী মাসিক ভাতা আর কিছু স্মৃতির বোঝা যেগুলি তিনি স্থানীয় গলফ্ ক্লাবের মানুষগুলিকে শোনাবেন। ট্রাসিয়াল ওমান, লিওয়ার্ড দ্বীপ, ব্রিটীশ গায়নার-মানুষগুলি হয় শোনেনি না হয় পাত্তাই দেবে না। আর আজ এই বিকেলে বণ্ড ভাবলো এরকম কাস্ত্রোপন্থী বিদ্রোহী ঘটনার কতো এ্যাংক নাটক ভদ্রলোক যে দেখেছেন যা গোপনে শুনেছেন তার ইয়ত্তা নেই।···

বণ্ডের খাপছাড়া মন্তব্য,—বিয়ে করলে বিমান-সহায়িকাকেই করবো —এসেছিলো বিমান ভ্রমণের কথা প্রসংগে। আর সেটা এলো হার্ভে মিলার্স দম্পতি মন্টিলে যাবার জন্য বিমান ধরতে বেরিয়ে যাবার পর পরই। রাজ্যপাল বলছিলেন বি. ও. এ. সি. বিমান সংস্থাই নসোতে বিমান পরিবহন করে মোটা টাকা লুঠছে। যদিও আইডেলওয়াইও সংস্থা থেকে তাদের বিমান আধঘণ্টা যাত্রী পৌছে দিতে দেরী করে। কিন্তু তাদের ব্যবস্থাপনা অতুলনীয়। তার ওপর বণ্ড মন্তব্য ঝাড়লো—তাড়াহুড়ো না করে ধীরে আর আরামে যাবারই সে পক্ষপাতী। এর পরই এলো আগের মন্তব্য মানে বিমান-সহায়িকাকে বিয়ে করার ব্যাপারটা।

"ঠিকই বলেছেন," সংযত আর ঠাণ্ডা ভাবে রাজ্যপাল বল্লেন। হয়তো বণ্ডের প্রার্থনাটার কোনো সময় বদ বদল বা কিছুটা মানবিক হলেও হতে পারে। "কেন?"

"না, কারণটা আমি ঠিক বলতেও পারবো না। ব্যাপারটা কী সুন্দর হবে যদি সবসময় একজন সুন্দরী তন্বী আপনার পায়-পায় ঘুর-ঘুর করে। আপনার জন্ত পানীয়। দরকার মতো গরম খাবার মুখের কাছে তুলে ধরে। আর মাঝে মধ্যেই জিজ্ঞাসা রাখবে প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি ঠিক ঠিক পেয়েছেন কী না। দেখবেন ঐ বিমান সহায়িকাদের হাসি সবসময় মুখে লেগে রয়েছে। ওদের আপ্রাণ চেষ্টা কী করে আপনাকে সুখী করবে। যদি বিমান-সহায়িকা বরাতে না জোটে তবে জাপানী মেয়ে নিশ্চয়ই বিয়ে করা উচিৎ। তাদের আবার ঠিক ঠিক ধারণাও আছে।" মজা হলো বণ্ড এখনই কাউকে বিয়ে করতে যাচ্ছে না। আর বিয়ে যাকে সে করে করুক অবশ্যই মেয়েট একজন, শুষ্ক, কাষ্ঠং

ভিক্টতি অগ্রে' জাতীয় কিছু সেবাদাসী হবে না। শুধুমাত্র আনন্দের অথবা বলা যেতে পারে মানুষের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কোনো ব্যাপারে রাজ্যপালকে গল্প বলতে অনুপ্রাণিত করার জন্য এই আলোচনা।

"জাপানীদের সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না। তবে আপনি বিমান-সহায়িকাদের কাজের মধ্যে দেখে ধারণা করেছেন বোধহয় জীবন-যাত্রাব অন্য জায়গায় ওরা নিশ্চয়ই অন্যরকম হবে না।" রাজ্যপালের স্বর গম্ভীর এবং বিচারকসুলভ।

"সত্যি কথা বলতে কী, বিয়ের ব্যাপারটা আমি খুব গুরুত্ব দিয়ে কিছু ভাবিনি, তাই ঐ বিমান-সহায়িকাদের সম্বন্ধে আমি কোনো তত্ত্ব-তল্লাসও করিনি।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ। রাজ্যপালের চুরুট গেছে নিভে। চুরুটটা জ্বালাতে দু-এক মিনিট সময় কাটলো। রাজ্যপাল ফেরফিত্তি আলোচনা আরম্ভ করলে বণ্ড লক্ষ্য করলো যে তাঁর এখনকার কথাবার্তা সুন্দর ছাঁদ ছাপিয়ে প্রাণরসে ভরে গেছে। "একসময় আমি একজন মানুষকে জানতাম যার ধারণা ঠিক আপনার মতো ছিলো। এক বিমান-সহায়িকার প্রেমে পড়ে তাকে বিয়েও করে।" "বেশ মজার গল্প।" ভদ্রলোক বণ্ডের দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকালেন এবং হাল্কাভাবে হেসে উঠলেন, "আপান জীবনের উজ্জ্বল দিকটা ভালোই দেখেছেন কিন্তু আমার এই গল্পে পাবেন জীবনের অন্ধকার দিকটা। ভালো কথা, আপনি কী সত্যি গল্পটা শুনতে চান?"

"অবশ্যই", গলার স্বরে উৎসাহ দেখালো বণ্ড। জীবনের উজ্জ্বল দিকটা সম্বন্ধে তার এবং রাজ্যপাল মহোদয়ের ধারণা এক হবে কী না ভাবলো সে। অন্তত আলোচনাটা তাদের অন্য কোনো বোকা পাঁঠা জাতীয় তর্ক থেকে বিরত রাখবে। কুড়িয়ে পাওয়া চোদ্দ-আনার মতো এটাই বণ্ডের লাভ —বল্লে সে আর উঠে পড়ে হতভাগ্য বিচ্ছিরি আরামদায়ক সোফা থেকে. "আমি আর একটু ব্রাণ্ডি পেতে পারি?" এক ইঞ্চ মতো ব্রাণ্ডি ঢ্যালা গ্লাসে তারপর সোফায় ফিরে না গিয়ে চেয়ারে বসে পড়লো।

রাজ্যপাল তাঁর চুরুট টা পরীক্ষা করে একটা জোরে টান মারলেন। তারপরই তিনি চুরুট-টাকে সোজাভাবে ধরে রাখলেন যাতে ছাই না তাঁর গায়ে পড়ে। এর পর যতোক্ষণ তাঁর গল্প চললো-চোখ-জোড়া থেকে থেকে ছাইয়ের উপর এসে পড়তে লাগলো। ফলে মনে হলো চুরুট-টার ওপর থেকে যে সরু একটা নীল রেখা উঠছিলো গল্পটা যেন তিনি তাকেই শোনাচ্ছেন।

খুব যত্নের সংগে ভদ্রলোক গল্পটি চালালেন, "এই লোকটা মাষ্টারস্, পুরো নাম ফিলিপ মাষ্টারস্। চাকরীতে সে আমারই সমসাময়িক। হ্যা, আমি তার থেকে এক বছরের বেশী পুরনো। সে 'ফেটস্' থেকে স্কলারশিন্ পেয়ে অক্সফোর্ডে পড়তে এলো। ফেটিসের কোন্ কলেজ থেকে এসেছিলো সেটা অবশ্য খুব একটা ধতর্বের বিষয় নয়। এর পর সে উপনিবেশের চাকরীর জন্য দরখাস্ত করলো। খুব একটা আহামরি গোছের ছাত্র ছিলো না সে। কিন্তু কর্মঠ, পারংগম এবং সেই ধরণের মানুষ ছিলো সে,-যারা নাকী নির্বাচক মণ্ডলীতে একটা ছাপ রাখতে পারে। নির্বাচক মণ্ডলী তাকে নির্বাচন করলো। তার প্রথম কার্মস্থল হলো নাইজেরিয়া। সেখানে খুব ভালো কাজ দেখিয়েছিলো সে। কালা আদমীদের সে পছন্দ করলো এবং তাকেও ওদের মনে ধরলো। এক কথায় বলা যায় মনে প্রাণে সে উদারপন্থী ছিলো। রাজ্যপাল ভদ্রলোক তিক্ত হাসি হাসলেন, "সে ওদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধতে চায়নি। আর সেটা চাইলে সে উপরওলাদের কোপে পড়তো। মোট কথা নাইজেরিয়ার লোকদের ব্যাপারে সে কিছুটা নরম আর মানবিক ছিলো। যাইহোক ব্যাপারটা উপর ওলাদের কিছুটা বা অবাক করে দিয়েছিলো।" রাজ্যপাল থামলেন। চুরুট-টায় টান মারলেন একটা। ছাই পড়ার মতো হ'ল তিনি বেঁকে গিয়ে ট্রে-র ওপর কফির কাপে ছাইটা ফেলে দিলেন।' ভালো হয়ে বসলেন আর এই প্রথম বণ্ডের দিকে তাকালেন। বল্লেন, "বল্লে কিছুটা আশ্চর্য মনে হলেও কথাটা সত্যি যে ও ঐ যুবক বয়সে নাইজেরিয়ার লোকদের যে প্রেম দিয়েছিলো সেটা সাধারণতঃ ঐ বয়সের যুবকদের মেয়েদের দিতে দেখা যায়। দুর্ভাগ্য বশত ফিলিপ মাষ্টার্স লাজুক কিছুটা বা নিজের ভেতর গুটিয়ে থাকা মানুষ। মাত্র সেজন্য ঐ প্রেমের ব্যাপারে সে উৎরোতে পারছিলো না। যখন তার পড়াশোনা থাকতো না—তখন কলেজের হয়ে হকি খেলতো, নৌকো চালাতো। ছুটির সময় থাকতো ওয়েলসে এক মামীর কাছে। পাহাড়-চড়িয়েদের সাথে চড়তো বিভিন্ন পর্বতে। ভালো কথা, তার স্কুলের পড়ার সময়েই বাবা-মার বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে যায়। সে যখন কলেজে—জলপানি নিয়ে ঢুকলো তখন তাঁরা তাকে নিয়ে আর বিশেষ মাথা ঘামাতো না। অবশ্য হাত-খরচ হিসেবে সামান্য কিছু দিতো। যদিও সে তাদের একমাত্র সন্তান। সুতরাং মেয়েদের পিছে ঘুরবার তার খুব একটা অবসর ছিলো না। আর কিছু মেয়ের সংস্পর্শে এলেও তাদের খুব একটা মনে ধরতো না তাকে। ভিক্টোরিয়া-যুগের পূর্বপুরুষদের থেকে পাওয়া ভাব-প্রবণতায় ভরা অসুস্থ হতাশার ছাপ তার ওপর খুব প্রভাব বিস্তার করে-

ছিলো এ ব্যাপারটা আমি বুঝেছিলাম, এবং তার থেকে অনুমান করা যায় যে ভালোবাসার জন্য কাংগাল একজন মানুষ নাইজেরিয়ার সরল-মানুষগুলির কাছে ঠিক সেই জিনিষ-টা উন্মুখ করে দিয়েছিলো।"

হঠাৎ-ই বণ্ড দুঃখজনক বর্ণনায় বাঁধা দিলো, "সুন্দরী নিগ্রো রমণীদের অসুবিধা হলো তারা জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে একদম অজ্ঞ। আশা করি ঐ-রকম কোনো বাচ্চা থেকে সে নিশ্চয়ই নিজেকে বাঁচিয়ে ছিলো?"

রাজ্যপাল থতমত খেলেন আর বাঁধা দেবার জন্য যেন তাঁর হাত উঠোলেন। বণ্ডের এ ধরণের মোটা সুরের বক্তব্যে গলায় ফুটে উঠলো স্পষ্ট বিতৃষ্ণা-"না, না। আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন। আমি যৌন সংক্রান্ত কোনো কথায়ই বলতে চাইনি। এই যুবকের কালো মেয়েদের সংগে কোনো সম্পর্ক স্থাপনের চিন্তাই মাথায় আসেনি। বরং যৌন সংক্রান্ত যে কোনো ব্যাপারেই সে ছিলো অজ্ঞ। এখনকার সময়ে ব্যাপারটা আশ্চর্য শোনালেও তখনকার দিনে ব্যাপারটা মোটেই আশ্চর্যের নয়। কারণ—আর এই কারণের সংগে আপনিও একমত হবেন—অনেক প্রচুর বিভেদমূলক বিবাহ, আর নানারকম দুঃখজনক ঘটনা। বণ্ড মাথা ঝাঁকালো।..."ছোটোভাবে বল্লে বলা যায়। এই স্পর্শকাতর লোকটা তাঁর নিজের দেশের পরিবেশে বেমানান। মানদেহের অনুসন্ধিৎসা তার ছিলো না। কিন্তু অন্য সব ব্যাপারে সুস্থ কর্মক্ষম এবং সুচতুর নাগরিক।"

বণ্ড এক চুমুক ব্রাণ্ডি গলায় ঢেলে পা-দুটো ছড়িয়ে দিলো। গল্পটা বেশ তার ভালোই লাগছে। রাজ্যপাল সুন্দর অভিভাবক-সুলভ ঠমকে বর্ণনার ঝুরি খুলেছেন। ফলে গল্পটায় এসেছে। সততার ছাপ।

আবার আরম্ভ করলেন রাজ্যপাল,—"শ্রমিক সরকার ক্ষমতায় আসার কাছাকাছি সময়েই ফিলিপ মাস্টারস্ চাকরীতে আসে। আপনার মনে আছে কি না জানিনা ওরা ক্ষমতায় এসেই বিদেশ-সংক্রান্ত চাকরীগুলির ঢেলে সাজবার পরিকল্পনা নেয়। ঐ সময় নাইজেরিয়ায় যিনি রাজ্যপাল হয়ে আসেন—উনি আবার উপনিবেশ সংক্রান্ত সমস্যায় উদারপন্থী মানুষ ছিলেন। ভদ্রলোক বেশ কিছুটা আনন্দের সংগে বিস্মিত হয়েছিলেন যে তিনি যা মনে মনে ঠিক করে রেখেছেন সেটা ইতিমধ্যেই তাঁর একজন নিম্নপদস্থ কর্মচারি হাত-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি ফিলিপ মাষ্টারস্কে উৎসাহ দিলেন। এমন কী তাকে তার পদোপযোগী থেকে অনেক বড় দায়িত্বজনক কাজও পরিবেশন করা হলো। এর পর যখন চাকরীতে উন্নতির ব্যাপার-টা এলো তখন রাজ্যপাল ভদ্রলোক এমন জলন্ত ভাষায় ফিলিপের গুণকীর্তণ করলেন

কে তাকে এক ধাপ উঁচু পদে বারমুডায় সহকারী সচিব করে পাঠানো হলো।”

চুরুটের ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে রাজ্যপাল বণ্ডের দিকে চাইলেন। কিছুটা বা মাপ চাইবার ভংগীতে বল্লেন, “এই সাত কাহন ব্যাপার শুনতে আপনি নিশ্চয়ই বিরক্ত বোধ করছেন না? আসল ঘটনায় আসতে আমার আর খুব একটা দেরী হবে না।”

“সত্যি, আমার খুব ভালো লাগছে। হ্যাঁ, মানুষটার ছবি আমি যেন এখন পড়তে পাচ্ছি। ঠিক, আপনি লোকটাকে বেশ ভালোই মাপতে পেরেছিলেন।”

কিছুটা ইতঃস্তত করে রাজ্যপাল আবার আরম্ভ করলেন, “হ্যাঁ, মানুষ-টাকে আমি বারমুডায় এসে আরো ভালো বুঝতে পারি। আমি ছিলাম ঠিক তাঁর ওপরের পদে আর সে আমার কাজগুলিই দেখতো। অবশ্য আমরা কেউই তখন বারমুডার সংগে নিঃসারে জড়িয়ে যায়নি। তখন আফ্রিকায় বিমান-ব্যবস্থার শৈশব অবস্থা। যে কোনো কারণেই হোক ফিলিপ মাষ্টারস ঠিক করলো ছুটিতে সে বিমানেই যাবে আর এজন্য সে ছুটি-টাও বেশীদিনের নিলো। অবশ্য যদি সে ফ্রী'টাউন থেকে জাহাজে চেপে যেতো তাহলে হয়তো অতো দিনের ছুটি নিতো না। ট্রেনে গেলো সে নায়রোবি। ইম্পিরিয়াল এয়ার ওয়েজ-এর, মানে বি. ও. এ. সি.-র আগের সংস্থা আর কী। ওদেরই সাপ্তাহিক বিমানে পাড়ি জমালো বাড়ীর পথে। ফিলিপ এর আগে কখনো বিমানে চাপে নি। তাই বিমান যখন মাটি ছেড়ে উড়লো তখন তার আগ্রহের মধ্যে কিছুটা বোধহয় ঘাবড়িয়ে যাওয়া ভাব ছিলো। সুন্দরী তন্বী বিমান সহায়িকা তাকে সুন্দর হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলো কী ভাবে আসন বেষ্টনী বাঁধতে হয় সেটা-ও দেখিয়ে দিয়েছিলো। বিমানের ওড়া-টা-তার কল্পনায় থাকা ভীতির থেকে যে অনেক সুখের ব্যাপার সেটা প্রথম সেদিন জানতে পারলো। প্লেন-টা প্রায় ফাঁকা-ই বলা চলে। আর ঠিক এই সময় বিমান সহায়িকা তার কাছে ফিরে এলো। হাসলো মেয়েটি” এবার আপনি বেষ্টনী-টা খুলতে পাবেন। বেষ্টনী খুলতে হিমসিম খেতে দেখে সহায়িকা নিজে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো। এটা নিশ্চয়ই ঘোর একটা অন্তরংগতার ব্যাপার। জীবনে মাষ্টারস্ তার বয়সী আর কোনো মেয়ের এতো নিবিড় সংস্পর্শে আসে নি। লজ্জায় লাল হয়ে গিয়ে অসাধারণ এক অবস্থায় পড়লো সে। ধন্যবাদ জানালো। তার জড়তায় বিমান সহায়িকা আরো লোভনীয় হাসি দিলো। শূন্য আসনের হাতলের ওপর বসে নানা কথা জিজ্ঞাসা করলো,—কোথা থেকে আসছে,

কোথায় বা যাচ্ছে। সবই বল্লো ফিলিপ কে এর পর সে-ও জিজ্ঞাসা করলো, প্লেনের খুঁটি নাটি সম্বন্ধে, প্লেনের ছোটার বেগে কতো, সামনে কোথায় থামবে আরো সতে-সতেরো। মাষ্টারস্ অবাক হলো,—বাঃ রে, মেয়েট তো খুব সহজ সরল ভাবে কথা বলছে আর কী সুন্দর দেখতে! ..কী সৌন্দর্যময় আর উত্তেজনায় ভরা ওর জীবনযাত্রা। মেয়েটা যে বিরাট কিছু এটাই সে মনে করলো। রাঁধুনী দুজনকে দুপুরের রান্নায় সাহায্য করতে মেয়েটি চলে গেলে সে বসে বসে মেয়েটির মুখ-সৌন্দর্যে পুলক বোধ করতে লাগলো। বই পড়তে চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুতেই মন লাগাতে পারলো না। মেয়েটাকে ফের ফিতি দেখার জন্য প্লেনের চারপাশে চোখ বোলালো। একবার চোখচুরি হতে চোখের গুপ্ত একট তীর মারলো যেন বিমান সহায়িকা, চোখের ভাষা যেন বল্লে, দেখ বিমানে আমরাই মাত্র দুজন যুবক-যুবতী। পরস্পরকে বুঝতে পারি আমরা আর সব জিনিসেই আমাদের সমান আগ্রহ।

"ফিলিপ-মাষ্টারস জানালার বাইরে মুখ বাড়ালো। বাইরে সাদা-মেঘ আর তলায় বিমানের ভেতর রয়েছে সে। মনে মনে খুঁটিয়ে দেখলো মেয়েটাকে। না সত্যি অপূর্ব! ছোটে-খাটো ঋজু-তন্বী। রংটা দুধ আর গোলাপে মিশিয়ে। সুন্দর চুলগুলি পেছনে চুড়ো করে বাঁধা। ফুটন্ত চেরীফুলের মতো লাল ঠোট দুটি তার। নীল চোখ। সে চোখ-জোড়া আবার মাঝে মাঝে দুষ্টামিতে ঝিলিক মারে! ওয়েলস্ দেশটাকে সে ভালোই জানে। ওর দেহে নিশ্চয়ই ওয়েলসের রক্ত আছে। নামটা আবার সেটা ভালো করে প্রমাণ করে দিলো, রড েভেলীন। সেটা আবার সে জেনেছে খাবার আগে হাত ধুতে গিয়ে বিমান-কর্মীদের নামের তালিকা দেখে। আবার সে সমস্ত ব্যাপারটা চিন্তা করলো। দু-দিন সে ওর সংগে মিশছে, কিন্তু এরপর ও মিশবে কী ভাবে? আরো অনেক স্তাবক ওর নিশ্চয়ই রয়েছে। আশ্চর্য কী? হয়তো মেয়েটি বিবাহিতা। সব সময়ই কী ও উড়ে বেড়ায়? দু-বার ওড়ার মধ্যে অবসর কতোখানি? আচ্ছা মেয়েটি কী ব্যাংগ করবে যদি সে খাবার আর থিয়েটার দেখার নেমন্তন্ন করে বসে। সে কী বিমান-চালক ভদ্রলোককে অভিযোগ করে বসবে যে একজন যাত্রী তাকে বিরক্ত করছে। ভয় হলো এক্ষেনে কী তাকে বিমান থেকে নাবিয়ে দেবে? আর তারপর যদি খবরটা উপনিবেশ-সংক্রান্ত আফিসে যায়? ব্যস্, তবে তো চাকরী ওখানেই খতম।

দুপুরের খাবারের সংগে সংগে এলো আশার আলো। কোলের ওপর খাবার ট্রে-টা রাখতে গিয়ে মেয়েটার মাথার চুল চিবুকটা ছুঁয়ে গেলো।

ফিলিপের মনে হলো সে যেন ইলেকট্রিক শক্ খেয়েছে। বিমান-সহায়িকা যত্নের সংগে তাকে দেখিয়ে দিলো—কীভাবে সেলোফেন প্যাকেট খুলতে হয়। কীভাবে চাটনীর প্ল্যাষ্টিক ঢাকনা তুলবে। মেয়েটি তাকে বলে দিলো মিষ্টিটা সত্যি ভালো। তারপর আছে কেক। মাষ্টারস্ চেষ্টা করেও মনে করতে পারলো না তার সংগে এমন ব্যবহার কেউ করেছে কী-না। এমন কী তার বাচ্চা-বয়সে মা-ও কী?

"ভ্রমণের শেষ পর্যায়ে মাষ্টারস্ যখন ঘেমে নেয়ে অস্থির হয়ে তাকে বাইরে নেমন্তন্ন খেতে আহ্বান করলো ব্যাপারটার তখনই হলো ছন্দপতন। মেয়েটি সংগে-সংগেই রাজী হয়ে গেলো। এর একমাস পরে মেয়েটি বিমান-সংস্থা থেকে পদত্যাগ করলো। আর তারপরই হলো ফিলিপ মাষ্টার-এর সংগে তার বিয়ে। আবার পরের মাসে ফিলিপের ছুটি ফুরোতে ওকে নিয়ে সে বারমুডায় ফিরে এলো।"

বণ্ড বল্লো এরপর, "এবার আমার সবচেয়ে খারাপটাই মনে আসছে। মেয়েটি ছেলেটিকে বিয়ে করলো কারণ তার চোখে ফিলিপের জীবন উত্তেজনায় ভরা আর বিরাট কিছু একটা। রাজভবনে চায়ের আসরগুলিতে মধ্যমণি হবার লোভ তার খুব প্রবল। শেষমেষ নিশ্চয়ই মাষ্টারসের তাকে খুন করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না?"

"না", আস্তে করে রাজ্যপাল বল্লেন, "তবে ফিলিপকে কেন সে বিয়ে করলো তার কারণটার কাছাকাছি আপনি পৌঁছে গেছেন। উড়ে বেড়াবার ফাঁকে কখন সে জীবনটা ফস্কে চলে যাবে এ-ভয় তার সবসময় ছিলো। সত্যি ঐ আগের জীবন সে আর চাইছিলো না। বিয়ের পরে হ্যামিলটনের প্রান্তে তাদের বাংলো-তে তারা যখন থিতিয়ে বসলো তখন মেয়েটির উচ্ছ্বলতা দেখে আমারও সেই একই ধারণা করেছিলাম। বলাই বাহুল্য আগের ফিলিপ আর ছিলো না। জীবনটা তার কাছে পরীর দেশ বলে মনে হতে লাগলো। পেছনে তাকালে সত্যি দুঃখ হয় সে মেয়েটির উপযোগী হতে কী আপ্রাণ-না চেষ্টা করতো। যত্নের সংগে এখন সে কাপড়-চোপড় পরা ধরলো, মাথার চুলে উজ্জ্বলতা বাড়ায় এমন কিছু মাখতে লাগলো এমন কী ফৌজী ধরনের একটা গোঁফ সে গজিয়ে তুল্লো। এ সবই সে করতো কিন্তু মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে। ছুটি হতে-না হতেই হুড়মুড়িয়ে বাংলোতে সেঁধোতো। তারপর রুডা এটা ঠিক হয়েছে, রুডা ওটা ভালো লাগছে-তো বলে তুলকালাম লাগিয়ে

সত্যি ছেলেটি খ'টতে পারতো আর এর জন্য মানুষজন ওকে ভালোও বাসতো। এভাবে বিয়ের ছটা-মাস যেন পাখা মেলে উড়ে গেলো। এরপর ছোট্টো বাংলো-টাতে কথা পড়তো যেন কোনো এ'সিডের তিক্ততা নিয়ে। "আচ্ছা ব্যাপারটা কী? উপনিবেশ সচিবের বৌমা-তো কখনো আমাকে বাজারে কেনাকাটা করতে ডাকে না? আরেকটা ককটেল পার্টি দিতে আমাদের আর কতোদিন অপেক্ষা করতে হবে? শোনো বাবা আমাদের এখন কাচ্চা-বাচ্চা হওয়া সাজে না। তোমার চাকরীতে উন্নতি হচ্ছে কবে? সমস্তদিন বাড়ীটাতে মড়া-আগলাতে আর ভালো লাগে না। তুমি আজ রাতের খাবারের ব্যবস্থাটা করো। আমাকে আর বিরক্ত করো না। তোমার সময় কী সুন্দর কেটে যায়। তুমি তো বেশ ভালোই আছো……।"

এ-ভাবেই চলতে লাগলে……এরপর মাষ্টারস্-ই বৌয়ের সকালের জল-খাবার অফিসে যাওয়ার আগে মুখের সামনে তুলে ধরতো। অফিস থেকে ফিরে ঘরবাড়ী সাফ-সুতেরো সেই করতে আরম্ভ করলো। কী নোংরাটাই-না ঘরবাড়ী করে রাখতো। এখানে-ওখানে সিগারেটের ছাই। চকলেটের মোড়ক। মাষ্টারস্ সিগারেট আর মাঝে মধ্যে যে একটু-আধটু মদটদ খেতো সেটা সাশ্রয় করে বৌয়ের জন্য জামা-কাপড় কিনতে লাগলো, যাতে সে অপর বৌদের সংগে পাল্লা দিতে পারে। আমরা যারা মাষ্টারস্‌কে চিনতাম অবাক হয়ে গেলাম। থেকে থেকে অযথা অফিসের টেলিফোনে কথা বলা, অফিস ছুটি হওয়ার দশ মিনিট আগে কেটে ওঠা যাতে বউকে সিনেমায় নিয়ে যাওয়া যায়। অন্যান্য বৌদের সম্বন্ধে সরস মন্তব্য—ওরা সারাটা দিন থাকে কী করে?

"আচ্ছা সব বৌয়েরাই বারমুডায় বেশী গরম অনুভব করে? আমার মনে হয় মেয়েরা খুব তাড়াতাড়িই ব্যস্তবাগীশ হয়ে পড়ে। আরো কতো কী! আসলে কথা হলো ছোকরাকে বড়া পাগল করে ছেড়েছিলো। মেয়েটাই তখন হয়ে দাঁড়িয়েছে সবকিছু আর কোনো কারণে মেয়েটি অসুখী হলে কারণটা সে নিজের ওপর চাপাতো। মাষ্টারস্ পাগলের মতো তত্ত্ব-তল্লাশ করতো কীসে বিমান-সহায়িকা সুন্দর দিন কাটাতে পারে। শেষে সে পেলো হ্যাঁ বলা উচিৎ ওরা দুজনেই পেলো গল্‌ফের সন্ধান। আর ঝাঁপিয়েও পড়লো দুজনে। বারমুডাতে গল্‌ফ আবার খুবই জনপ্রিয়। সবার সেরা "মিড্ ওসেন ক্লাব।" খেলার শেষে চলতো মদ খাওয়া আর গল্প-গুজব। ঠিক সে যা চেয়েছিলো—একটা চমকপ্রদ আর উঁচু সমাজের প্রতিষ্ঠা। খোদায় মালুম! কী করে

ছোকরা ওখানকার তালিমের উপযোগী পয়সা-কড়ি যোগাড় করলো। যাই হোক টাকা-পয়সা জোগাড় করেছিলো সে—আর খেলাও জমে উঠলো। সমস্ত দিনটা বৌ "মিড্ ওসেন ক্লাব"-এ কাটাতে আরম্ভ করলো।

সত্যি খুব কঠিন পরিশ্রম করেছিলো কিন্তু মেয়েটা। ছোটো-খাটো প্রতিযোগীতায় সাফল্য অর্জন করে বড় খেলায় হাত বসালো সে। আর দেখতে না দেখতে ক্লাবের পুরুষ সভ্যদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হলো একসময়। মাঝে-মধ্যে তাকে আমি গল্ফ-ক্লাবে দেখেছি—খাটো মাপের প্যান্ট, চোখে গগলস্......হ্যাঁ, তখন দেখে মনে হতো আমার দেখা গল্ফ-ক্লাবে সব সুন্দরীদের মধ্যে ও হচ্ছে বিশ্বসুন্দরী। পরের ধাপটা উঠতে অবশ্য খুব একটা দেরী হলো না। এই সময় আরম্ভ হলো মিশ্র-প্রতিযোগীতা।

পড়বি তো পড় রডা পড়লো বায়মুডার সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ী আর সমাজের মধ্যমণি ট্যাটারসল্ বংশের এক ছেলের সংগে। খুবই দর্শনধারী, ভালো সাঁতারু আর নিখুঁত গল্ফ্ খেলোয়ে। তার অনেক কিছুর মধ্যে ছিলো মোটর আর দ্রুতগামী মোটর-চালিত নৌকো। হ্যাঁ, জানা চরিত্র। মেয়েরা এধরণের পুরুষদের পেছনে ঘোরাঘুরি করে বেশী। কয়েকদিনের মধ্যে এই মেয়ে মানুষগুলি বড়লোক মানুষের সটান বিছানায় চলে যায়। কারণ পরিণামে পায়ে মার্সিডিজ গাড়ীতে চড়া। চনবরল নৌকোয় আর সুন্দর বিকেল নাইট-ক্লাবে গুলতানি। এই মাষ্টারদের বৌয়ের জোড়াটা অনেক কষ্ট করে শেষমেষ খেলায় জিতলেও জেতার জন্য শৌখীন দর্শক অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা জানিয়েছিলো। দর্শক দলে মাষ্টারস্ ছিলো মনে হয় সেই তার বৌকে শেষ স্বাগতম জানালো। এবার আরম্ভ হলো যুবক টেটারসলের সংগে তার লীলাখেলা। এবং সেটা চল্লো হাওয়ার বেগে। বিশ্বাস করুন বণ্ড সাহেব "একটা ঘুঁষি টেবিলে মেরে রাজ্যপাল বল্লেন"," সেটা চল্লো বিশ্রী নোংরাভাবে। মেয়েটা নোংরা ব্যাপারটা মোটেই ঢাকার বা ঢাক ঢাক গুরগুর জাতীয় কিছু করেনি। টেটারসলকে গলায় ঝুলিয়ে ফিলিপকে আঘাতের পর আঘাত করে চল্লো। রাতে খুশীমতো বাড়ী ফিরতে আরম্ভ করলো। মাষ্টারস্কে বল্লো একদিন।—তুমি বাবা পাশের ছোটো ঘরে শোও আমার রাতে ঘুম হয় না। যদি সে কোনোদিন ঘরদোর পরিষ্কার করতো বা রান্না চাপাতো,—সেটা স্রেফ লোক দেখানোর জন্য। একমাসের মধ্যে ব্যাপারটা বাজারে কেচ্ছা হয়ে দাঁড়ালো। থুৎকার চরমভাবে এলো ফিলিপ মাষ্টারের মুখে। এবার এগিয়ে এলেন রাজ্যপালের স্ত্রী। লেডী বারঘোড। বল্লেন তিনি রডাকে ডেকে সে

যা কাজ-কারবার চালাচ্ছে এতে মাষ্টারস্ ঝাড়ে-বংশে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু লেডী দেখলেন অন্যভাবে। ফিলিপকে তিনি একজন ন্যালাখ্যাপাই ভাবলেন। লেডী বায়ফোর্ড এককালে খুবই সুন্দরী ছিলেন। এখনো চোখ দুটোয় যা কটাক্ষ মারেন! তাই বড়কে তিনি ঠিকমতো কড়কে দিতে পারলেন না। অবশ্য মাষ্টারস্ নিজেও মারাত্মক কিছু বিধি-ব্যবস্থা হাতে নিয়েছিলো,—প্রতিবাদ তিক্ত কলহ দারুণ রাগ, মারধর (একবার তো সে প্রায় গলা টিপে মারতেই গিয়ে ছিলো)। এ সমস্ত সে পরে আমাকে খুলে বলেছিলো। শেষমেষ এলো বরফ-ঠাণ্ডা ঔদ্ধা-সৈন্য আর চরম অসহযোগ" রাজ্যপাল ভদ্রলোক থামলেন কিছুক্ষণ, "জানি না ভালোবাসা ভেংগে যাওয়ার কোনো দুঃখজনক ঘটনা আপনার জানা আছে কী না। এখানে ভালোবাসাটা আস্তে আস্তে আর ইচ্ছাকৃতভাবে উবে গেলো। ভয়ংকর ব্যাপার। বারমুডায় এলো মানুষটা স্বর্গের সৌন্দর্য নিয়ে আর কয়েক মাসের মধ্যে মুখে এলো ওর ভয়াল গাম্ভীর্য। নিশ্চয়ই আমার পক্ষে যতোদূর যা সম্ভব করেছিলাম। শুধু আমি কেন আমরা সকলেই যা করনায় করলাম কিন্তু ভবী ভুলবার নয়। 'মিড ওসেন'-এর ঘটনার পর ভাংগা কলসী আর জোড় খেলো না। ফিলিপ নিজেকে ঘরের এক কোণে গুটিয়ে নিলো আর কেউ কিছু বলতে গেলেই ক্ষেপা কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ জুড়ে দিতো। দুয়েকটা চিঠি-ও লিখেছিলাম আমি। মাষ্টারস্ পরে আমাকে বলেছিলো চিঠিগুলি সে না পড়েই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো। একদিন শুধু ওরই জন্য আমার বাংলোতে পার্টি দিলাম; মদ খাইয়ে মাতাল করে ছাড়লাম ওকে। এর পরই এলো বাথরুম থেকে মারাত্মক এক আওয়াজ। কী? না মাষ্টারস্ আমার ক্ষুর দিয়ে কব্জি কাটার চেষ্টা করেছিলো। এবার ঘাবড়ে গেলাম আমরা। সকলে আমাকে ঠিক করলো যে আমি-ই গিয়ে রাজ্যপালকে সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে ধরবো। রাজ্যপাল সবই জানতেন। ভেবেছিলেন ব্যাপারটা এমনিতেই মিটে যাবে। তাঁকে আর নাক গলাতে হবে না। পরিস্থিতি-টা এখন দাঁড়া লো মাষ্টারস্ কী চাকরী-টা চালিয়ে যেতে পারবে? কাজের তো বারো-টা বেজে গেছে। বৌ-টা তো হাঁটুরে গুজবের আস্তাকুঁড়। মানুষটা বিধ্বস্ত। ভাংগা কাঁচ জোড়া লাগাতে পারবো কী আমরা? বিশিষ্ট ভদ্রলোক ছিলেন রাজ্যপাল। একবার যদি কোনো কাজে হাত দেন তাহলে সেটার চূড়ান্ত করে ছাড়েন। আবার এ সময় ভাগ্য-ও তার খেলা শুরু করে দিলো। রাজ্যপালের সংগে দেখা করার পরের দিনই ব্যাপারটা ঘটলো। উপনিবেশ সংক্রান্ত দপ্তর থেকে চিঠি এলো। ওয়াশিংটনে সমুদ্রতীরে মাছ ধরার ব্যাপারে

খোল-নলচে পাল্টাবার জন্য অধিবেশন বসবে একটা। বারমুডা এবং বাহামা এতে প্রতিনিধি পাঠাতে পারে। মাষ্টারস্-কে ডেকে রাজ্যপাল ওলন্দাজ-খুড়োর মতো উৎসাহ দিলেন। সে ওয়াশিংটান যাচ্ছে আর তার সুবিধা মতো দু মাসের মধ্যে ঘরোয়া কোন্দল মিটিয়ে ফেলে। ওয়াশিংটনে পৌঁছে মাষ্টারস্ পাঁচ মাস শুধু মাছ মাছ করে কাটিয়ে দিলো। আমরা সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম। ভাবলাম ব্যাপারটা বোধহয় মিটে গেলো। এ সময় রডার সংগে দেখা হলেই বেটে উঠতাম আমরা ”

রাজ্যপাল থামলেন। বিরাট উজ্জল আলোকে আলোকিত অভ্যর্থনা ঘরটায় নীরবতা নেবে এলো। পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখটা মুছে নিলেন।··· উঠে পড়লেন তিনি। বণ্ড আর নিজের জন্য হুইস্কি সোডা মিশিয়ে দুটো গ্লাস নিয়ে এলেন এক সময়। বণ্ড বল্লে, “কী গোলমেলে ব্যাপার। আগেই ভেবেছিলাম, কিছু আগে আর পরে পরিণতি-টা এমনই হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য মাষ্টারসের ব্যাপারটা আগেই ঘটলো। রডা টা পাষানী কুত্তা একটা। আচ্ছা ও কী এই পরিণতির জন্য মনে একটুও দুঃখ পায়নি ?”

ইতিমধ্যে রাজ্যপাল ভদ্রলোক চুরুট-ধরিয়েছেন। আগা-টা জলছে কীনা পরীক্ষা করে জোরে একটা টান মারলেন। বল্লেন তিনি, “মোটেই না। আনন্দের তুংগে আছে তখন সে। ও ভালোই জানে এ স্বপ্ন বেশীদিনের নয়। এ স্বপ্ন সবাই দেখে। সাধারণতঃ যারা মেয়েলি পত্রিকা-টত্রিকা পড়ে ঐ ধরণের মেয়েদের মনোবৃত্তি রডারও ছিলো। সব কিছুই পেয়ে ছিলো সে—দ্বীপের সেরা মানুষটা বাগিয়েছে, পাম গাছের ছায়ায় সমুদ্রের তীরে প্রেমের হুল্লোড়, সহরে উচ্ছল জীবন, “মিড-ওসেন”—এ মাতামাতি, গাড়ী আর যন্ত্রের নৌকায় উড়ে চলা—সস্তা ভালোবাসার প্রায় সবকটা উপায় সে তখন কুক্ষিগত করে ফেলেছে। তার জীবনে অনভস্ত চাকরের মতো স্বামী। চান করার জন্য আর রাতের ঘুমের জন্য বাড়ীটাই শুধু পিছু-টান। মনে করেছিলো যতোই গড়বড় করুক-ফিলিপ মাষ্টারস্-কে ঠিক সময় মতো সে ফিরে পাবে। নীচ নয় লোকটা। দরকার হলে ঘরে ঘরে মানুষের ক্ষমা প্রার্থনা করবে। তারপর ? যথা পূর্বম্ তথা পরম্। এতেও যদি বরফ না গলে তবে দ্বীপে অনেক মানুষ আছে যারা তাকে লুফে নেবে। ক্লাবের লোকদের দিকেই তাকাও না। একবার শুধু ছুঁ করার ওয়াস্তা। জীবন নতো সুন্দর ! দেখো না, হালিউডের মানুষগুলি কী ভাবে জীবন কাটায়।

মজা হলো শীঘ্রি রডা নিজের গ্যাড়াকলে নিজেই পড়লো। ইতিমধ্যে টেটারসাল-ও মেয়েটাকে নিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছে। আবার রাজ্যপালের স্ত্রী বাড়ীতে নালিশ করার বাড়ীর লোকেরাও বেশ কড়কে দিয়েছে। তাই মোটেই যাত্রার দৃশ্য তৈরী না করে টেট রসাল মেয়েটাকে বাবা মার ঝামেলার ভুজুং ভাজুং দিয়ে ভাগিয়ে দিলো। ইতিমধ্যে গরম কাল এসে গেছে। আমেরিকা থেকে সুন্দরীর দল এসেছে বেড়াতে। ফিলিপ মাষ্টারস্ ওয়াশিংটন থেকে ফিরবার পনেরো দিন আগে ব্যাপারটা ঘটলো। সেয়ানা হলেও রডা মেনে নিলো সব। ভালোই জানতো দু দিন আগেই হোক আর পরেই হোক এটা ঘটবে। লেডী বারফোর্ড-এর সংগে দেখা করলো রডা। নিজের ব্যবহারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলে। তিজ্ঞা করলো। ঘর-দোর পরিষ্কার করলো, সাজলো আর বহুৎ দিনের বিরহের পর স্বামী-সন্দর্শনের জন্য হলো তৈরী। ঠাঁই নেই কোথাও মেয়েটির। "মিড্ ওসেনে"র পুরনো বন্ধুরা তাকে ছেড়েছে। হ্যামিলটন ব্যবসায়ীরা করেছে জেহাদ ঘোষণা সে যেন এঁটো শালপাতা। ব্যবহারের আগেই যাতোটুকু দাম। দুয়েকবার সে ছেলিপনা করে আগের মতোই "মিড্ ওসেনে" গেলো। কিন্তু ভবী ভুলবার নয়। সুতরাং বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে আবার তাকে নিশ্চিত আশ্রয়ের কাছে ফিরে গিয়ে জীবনী শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। তাই বাড়ী ফিরে গিয়ে অভিনয়ের মহড়া আরম্ভ করলো। কান্না-কাটি, ন্যাকামি, বিরাট মাপের সব ওজুহাত, ছুটো বিছানা।

"আর ঠিক এই সময় ফিলিপ মাষ্টারস্ ফিরে এলো।" ফিরে তাকালো রাজ্যপাল বণ্ডের দিকে,—বল্লো, "আপনি বিবাহিত নন। অবশ্য কিছু যায় আসে না। কারণ ব্যাপারটা সব রকম মেয়ে পুরুষের সম্পর্কে পড়ে। মেয়ে আর পুরুষ ততক্ষণ পর্যন্ত কাজ চালানোর মতো মিলিয়ে চলতে পারে যতোক্ষণ তাদের মধ্যে মানবিকতা বজায় থাকে। এই সম্পর্ক একেবারে উঠে যায় যখন তাদের মধ্যে ক্ষমা সুন্দর ভাবটা আর থাকে না। একজন বঁচলো কী মারলো অপরজন তা ফিরেও দেখে না। এই সর্বস্ব ভুলে যাওয়ার অহং-ভাবটা এটাই হচ্ছে মারাত্মক। হাজারো-টা বিয়েতে এটা আমি দেখেছি। দেখেছি আমি স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের নোংরামি ভুলে যেতে, আমি দেখেছি কোনো অন্যায় এমন কী খুন একজন স্ত্রী চেপে গেলো। দেউলিয়া বা অন্য কোনো সামাজিক অন্যায়ের কথা তো বাদই দিলাম, অক্ষমত্ব, বিপদ, সব কিছুই একজন অপরজনের জন্য করতে পারে যদি তাদের মধ্যে মানবিকতা-টা বজায় থাকে। "বা কাজ চালানোর মতো ভালোবাসা।"... এবার বল্লো বণ্ড, "বেশ সুন্দর বলছেন

আপনি। আপনার বক্তব্য-ও মনে হচ্ছে বুঝতে পারছি ঠিক, হ্যা আপনি ঠিকই বলেছেন। কী যেন কথাটা বলছিলেন তখন কোয়ান্টাস অব্ সোলেস্"। মানুষের শেষ আশা-ভরসা এর ওপরই বর্তায়। মানুষের স্থিতি বড়ই নড়বড়ে। একজন মানুষ যখন বোঝে অপরজন শুধুমাত্র তার ক্ষতি চায় না চায় চরম সর্বনাশ—তাহলে তো একদম পাখোওয়াজ অবস্থা। সব শেষ! "কোয়ান্টাম অব সোলেস্" একবারে শূন্য।

এ পরিস্থিতিতে যে পালায় সেই বাঁচে। মাষ্টারস্ কী সেটা বুঝতে পেরেছিলো?"

উত্তর দিলেন না রাজ্যপাল। বল্লেন তিনি, "রডা মাষ্টারস্-এর উচিৎ ছিলো এটা বুঝে নেওয়া। মাষ্টারস্ বাড়ীতে ফিরে গটগট্যিয়ে যখন বাংলোতে সেঁধুলো বুঝে নেওয়া উচিৎ ছিলো রডার মাষ্টারসের অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে। মিলিটারি গোঁফ আর নেই। প্রথম দিনের দেখা মাথায় সেই কাকের বাসার চুল। কিন্তু পরিবর্তন হলো চোখের। মুখের আর চোয়ালের রডা মাষ্টারস্ তার সবচেয়ে ভদ্র ফ্রক-জামাটাই পরেছিলো। মুখের সমস্ত মেক আপ তুলে জানলায় ধারে একটা চেয়ারে বসে কোলে বই নিয়েছিলো। বসার ভংগীটা ছিলো অদ্ভুৎ। আলো এসে তার বইয়ে পড়বে কিন্তু মুখ থাকবে অন্ধকারে। সে আগেই ঠিক করে রেখেছিলো—ঘর ঢুকলেই সে চরম বিনয়ীয় মতো তাকাবে. আর কথাবার্তা ফিলিপই আরম্ভ করবে। তারপর সে ধীরে ধীরে উঠে ওর কাছে গিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়াবে। সব কিছুই তার পর রডা খুলে বলবে আপনা থেকেই। বিন্দু বিন্দু অশ্রু চোখ থেকে ঝরে পড়বে। এর পর নিশ্চয়ই ফিলিপ তাকে জড়িয়ে ধরবে। তারপর রডা বার বার প্রতিজ্ঞা করবে আর সে কখনো উল্টাপাল্টা কাজ করবে না। বহুবার সে এর মকশো করেছে। নিখুঁত অভিনয়ের জন্য।

"মকশো করা চোখে বই থেকে সে তাকালো। মাষ্টারস্ সুটকেসটা রেখে টেবিলের কাছে গিয়ে শূন্য-দৃষ্টিতে তাকালো একবার। চোখ দুটো তার ঠাণ্ডা নৈর্ব্যক্তিক আর উৎসাহহীন। পকেট থেকে একটা কাগজ বার করলো। বাড়ীর দালালের কেনা-বেচার গাম্ভীর্যে বল্লে সে—"এটা হচ্ছে বাড়ীর নকশা। দুটো ভাগে ভাগ করেছি বাড়ীটা। একপাশে তুমি অপর পাশে আমি। তোমার ভাগে পড়ছে শোবার আর রান্নার ঘর। আমার এটা আর অতিরিক্ত ঘরটা। হ্যাঁ স্নানের ঘরটা তুমি ব্যবহার করতে পারো যখন আমি থাকবো না।" ঝুঁকে পড়ে সে খোলা বইয়ের ওপর নকশাটা ফেলে দিলো। অতিথিরা

যখন আসবে তখনই কেবল তুমি আমার ঘরে ঢুকতে পারবে। কিছু বলতে চাইলে মাষ্টারস্ হাত উঠিয়ে থামিয়ে দিলো তাকে। গোপনে এই আমার-তোমার শেষ কথা। পরে কথা বল্লেও উত্তর পাবে না। কিছু বলার থাকলে বাথরুমে লিখে জানাতে পারো। সময়মতো আমার খাবার টেবিলে চাই। হ্যা, খাবার টেবিল তুমিও ব্যবহার করতে পারো আমার খাবার শেষে। প্রতি মাসের প্রথমে ঘরকন্নার জন্য কুড়ি পাউণ্ড আমার উকিল তোমায় দেবে। বিবাহ-বিচ্ছেদের কাগজ তৈরী হচ্ছে। তুমি মামলা লড়তে পারবে না। কারণ তোমার সমস্ত কীর্তি-কলাপ একজন ভাড়া-করা গোয়েন্দা জোগাড় করেছে। প্রায় একবছর পরে বারমুডা থেকে বদলী হবার সংগে-সংগে মামলার রায় বেরুবে। ইতিমধ্যে যতোক্ষণ ওসব রায় না বেরুচ্ছে আমরা বারমুডা-সমাজে স্বামী-স্ত্রী মতো বসবাস করবো।"

"মাষ্টারস্ পকেটে হাত ঢুকিয়ে নরম ভাবে বৌয়ের দিকে চাইলো। ইতিমধ্যে রডার চোখ থেকে দুগাল বেয়ে জলের ধারা নেবেছে। আতংকগ্রস্ত সে। মনে হচ্ছে কেউ যেন তাকে মেরেছে। উদাসীন ভাবে মাষ্টারস্ কথা চালালো—"আর কিছু জানতে চাও তুমি? যদি না থাকে তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে রান্নাঘরে কেটেপড়ো।" ঘড়ি দেখলো সে, "প্রত্যেকদিন সন্ধ্যা আটটায় আমি রাতের খাবার খাই। এখন সাড়ে-সাতটা।"

থামলেন রাজ্যপাল মশাই। চুমুক দিলেন মদে একটা। বল্লেন তিনি, "সমস্ত কিছুই আমি জেনেছি মাষ্টারস-এর ছাড়াছাড়া কথায় আর লেডী বারফোর্ডকে বলা রডার বৃত্তান্ত থেকে। বরফ গলাবার সব চেষ্টাই রডা করেছিলো,—অনুনয়-বিনয়, যুক্তিতর্ক, হিষ্ট্রিয়াগ্রস্ত অভিব্যক্তি। কিন্তু কিছুতেই কিছু না। মনে হলো তার একসময়—এই পরুষটা অন্য কেউ যে তার স্বামীকে ফিরবার দিন থেকে প্রতিনিধিত্ব করছে। ঘাট মানতে হলো শেষমেষ তাকেই। উপায়ও ছিলো না। পয়সা কড়ি নেই। ইংলণ্ডে ফেরবার টাকা-পয়সা তো দূরের কথা। কেবলমাত্র খাবার আর শোবার জন্য তার সমস্ত কথা রডাকে শুনতে হলো। একবছর এভাবেই কাটলো। বাইরের মানুষের কাছে শান্ত ভদ্র কিন্তু ঘরে আলাদা আর মুখ দেখাদেখি বন্ধ। আমরাও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ, এই ব্যবস্থার কথা ওরাও আমাদের বলেনি। রডার হয়তো ব্যাপারটায় লজ্জা থাকতে পারে, কিন্তু মাষ্টারসের? মানুষটা যেন নিজেকে আরো গুটিয়ে নিয়েছে। সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্লো যাক্, ওদের

বিবাহ-বিচ্ছেদ তাহলে আর হলো না। ফলে, নিজেদের বোঝা-পড়ার ক্ষমতার জন্য ঐ দম্পতি আরো খ্যাতিমান হয়ে উঠলো।

এর পরেই এলো মাষ্টারস্-এর যাবার পালা। বছরও ঘুরে গেছে ইতিমধ্যে। মাষ্টারস্কে এখন বদলীতে যেতে হবে। সে ঘোষণা করে দিলো রডা এখন থাকছে। তাকে বাড়ীর সব ঝামেলা মেটাতে হবে। ওরা দুজনে, যা হয়ে থাকে এখানে-সেখানে বিদায়-সম্বর্ধনায় যোগ দিলো। জাহাজ ছাড়বার সময়ও যখন রডা এলো না কিছুটা বা অবাক হলাম আমরা। মাষ্টারস্ অবশ্য বল্লে,—ওর শরীরটা ভালো না। এর কিছুদিন পরেই ইংলণ্ড থেকে খবর ফাঁস হতে লাগলো। ওদের বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারটা। এরপর রডা মাষ্টারস্ রাজভবনে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে লেডী-বারফোর্ড-এর সংগে কথা বল্লো। এবারই সব বৃত্তান্ত এমন কী পরের ভয়ংকর ব্যাপারটাও এসে গেলো।"

রাজ্যপাল মদের তলানিটুকু খেয়ে ফেল্লেন। শূন্য গেলাসটি টেবিলে রাখতে বরফ-কুচিগুলি 'ঝুনু-ঝুনু রবে' বেজে উঠলো। বল্লেন তিনি, "মনে হয় মাষ্টারস্ যেদিন চলে যায় সেদিনই বৌয়ের লেখা একটা চিরকুট সে বাথরুমে পায়। সে অবশ্যই বারমুডা ত্যাগ করার আগে তার সংগে শেষ কথা বলে নেবে। এর আগেও নিশ্চয়ই সে এ-ধরণের চিরকুট পেয়েছিলো। এবং সমস্তগুলির গতি একটাই। ছেঁড়া টুকরোগুলি জমা হলো যথারীতি হাত-ধোয়া বেসিনের ওপরের তাকে। ঐদিন ও চিরকুটে লিখেছিলো—বিকেল দুটার সময় বসবার ঘরে তুমি আমার সংগে দেখা কয়ো। নির্দিষ্ট সময়ে রডা চোরের মতো রান্নাঘর থেকে এলো। অনেকদিন আগেই ভাবালুতা বা ফিলিপের পায়ে পড়ার ন্যাকামো ছেড়ে দিয়েছে। শান্তভাবে বল্লো—ঘর-গেরস্থালীর খরচা থেকে তার কাছে মাত্র দুই পাউণ্ড আছে। সে এ-অবস্থায় চলে গেলে বিরাট পৃথিবীতে তার আর মাথা-গুজবার জায়গা থাকবে না।

"মণি-মুক্তা আর পশমের জামা-কাপড়, যা তোমাকে দিয়েছিলাম?"

"ওগুলি বিক্রী করে যদি পঞ্চাশ পাউণ্ডও পাই ধন্য মনে করবো আমি।"

"কোনো কাজ-কাজের ধান্দা দেখো—"

"হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। কিন্তু জোটাতেও তো সময় লাগবে। কোথাও তো আমাকে মাথা-গুজতে হবে। পক্ষকালের মধ্যেই এ-বাড়ী আমাকে ছাড়তে হবে। তুমি কী আমাকে কিছুই দেবে না? আমি কী না-খেয়ে মরবো।"

ঘৃণার সংগে তাকালো এবার মাষ্টারস্, "বালাই ষাট্, তোমার মতো সুন্দরী না খেয়ে মরবে কেন?"

"দয়া করো ফিলিপ, আমাকে দয়া করো! আমি যদি ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরে বেড়াই, তবে সেটা কী তোমার পক্ষে খুব সম্মানের হবে?"

ছেঁদি-পেদি দু-একটা জিনিষ ছাড়া তাদের নিজস্ব বলতে কিছুই ছিলো না। সামান্য বসত-বাটী হিসেবেই ভাড়া গুণতো তার।......

মাষ্টারস্-এর ছিলো একটা পুরণো মরিস্ গাড়ী। রেডিও গ্রামোফোন—যেটা রডা গলফ্ খেলা ধরবার আগে তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কিনেছিলো।

ফিলিপ মাষ্টারস্ তারদিকে শেষবারের জন্য তাকালো। আর তাদের কখনো দেখা হবে না। বল্লে ফিলিপ—"বেশ, গাড়ী আর রেডিওগ্রাম তুমি ব্যবহার করো।

এখানেই ইতি। আমাকে আবার জিনিষপত্র গোছাতে হবে। "বিদায়! দরজা দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেলো সে।"

বণ্ডের দিকে তাকালেন রাজ্যপাল ভদ্রলোক, "কিছুটা দয়া দেখালো মনে হচ্ছে তাই না?" বিষাদের সংগে হাসলেন ভদ্রলোক। "সে চলে গেলে রডা মাষ্টারস্ একা। তার গয়নাঘটি, শেয়ালের চামড়ার কোট, বিয়ের আংটি, নিয়ে হ্যামিলটনের দোকানে আর দালালদের কাছে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। শেষমেষ সোণা-দানার জন্য চল্লিশ আর পশমের কোটের জন্য সাত পাউণ্ড সে পেলো। ড্যাশবোর্ডে কোম্পানীর ঠিকানা পেয়ে মোটর কোম্পানীর ম্যানেজারের সংগে দেখা করলো একদিন। জিজ্ঞাসা করলো রডা—সে গাড়ীটা দিলে কতো টাকা পেতে পারে। উত্তরে ম্যানেজার বল্লেন গাড়ীটা কিস্তিতে নেওয়া হয়েছিলো। শ্রীযুত মাষ্টারস্ দেনা দেওয়ার ব্যাপারে বাজে মানুষ ছিলেন। আমরা ভদ্রলোককে উকিলের চিঠি দিয়েছিলাম। তার উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন আপনি নিজে এসে দেনা মিটিয়ে দেবেন। কোম্পানী কতো টাকা পাবে? দাঁড়ান দেখছি। একটা ফাইলের পাতা উল্টে বল্লেন তিনি—হ্যা পেয়েছি ঠিক দুশো পাউণ্ড।"

"বলাই বাহুল্য—রডা মাষ্টারস্ কেঁদে ফেল্লো। ম্যানেজার অবশেষে গাড়ীটা ফেরৎ নিতে রাজী হলো। অবশ্য গাড়ীটার আর তখন দুশো পাউণ্ড দাম ছিলো না। কিন্তু গাড়ীটা—তখন ঠিক সেই অবস্থায় ট্যাংকিতে যতোটুকু পেট্রোল আছে তা সমেত ফেরৎ দিতে হলো। কৃতজ্ঞচিত্তে রডা বাইরের হল্কা—গরমের রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। কৃতজ্ঞতা বোধ করলো সে—ম্যানেজারটা যাই হোক আইনে জড়ায়নি তাকে। এর পর সে অনুমান করলো রেডিওর দোকানে তাকে কী বার্তা শুনতে হবে। সেই একই জিনিষের পুনরাবৃত্তি হলো;

ওখানে। পরন্তু দশ পাউণ্ড আক্কেল সেলামী দিয়ে পার পেলো। বাড়ী ফিরে বিছানায় আছড়ে পড়লো মেয়েটা। সারাটা দিন সে কেঁদেই কাটালো। ফিলিপ মাষ্টারস্ যাবার সময় তার বুক ভেংগে দিয়েছিলো আর এখন সজোরে লাথি মারলো।”

থামলেন রাজ্যপাল। “বেশী কিছুটা অদ্ভুত। মাষ্টারস্ সত্যি ছিলো দয়ালু, স্পর্শকাতর। স্বাভাবিক অবস্থায় সে একটা মাছিও মারবে না। আমার জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে এখন সে ঘটালো নিষ্ঠুরতম ঘটনা। আগে যা বলেছিলাম,—ঐযে‘কোয়ান্টাম্ সোলেস্’ অফ্ থিওরী। এখানেও সেটা প্রযোজ্য। এই মত অনুসারে ভাংগা-কলসী আর জোড়া লাগবে না। যে বিশ্বাস মাষ্টারসের ভেংগে গেছে সে আর ফিরে আসবে না। আমাদের সকলের মধ্যেই নিষ্ঠুরতা সুপ্ত অবস্থায় থাকে—বাইরের আঘাতে সময়মতো ওট ওপরে উঠে আসে। মাষ্টারস্ চেয়েছিলো মেয়েটা কষ্ট পাক, ভুগুক। কিন্তু তারো-তো একটা সীমা আছে। শেষমেষ তাই সে করেছিলো নারকীয় কাজ—তার দেশ ছেড়ে চলে যাবার পরও যাতে মেয়েটা ক্রমাগত আঘাত পেয়ে চলে। মোটর গাড়ীই বলুন আর রেডিওগ্রামের ব্যাপারটিই ধরুন, সব পূর্ব-পরিকল্পিত। সে চলে যাবার পরও যাতে মেয়েটা পদে-পদে বোঝে কতো ঘৃণা মাষ্টারস্ তাকে করতো।

বণ্ড এবার বল্লো,—“সত্যি হৃদয়-বিদারক ব্যাপার এটা। মানুষ, মানুষকে কতোটা নির্দয়তা দেখাতে পারে তারই উদাহরণ ব্যাপারটা। আমার কিন্তু মেয়েটার জন্য দুঃখ হচ্ছে। ভালো কথা, এর পরিণতিটা কী হয়েছিলো?’

রাজ্যপাল এসময় উঠে পড়লেন। ঘড়ি দেখলেন তারপর, “আরে বাপ্‌রে! রাত যে কাবার হতে চল্লো। আর আমি মানুষগুলিকে আটকে রেখেছি।” হাসলেন তিনি, হ্যাঁ, আপনাকেও। “অগ্নিকুণ্ডের কাছে ঘন্টি মারলেন। একজন নিগ্রো খিদমৎগার এলে মাপ চাইলেন তিনি। লাইট নেবাতে আর দরজা-জানলা বন্ধ করতে বল্লেন। বণ্ডের দিকে ফিরে বল্লেন “আসুন বাকীটা আপনাকে বলছি। হ্যাঁ, আমিই আপনাকে বাগানের মধ্যে দিয়ে পৌছে দিচ্ছি। শান্ত্রীরা হয়তো ঝামেলা করতে পারে।”

রাজ্যপাল বলতে লাগলেন, ‘মাষ্টারস্ কাজে ফিরে গেলেও কিছু একটা হারিয়েছিলো। ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিলো মানুষটা। নিশ্চয়ই মেয়েটার সব দোষ। কিন্তু মাষ্টরসের নির্দয় ব্যবহারের কথাটাও ভাবুন। মনে হয় ঐ জঘন্য ব্যবহার ভূতের ভয়ের মতো বার-বার তার বিবেকে হানা দিতো। কাজ হয়তো সে ঠিকমতোই করতো—কিন্তু মানুষের ছোঁয়া-স্পর্শ, অনুভূতি সব

দিনে দিনে শুকিয়ে যেতে লাগলো। না, বিয়ে আর সে করেনি। কিছুদিন পরে তাকে চিনেবাদাম-সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় লাগানো হয়। তাতেও ব্যর্থ হলে তার পুরণো জায়গা সেই নাইজেরিয়ায়—যে দেশের লোকের সংগে তার ছিলো সত্যিকারের ভালোবাসা, দেওয়া-নেওয়ার পালা, সেইখানেই তাকে পাঠানো হলো।

"আর মেয়েটা?"

খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার! চরম দুর্দশার মধ্য দিয়ে তাকে চলতে হলো। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে আমরা বেরোলাম। সেও কাজের নামে কোথাও কোথাও দয়া-দাক্ষিণ্য কুড়ালে। বিমান-সহায়িকা কাজের জন্যও সে চেষ্টা করলো। কিন্তু তখনকার দিনে বিমান-সংস্থা কমই ছিলো। আর ঐসব চাকরীর উমেদার যথেষ্ট। আবার রাজকীয় বিমান-সংস্থায় চাকরী করার সময় আহামরি গোছের ব্যবহার রডা করেনি। বারফোর্ড-দম্পতি এসময় আবার জ্যামাইকাতে বদলী হয়ে গেলেন। ফলে তার মোটা-খুঁটি সরে গেলো। আগেই বলেছি—লেডী-ফোর্ডের মেয়েটার জন্য কিছু দয়া ছিলো। রডার তখন পথের ভিখারীর অবস্থা। তখনও তাকে সুন্দর দেখতে। অনেকে তাকে কিছুদিন রাখলো। মজা হচ্ছে ঐ ছোটো জায়গায় ও কতোজনের হাত-বদল হবে? বেশ্যার মতোই তার অবস্থা। পুলিশও সময় বুঝে ঝামেলা আরম্ভ করলো। ঠিক এ-সময় ভাগ্যই আবার তাকে ওপরে তুলে দিলো। লেডী-বারফোর্ড-ই চিঠি দিলেন। চিঠির সংগে ভাড়া। কিংসটনে "ব্লু হিলস" হোটেলে সম্বর্ধনা-কারিণীর চাকরী। রডা চলে গেলো আর মনেহয় আমিও ঐ সময় রোডেশিয়ায় বদলী হয়ে গেলাম।"

কথায় কথায় ওরা তখন গেটের কাছে চলে এসেছেন। শান্ত্রীরা প্রস্তুতির ভংগীমায় দাঁড়িয়ে। রাজ্যপাল তাদের স্বাভাবিক হতে নির্দেশ দিয়ে বল্লেন—হ্যাঁ, গল্পটা ওখানেই শেষ। ভাগ্যের শেষ খেলায় রডাই জিতলো। একদিন কানাডার এক কোটিপতি ব্লু-হিলস্ হোটেল শীত কাটাতে এলো। কানাডায় ফিরে যাবার সময় রডাকে সে নিয়ে গেলো আর বিয়েও করলো। তারপর থেকে তারা সুখেই আছে।"

"বাপ্‌রে! এ-রকম ভালো তো প্রায় দেখাই যায় না।"

॥ ষড় ॥

এডগার ওয়ালেশ, সম্পাদিত

ওরা মোটরে ফরাসী দেশে বেড়াচ্ছিলো তখন। গ্রামের এক মনোহারী দোকানে দুপুরের খাবার কিনতে থামলো একসময়। মনোহারী দোকানে "মেইরী"-র চূণকাম করা দেওয়ালে প্রবেন্স দেশের সূর্য-তাপে রং-ওঠা পোষ্টার ছিলো একটা। পোষ্টারটা "জ্যাক" সার্কাসের বিজ্ঞাপন।

"আচ্ছা!" বল্লে প্যাট্রিক পেট্রেল্লা, "শ্যাম বর্ণার কী ঐ সার্কাসটা এখনো চালাচ্ছে। মনেহয় না। যদি বেঁচে থাকে কম করেও ওঁর বয়স হবে আশী।"

"তোমার স্বপ্নের কথাট এখন বলোনা—গো" গলায় যতটা উৎসাহ থাকা সম্ভব সবটা ছড়িয়ে বৌ জেন বলে উঠলা।

ইতঃস্তত করলো পেট্রেল্লা। বহুদিনের ব্যাপার। ঐ প্রথমবার সে বুঝেছিলো ঘৃণার কী অপরিসীম ক্ষমতা--ভালোবাসা যেখানে ব্যর্থ। সেই প্রথম সে দেখেছিলো হত্যার ষড়যন্ত্র। সময়ে সবই হারিয়ে গেছে সত্য, কিন্তু সবই মনে আসে স্নায়ুর মোচড়ে যখন দূরাগত খাঁচায় বন্দী কোনো সিংহের গর্জন শোনা যায়, বা একটা ভাঁড় অথবা অন্য কোথায় ছেঁড়া একটা সার্কাসের পোষ্টার সে দেখে।

"দুপুরে খেতে-খেতে তোমাকে সব কথাই বলবো", বল্লে সে, "জীবনে ঐ প্রথম আমি হত্যার সংস্পর্শে আসি, বয়স তখন আমার এগারো।"··· ···

সেই সময় কেন যে তাঁদের পরিবার পারাগঁনাতে ছিলো—সে জানে না। সে এটাও জানতো না তার ঠিক আগের গরমে কেনই বা তারা কারবো বা তার আগের গরমে ক্যাসাব্লাঙ্কাতে ছিলো। তার বাবা ছিলেন স্পেন সরকারের লোক। মোটামুটি এইটুকু সে বুঝেছিলো সরকারী কাজই তাদের পিরানীজ, পর্বতমালায় ফরাসী-তরফে এনেছিলো। বাস্তুহারাদের সংগে জড়িত কোনো কাজ ছিলো বাবার। অনেক সময় বাবা দলবল নিয়ে মোটরে করে পর্বতমালায় ঘুরে বেড়াতেন। সীমান্তের দু-দিকের ফরাসী কখনো বা স্পেনীয় পুলিশদের, পশুপালকদের অথবা অশ্বেতর পালকদের সংগে কথা বলতেন তিনি। অবশ্য বেশী-ভাগ সময়ই বাবাকে ফরাসী কমিশনার থেরোঁর সংগে কাজ করতে হতো।

বাবা থানাতে পুলিশ কমিশনারের সংগে যখনই কথা বলতেন তখন তার হতো "বামুন গেলো ঘর তো লাংগল তুলে ধর" অবস্থা।

জ্যাকের সার্কাসের চিরস্থায়ী আস্তানা ছিলো "শহীদদের চারণভূমি" নামে মাঠটা। এখান থেকেই জ্যাক সার্কাসের বিভিন্ন দল ও হরেক মজা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়তো ······পরাগিনা ছিলো তাদের কেন্দ্রবিশেষ। সার্কাস যখন ফাঁকা থাকতো তখনই তার বেশী ভালো লাগতো। সেই ভালো লাগাটা এই বয়সেও রয়েছে। আগষ্ট মাসেই সার্কাস ভালো জমতো। তার কাঁটায় ঘেরা জায়গায় তখন থাকতো—হরেক মজার যন্ত্রপাতি। একসারি তাঁবু— বেশী-ভাগই তার খালি। বড় বড় খাঁচায় বাঘ-সিংহ, ঘোড়ার আস্তাবল, কুকুরদের থাকবার জায়গা আর কিছু লোক। মনফ্রেডো আর রমন্। লোকে বলতো ওরা দু-ভাই। সার্কাসের ঘেরাটোপে ঠিক করে বলতে পারি না ওরা একমায়ের-পেটের ভাই, সৎ-ভাই কী আত্মীয়-স্বজন। দুজনেই জোয়ান, সুন্দর আর আকর্ষণীয়। বাঘ-সিংহ নিয়ে যাদের কারবার তাদের মতোই ওরা ছিলো গুণ্ডা-প্রকৃতির।

নেপলসের জেমিনিকো ষ্ট্রমবলী কুকুরদের দেখাশোনা করতো। বরংচ সত্যি করে বলতে গেলে কুকুরগুলিই ওকে চালিয়ে বেড়াতো। ও ছিলো পোলিও-রোগে খোঁড়া এক মানুষ। পোলিও-রোগে দুটো হাত আর একটা পা ষ্ট্রমবলীর ছিলো মরা ডালের মতো শুকনো। সার্কাসদল ওকে দিয়েছিলো গদীতে মোড়া একটা ঠেলাগাড়ী। দুটি এলসেসিয়ান কুকুরী পালা করে নিয়ে ঘুরে বেড়াতো ওকে। প্রথমদিনই ওকে ঠেলাগাড়ীতে কুকুর-টানা অবস্থায় ধুলায় ভরা চত্বরে ঘুরে বেড়াতে দেখেছিলো। ওর আগে ছিলো দুটো আর পেছনে ছিলো আর দুটো এলসেসিয়ান কুকুর। গাড়ীটাকে ঘিরে রেখেছিলো সেই-নৃত্য করা একপাল বড় বড় লোমওলা কুকুর।

প্যাট্রিক তার প্রাণের বন্ধু অগাষ্ট-এর বদান্যতায় কাঁটাতারের ভেতর ঢুকতে সুযোগ পেয়েছিলো। অগাষ্ট ছিলো অতিরিক্ত একজন ভাঁড়। অন্যসময় তার কাজ ছিলো ঘোড়ার দেখাশোনা করা। তার মধ্যে আবার মূল কাজ ছিলো রোজ আর মাগারেট নামের দুই ঘোড়ার তালিম দেওয়া। সাদা ধবধবে জাত-ঘোড়া ছিলো তারা, বিজ্ঞাপনে ওদের খ্যাতির ছিলো ছড়াছড়ি। কয়েক সপ্তাহের বিশ্রামে ছিলো ওই ঘোড়া দুটি। শ্যাম বর্ণার জ্যাক-পরিবারে বিয়ে করে সার্কাস-দলের মালিকের মতোই হয়ে গিয়েছিলো এবং দল পরিচালনা করতো।

ঐটাই হচ্ছে মালিকের ক্যারাভান" অগাষ্ট বল্লে,—"দেখবে না-কী এক চমক ?"

"খুব ভালো হয়, উত্তর দিলো পেট্রেল্লা,—যদি অবশ্য ও কিছু মনে না করে।"

"ডোনার সংগে লোকটা শহরে গেছে। নিনা হয়তো আছে। মেয়েটা কিছু বলবে না।"

সিঁড়ির ওপর উঠে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো তারা। দরজাটা যেন কাঠ চিরে তৈরী। এতো মোট, মজবুত আর টিকবেও অনেকদিন। ঐ তাঁবুর সব জিনিষের মতো দরজাটাও আশ্চর্য।

ঘরের ভেতরের আশ্চর্য সুন্দর জিনিষগুলি জীবনে প্রথম দেখলো প্যাট্রিক। সুন্দর আর বড় ঘরটা। তবু জিনিষপত্রে ঠাসা।

ঝকমক্ করছে জিনিষপত্র। পালিশ করা টীক্-গাছের টেবিল। কাবার্ড পেতলে মোড়া বাতিদান দরজা আর জানালা এবং জাহাজে দেখা যায় এমন ক্রোনোমিটার। ইস্পাতের কাজ করা লাল বেদী। ঘরের কোণায় লিওপোল্ড আর লোরেঞ্জো নামে দুজন হনুমান খাঁচায় বসা। এরা দুটো ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়। একটা কাঠের ওপর তারা তখন বসে। চোখ বড় বড় করে ফিরে তাকালো দুজনে যখন প্যাট্রিক একদৃষ্টিতে তাদের লক্ষ্য করছিলো।

লোরেঞ্জো চোখ কুঁচকিয়ে ওপরের ঠোঁটটা উল্টীয়ে দিলো। "আমাকে ঠাট্টা করছে" প্যাট্রিক বল্লো।

"আমাকে ঠাট্টা করছে" তার পেছন থেকে গম্ভীর একটা স্বর বলে উঠলো। ঘুরে তাকালো প্যাটিক। দরজার পাশে তার জীবনে দেখা সবচেয়ে একটা বড় টিয়া পাখী টেবিলে বসে।

সমস্ত গায়ের রং তার কালো-সবুজ কেবল পায়ের পালকের রং আলাদা। মাথাটা তার অপরদিকে ঘোরানো। মাত্র একটা হলদে গোল চোখ ছেলেটার দিকে ফেরানো।

"আরে বাপ..." চিৎকার করে উঠলো প্যাটিক", কী সুন্দর ?"

"কি সুন্দর!" গদ-গদ ভাবে বল্লো পাখীটাও। ক্যাবার্ডের দাঁড় থেকে পরিষ্কার ভাবে নেচে নেমে জানলার বসবার জায়গায় সরে এলো পাখীটা।

"চুপ করে দাঁড়াও", অগাষ্ট-এর অনুরোধ, "একদম চুপ। ওর তোমায় পচ্ছন্দ হয়েছে, মনে হচ্ছে।"

"কী বলছে ?" আমতা-আমতা করে প্যাটিক, "না-হলে কী করতো ?"

"কাণ কেটে নিতো," উত্তর করলো অগাষ্ট, "বিশ্বেস না হয় জিজ্ঞেস করো

মনফ্রেডো বা রমণকে। ওদের সংগে নেইরের দা-মাছ সম্বন্ধ। পাখীটাকে ওরা ক্ষেপাতো। লেজের পালক তুলে দিতো। মনফ্রেডো'র বড়ো আংগুল কামড়ে দিলো একদিন। আর একটু হলেই কাটা যেতো পুরো আংগুলটা।

ভালো করে পাখীটা লক্ষ্য করলো প্যাট্রিক। ভয়ে তার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ। টেবিলে সরে সরে তার কাছে চলে এলো একসময়। সবসময় চলদে চোখে পলকহীন নজর রেখে। তারপরই মাথাটা হটাৎ নামিয়ে দিলো সামনে। প্যাট্রিকের রুমালের একটা কোণা ধরে নিয়ে তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ রুমালটা বারকরে নিলো।

"এই!" প্যাট্রিক বল্লো।

"এই!" টিয়া পাখীটা বল্লে এবার। রুমালটা ফেলে দিয়ে খিল্-খিল্ করে হেসে উঠলে।

"দেখলে তো তোমাকে কেমন ভালোবাসে", এবার বল্লো—লম্বা পা-ওলা কালো-চুলো একটি মেয়ে ক্যারাভানের পেছন থেকে উদয় হয়েছিলো যে। বোধহয় শোবার ঘর সাফ-সুতরো করছিলো। "যদি সে তোমার কিছু তোলে তবে বুঝতে হবে পছন্দ হয়েছে ওর।"

একটুও ভড়ং না দেখিয়ে তুলে নিলে সে টিয়াপাখী। একহাতে ধরে অন্য হাতে মাথার পালকগুলি ঠিক করলো।......

"ঐ হচ্ছে নিনা" অগাষ্ট বল্লো, "মজার মেয়ে। সবাই ওকে ভালোবাসে। কাকেও ওর ভয় নেই।"

যদিও তার বয়স সবে দশ বছর। সবদিকেই খেয়াল তার। নিনার "সকল" কথার মধ্যে নিশ্চয়ই সে চু-পেয়ে জন্তু মানুষের কথাও বলতে চাইছে। সত্যি সুন্দর মেয়েটা।

পরের সপ্তাহটা ছিলো অনাবিল আনন্দের। ষ্ট্রমবলী এড়িয়ে গেলো। নিনা আর অগাষ্ট উৎসাহ দিলো—আর সেও "জ্যাক সার্কাস" ভালোভাবে ঘুরে ঘুরে দেখে নিলো। রমণ আর মনফ্রেডোকে অবশ্যই এড়িয়ে। দূরে সময়োচিৎ শ্রদ্ধার সংগে সার্কাসের মালিক শ্যামবর্ণার আর তাঁর বৌ ডোনাকে লক্ষ্য করলো সে একদিন। এরা তো হলো মানবজাতি। পেয়ে বসলো তাকে জন্তুরা। বিরাটাকার ছটা এলসেসিয়ান কুকুর—যারা ঐ সার্কাস রাজ্যে পুলিশবাহিনী বিশেষ। আর নাচন-কদন মত্ত লোমওলা কুকুরের দল হলো গুপ্তচর-বিশেষ। বুড়ো ঘোড়া-বাহিনী,—এদের কাজ শক্তিগত। দিনের বেলায় সার্কাসের মাঠে চরে বেড়ায় আর রাতে শ্যাম বর্ণারের সামনের ঘোড়াশালে বাঁধা থাকে।

সার্কাস-রাণী রোজ আর মার্গারেট এদের আলাদা কুটির। ঘরের ওপরে চৌকাঠে আছে কাঠের ফলকে ওদের নাম। ঘেরাটোপের দূরের দিকে খাঁচায় আছে বাঘ-সিংহ। বিরক্ত না করে যাদের দেখাশোনা করে রমণ আর মনফ্রেডো। টাট্টু-ঘোড়ার আস্তাবলের ওপরের তাকে থাকে একঝাঁক সাদা ঘুঘু। শিস্ দিলেই এরা নিনার কাছে ছুটে আসে।......লিওপোল্ড আর লোরেঞ্জো বলে হনুমান দুটো টাট্টু-ঘোড়া চালায় আর সার্কাস দলের যে কোনো ছেলের মতো ওদের দেখাশোনা করতে পারে। ঐ হনুদের বাসস্থান হলো শ্যামবর্ণারের বসবার ঘরের খাঁচায়।

ওদের লম্বা চামড়ার দড়িতে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হতো প্রতিদিন বিকেলে। আর ছিলো টিয়াপাখী—নেষ্টর নাম তার। জ্ঞানী, একশো বছরেরও বেশী বয়স।

ঐ সপ্তাহের শেষে রবিবার দিন সকালে মঁসিয়ে থেঁরো প্যাট্রিকের বাবার সংগে দেখা করতে এলেন। ফরাসী-দেশীয় অনুশাসনে তৈরী অন্ধকার আর বিচ্ছিন্ন ঘরে ওদের আলোচনা চল্লো। মাঝ-বয়সী বাদামী রংয়ের ছোট্টো দাড়ি থুতনীতে। লোক ভুল বোঝে এমনই ঠাণ্ডা চেহারা। এই চেহারার জন্য পরের দিকে জার্মানরা ঠকেছিলো। পরিবারের কিছু ফটো আছে এমন একটা টেবিলের আড়ালে লুকিয়ে রইলো প্যাট্রিক। আলোচনা শুনে সে ভয়ে আঁৎকে উঠতে লাগলো।

"মারা গেছে", মঁসিয়ে থেরোঁ বল্লেন, "এক আঘাতের চোটেই খুলি ফেটে চৌচির।"

"কতোক্ষণ মারা গেছে?"

"সকাল ছটায় মৃতদেহটা আবিষ্কার করা হয়েছে। ডাক্তার বল্ছে অন্ততঃ পাঁচ ঘন্টা আগে ওকে মারা হয়েছে। খুব জোর করে সাত ঘন্টা।"

"মাঝ রাতের পর মারা গেছে তাহলে?" প্যাট্রিকের বাবা বল্লেন এবার।

প্যাট্রিক আগের আলোচনার খণ্ড খণ্ড ঘটনা শুনেছে কেবল। প্রথমে সে ভেবেছিলো বাস্তুহারাদের কথা হচ্ছে। আগের ঘটনার যদি কিছু শোনা যেত। ব্যাপারটা সার্কাস নিয়ে। ওদের দলের কেউ খুন হয়েছে।

"ভাইকে আটক করেছি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য।"

তাহলে মনফ্রেড বা রমণকে নিয়ে ব্যাপার। আশস্ত হলো প্যাট্রিক। অগাষ্ট,—নিনা—ট্রমবলীদের মধ্যে কেউ হলে বা রাজার চালচলনসম্পন্ন শ্যাম-

বর্ণার বা তার ছোটো বৌটার ব্যাপার নয় এসব। যদি কাউকে মরতে হয় তাহলে বুনো স্পেন-দেশীর মধ্যে কারোর মরাই ভালো।

"কিছু প্রমাণ করাই কষ্টসাধ্য—" বল্লেন মঁসিয়ে থেরোঁ। জায়গাটা কাঁটা-তার দিয়ে ঘেরা অবশ্য। কিন্তু কাজের লোক বেড়ার যে কোনা জায়গায় পার হতে পারে।

"রমণকে সন্দেহ করার আপনার বিশেষ কোনো কারণ আছে কী?"

"এই স্পেনের লোকগুলি", মঁসিয়ে থেরোঁ বল্লেন, আর তারপরই চেপে গেলেন। কারণ এরপর ঝুড়ি খুলতে গেলে সাপ-ব্যাং কী বেরিয়ে পড়বে কে জানে?

"জন্তু-জানোয়ারের মতো ব্যবহার", প্যাট্রিকের বাবা সম্মতি জানালেন। "কিন্তু এই ঠাণ্ডা-মাথায় খুনের পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে।"

"এই দুই ভাই আলজেরিয়ার কফিখানায় মদ নিয়ে বসেছিলো। কফিখানাটা নদীর ধারে। প্রায় রাত এগারোটা পর্যন্ত মদ নিয়ে হুল্লোড় করে দু-ভায়ে। একসময় ওরা উত্তেজিত হয়ে চিৎকার শুরু করে দ্যায়। আলাদা আলাদাভাবে ওরা উঠে আসে। এতোদূর পর্যন্ত এগিয়েছি আমরা।

মঁসিয়ে থেঁরো চলে গেলে প্যাটিক তার বাবাকে বল্লো,—"এটা ঠিক নয়।"

"কোনটা ঠিক নয় প্যাট্রিক?"

"হুট করে কোনো লোক তারকাঁটার বেড়া ডিংগিয়ে সার্কাসের মাঠে গিয়ে ঢুকবে, এটা ঠিক নয়। দিনের বেলায় এটা কষ্টকর, আর রাতে অসম্ভব।"

"কেন?"

"কুকুর আছে। দেখবে একবার চেষ্টা করে?"

বাবা ছেলের দিকে যত্ন করে লক্ষ্য করলেন। বল্লেন, "সরকারী ভাবে এখানে আমি কিছু করতে পারি না। মঁসিয়ে থেঁরো বন্ধু হিসেবেই আমার সংগে আলাপ-আলোচনা করেন। এবং আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা তাঁর কিছুটা ক্ষমতার বাইরেও। কারণ এখানে জড়িত আছে দু জন স্পেনদেশীয় লোক, একজন ইয়র্কশায়ার। তার আবার মিলনের বৌ সংগে। একজন নিওপোলিটন, বেলজিয়ামবাসী অপর জন আর শেষমেষ স্থানীয় এক মেয়ে।"

হাঁ হয়ে গেলো প্যাট্রিক।

"কিন্তু তুমি এতোসব জানলে কী করে?"

"কারণ তুমি-ই এদের সম্বন্ধে আমার কাছে দিনের পর দিন বলেছো।"

"হ্যাঁ আমি বলেছি," উত্তর দিলো প্যাট্রিক "কিন্তু তুমি তো ও-সব কানে তোলোনি।"

"তুমি বড় হয়ে যখন পুলিশ হবে," বাবা বল্লেন, "না শোনার ভাণ করলে আখেরে তুমিই লাভবান হবে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম—এই খুনের ব্যাপারটায় আমার কিছুই করবার নেই। কিন্তু তুমি যা বল্লে যদি তা সত্যি হয় ভাববার ব্যাপার তাহলে। আর এর সমাধান করতে হলে বিজ্ঞান-সম্মত ভাবেই করা উচিৎ। রাতের খাবার পর চলো আমরা একবার বেড়িয়ে আসি।"

সাবধান হয়ে "শহীদদের চরণ ভূমিতে" তাঁরা পেছন দিক থেকে এগিয়ে গেলো। সুন্দর রাত একটা। আকাশে অর্ধ চন্দ্র। তাদের আগে যন্ত্রপাতিতে বোঝাই চালাটা দেখা যাচ্ছে। আর সামনে কী আছে দেখতে দিচ্ছে না। কোনায় কাঁটাতার একটা লোহার পোষ্টে ঠেকা দেওয়া হয়েছে।

"এটাই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো জায়গা," প্যাট্রিকের বাবা বল্লেন। গলা নামিয়ে বল্লেন এবার, "ওপারে যাবে কে তুমি না আমি?"

"আমি গেলেই ভালো, ওরা আমাকে চেনে।" প্যাট্রিক বল্লো।

কাঁটা-তার সিড়ির মতো ব্যবহার করে এক সময় সে ওপারে উঠে গেলো। চালার ওপরটা ধরে যখন সে নিজেকে ঠিক রাখছিলো তখনই শোনা গেলো একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার। প্যাট্রিক লাফিয়ে মাটিতে নামার সংগে সংগে দুটো কালো জিনিষ চালা ঘরটায় কোনায় রূপ নিলো।

চালা-ঘরের পেছন থেকে বেরিয়ে এলো প্যাট্রিক। একেবারে চাঁদের আলোর সামনে। ইতঃস্তত করলো এলসেশিয়ান কুকুরগুলো। ছেলেটাকে দেখতে আর গায়ের গন্ধও বলছে ও যেন চেনা শোনা। কিন্তু ব্যবহারটা যেন কেমন। একটা ছোটো কালো কুকুর দৌড়ে গেলো। ঝুঁকে দাঁড়ালো আর প্যাট্রিক তখনই হাত বাড়াতে ওর হাতে উঠে গেলো। এরপরই আরম্ভ করলো মুখ চাটা। এলসেসিয়ান গুলির আর কোনো আগ্রহ নেই। ঠিক ঠিক কুকুরটা যখন আগন্তুককে সনাক্ত করেছে তাহলে তো মিটেই গেলো। খেলনার কুকুরটা আস্তে করে মাটিতে নামিয়ে প্যাট্রিক বাবার কাছে ফিরে এলো।

"দেখলে তো?" বল্লে সে।

"হ্যাঁ," বল্লেন বাবা, "ঠিক আছে।"

আইনের গতি কখনোই দ্রুত নয়। প্রায় এক সপ্তাহ পরে শ্যাম বর্ণারের স্ত্রী তাঁদের সঙ্গে দেখা করলো। ডোনা বর্ণারের বয়স মাত্র পনেরো বছর ছিলো যখন শ্যাম্ তাকে বিয়ে করে আর "জ্যাক সার্কাসের" অংশীদার হয়। পঁচিশ বছরের

বিবাহিত জীবন আর তিন তিনটি সন্তানের জন্ম দেওয়াতে চেহারা এখন তাঁর গোল। মুখের কয়েকটা কোঁচকানো জায়গা আরো কিছু বয়সের ছাপ এঁকে দিয়েছে। কেবল দুঃস্বপ্নের মতো গত সপ্তাহ ছাড়া জীবন তাঁর সুখেই কেটে গেছে। কিন্তু এখন ভয় পেয়ে গেছেন তিনি। ইয়র্কশায়ারের স্বরবর্ণ আর উত্তর ইটালীর টানের জগা-খিচুরিতে বল্লেন, ওরা স্যামকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ধরে নিয়ে গেছে। আজ সকালে আমাকেও দেখা করতে দিচ্ছে না। ওঁরা বিরাট একটা ভুল করেছে।"

প্যাট্রিকের বাবা ডোনাকে বসতে দিলেন। তারপর চালালেন কথাবার্তা। মনে মনে প্যাট্রিক বাবার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলো। কী করে তিনি একটাও প্রশ্ন না বুঝতে দিয়ে পেট থেকে সব বার করছেন।

প্রথমে পুলিশ রমনকে সন্দেহ করে। দুর্ধর্ষ মানুষ সে। মদ টানছিলো। মনক্রেডোর সঙ্গে তাকেই শেষমেষ দেখা যায়। কিন্তু এই খুনের ব্যাপারে কোনো হাত নেই তার। কফিখানা ছাড়বার পর একটা জানা মেয়ের ঘরে জোর করে ঢোকবার জন্য একটা গোলমালের সৃষ্টি হয়। ডাকা হলো পুলিশ। পুলিশ ডেকে হাজতে পোরা হয় তাকে। কিন্তু পরে আসল ব্যাপার বেরুলে ছেড়ে দেওয়া হয় তাকে।

"আমি হলে ওকে এতো তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতাম না," প্যাট্রিকের বাবা মন্তব্য করলো, "আচ্ছা ঠিক কোন্ সময় ঐ সুবিধাজনক গোলমালটা সে তুলেছিলো?"

ঠিক বলতে পারেন না ডোনা বর্ণার। তিনি শুধু এইমাত্র জানেন মুক্তি পেয়ে রমন খুনীর পাত্তা চালাবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে। আর সন্দেহ-ভাজন লোকদের সংখ্যা-ও খুব কম। খুনটা হয়েছে টাট্টু ঘোড়াদের থাকবার চালাটার বাইরে। কুকুরগুলি থাকবার দরুন, কোনো লোকের পক্ষেই সার্কাসের মাঠের মধ্যে ঢুকে পরা সহজ নয়।

সম্মতি জানালেন প্যাট্রিকের বাবা। হ্যা, তিনিও কুকুরদের কথা জানেন। আইন সম্মত ভাবে তখন কার সার্কাসের মাঠের ভেতর থাকবার কথা? উত্তরটা সোজা। স্ট্রমবলীর থাকবার কথা। কিন্তু রুগ্ন হাতে একটা হাতুড়ী তুলে ধরা সম্ভব নয়। স্লেজ হাতুড়ী তো দূরের কথা। অগাষ্টের ক্যারাভান মাঝে। ডোনা আর তাঁর স্বামীর ক্যারাভান দূর প্রান্তে ঠিক টাট্টু-ঘোড়াদের সামনে। অন্য ক্যারাভানগুলি ফাঁকা। কারণ তাদের লোক অন্য জায়গায় খেলা দেখাতে

গেছে। রমন আর মনফ্রেডোর ক্যারাভান হচ্ছে দূরে বাঘ-সিংহদের খাঁচার কাছে। যেহেতু ঐ জন্তুগুলি তাদেরই তত্ত্ববধানে।

প্যাট্রিকের বাবার হাতে ছিলো একটা পেনসিল। লেখার আঁকি-বুঁকি কাটছিলেন তিনি ভদ্রমহিলার কথার সঙ্গে সঙ্গে। একটা বর্গক্ষেত্রের তিন দিকে তিনি চিহ্ন রাখছিলেন আস্তবেলের, কুকুরদের আস্তানা, যন্ত্রপাতির ঘর, খাঁচা। আর সবচেয়ে ওপরে রাখলেন ক্যারাভ্যানগুলির সারিবদ্ধ চিহ্ন। বল্লেন তিনি, "নিনার ব্যাপারটা ?"

"আপনি জানলেন কী করে নিনার কথা ?" জিজ্ঞাসা করলেন ডোনা, "ও আচ্ছা," আর তখনই দেখলেন প্যাট্রিককে। সে তখন তার পছন্দ মতো জায়গা—ঘরটার কোনায় বসে। "ছেলেটা বলেছে তাহলে। সার্কাসের সকলেই ওর বন্ধু। নিনার পক্ষে সম্ভব না। এ জায়গারই মেয়ে সে। বাড়ীতে থাকে রাতে।"

প্যাট্রিকের বাবা পরপর কতোগুলি তীর চিহ্ন আঁকলেন তাঁর ছবিতে। একটা তীর দেখালেন চালা ঘরের পেছন থেকে কুকুরদের আস্তানার দিকে। অপর একটা তীর দেখালেন কুকুরদের আস্তানা থেকে টাট্টু ঘোড়াদের আস্তাবলের দিকে। তৃতীয় তীরটা দেখালেন আস্তাবল থেকে ক্যারাভ্যানের দিকে।

"সুতরাং হয় অগাষ্ট অথবা আপনার স্বামী," বল্লেন তিনি।

"অগাষ্টের কাজ হলেও হতে পারে," জানালেন মঁসিয়ে থেঁরো, "যদিও সে নল খাগরার মতো সরু, অবশ্য শক্ত। কবজি আর হাতের সামনের দিকে অসম্ভব জোর। প্রায় সমস্ত সার্কাসের ক্লাউনদের এটা থাকে। শিক্ষানবিশীর সময় যখন তখন পড়ার জন্য এটা-ওদের বানাতে হয়। হ্যা, ওরও একটা উদ্দেশ্য আছে। কিছু দিন আগে নিনার ব্যাপারে অগাষ্ট হস্তক্ষেপ করেছিলো মনফ্রেডোর অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে। ফলে অগাষ্ট ভালো মতো চোট পায়।"

"তারপর ?" বল্লেন প্যাট্রিকের বাবা।

'তারপক্ষে সৌভাগ্য আর বর্ণার-এর পক্ষে দুর্ভাগ্য যে সে রাতে সে সার্কাসের মাঠের ধারেকাছেও ছিলো না। এর পক্ষে প্রমান ও আছে।" চোখের কোনা দিয়ে ওর বাপ প্যাট্রিককে লক্ষ্য করলেন। বল্লেন তারপর, "অাগষ্ট নিনার সংগে তার বাড়ীতেই রাতে ছিলো।"

প্যাট্রিকের বাবা বল্লেন, "বুড়ো ধাড়ী এখান থেকে সরে যাও।" হাসলেন থেঁরো, "কী যা তা বলছো," অধৈর্যের সঙ্গে প্যাট্রিক বলে উঠলো, "কেন,

আমরা সকলেই জানি নিনা হচ্ছে অগাষ্টের প্রেমিকা। তাই তো সে নিনার পেছনে লেগে থাকতো আর ফলে মনফ্রেডোর সঙ্গে লাগতো টক্কর। মনফ্রেডো ওকে নিজের জন্য চাইতো। আমি এ ব্যাপারে মুখ খুলতে চাইনি কারণ আমি নিশ্চিত নই যে ওটা ঠিক এলিবি কী না। মন্দা কথা, মেয়েটা যদি ওকে ভালোবাসে তাহলে সে তো বলবেই যে অগাষ্ট আমার সঙ্গে ছিলো। বলবে না কী?"

হাসলেন মসিয়ে থেঁরো, বল্লেন, "খুব সত্যি। কিন্তু নিনা যে বাড়ীতে থাকে সেই বাড়ীর লোকেই এটা বলেছে। অগাষ্ট রাত দশটার সময় নিনার বাড়ীতে যায় এবং ফেরে পরের দিন সকাল ছটায়।"

"ভালোবাসার নিরাপত্তা বিরাট জিনিষ," বল্লেন প্যাট্রিকের বাবা, "তবুও তাকে রাতে মাঝে মাঝে অগাষ্টের সঙ্গে থাকতে হবে।"

"মানলাম," বল্লেন মঁসিয়ে থেঁরো, "ঘুমোবার আগে পর্যন্ত দুজনকে হাসতে, গল্প করতে শুনেছে একজন বৌ। মনে রাখবেন মনফ্রেডো একটার আগেই মারা গেছে।"

"বৌ-টা কী অগাষ্টকে দেখেছিলো? না শুধু তার গলাই শুনেছিলো।"

"গলা শুনেছিলো," বল্লেন মসিয়ে থেঁরো, "আপনি কী বলতে চাইছেন?"
"অগাষ্টের গলাটা কৌতুকময় উচ্চ গ্রামের। সহজেই নকল করা যায়।"

"হ্যা, একটা কথা বটে," এবার বল্লো প্যাট্রিক, "আমি নেষ্টরের কথা বলছি, সে হচ্ছে বর্ণারের টিয়া—ঠিক গলার স্বর নকল করে দেবে।"·········

মঁসিয়ে থেঁরো ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন।

"মশাই, আমি যুক্তি তর্ক মানি।" বললেন তিনি, "যদি আমরা ধরেনি রাতের বেলায় অপরিচিত কেউ সার্কাসের ময়দানে ঢুকতে পারবে না, তাহলে ব্যাপারটা এই দাঁড়ালো,—একটা মানুষকে আঘাত করে মারা হলো কোনো ভারী অস্ত্র দিয়ে। খুব সম্ভবত জিনিসটা ধাতুর তৈরী আর গোলাকার। ময়না তদন্তে এটা বলা হয়েছে। বোধহয় হাতাওলা হাতুড়ী। মৃত মানুষটা হলো একটা গুণ্ডা লম্পট। আঘাত হয়তো যে কেউ করতে পারে। কখন আঘাতটা করা হয়েছিলো? এগারোটা থেকে একটা। ডাক্তারের কথা। ওর থেকেও বড় প্রমাণ আমাদের আছে। ট্রমবলী মনফ্রেডোকে মাঠে ফিরতে শুনেছিলো।"

পিতা-পুত্র তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ওঠালো "হ্যা। এটা ঠিক। আমরা আজ সকালে এটা শুনলাম। বুড়ো-টা ওর কুকুর নিয়ে শুয়ে থাকে। তীক্ষ্ণ শ্রবণ শক্তি সম্পন্ন কুকুর। তারা ওকে মাঝরাতে জাগিয়ে দিলো। ট্রমবলী মন

ফ্রেডো-র গলা শুনলো। সার্কাসের লোকেরা বেশী রাতে ফিরলে গেট ব্যবহার করে না। পেছনে তার-কাঁটা বেড়ার মধ্যে টপকাবার জায়গা আছে।"

"সে নিশ্চয়ই ভেবেছিলো রোজকার দেরী করে ফেরবার দুজনের মধ্যে একজন," প্যাট্রিকের বাবা বল্লেন, "কিন্তু মন ফ্রেডো-ই যে লোকটা বুঝলো কী করে ?"

"মনফ্রেডোর গলার স্বর। সে ছিলো তখন মাতাল। নিজের সংগে নিজেই কথা বলছিলো জোরে জোরে।"

"ষ্ট্রমবলী কী বাইরে গিয়ে দেখেছিলো ?"

"সে বলছে না। সে মনফ্রেডো-র কোনো ব্যাপারেই যেতে চায় না, বিশেষ করে যে যখন মাতাল।"

প্যাট্রিকের বাবা তাঁর আঁকা-টা বার করলেন এবং চিহ্ন দিলেন যন্ত্র-রাখবার চালা-টার পেছনে।

"যন্ত্র রাখবার চালা-টার পেছনের দিকের বেড়ায় মনফ্রেডো বেড়া পার হয়। ঠিক এই জায়গায়। চালার শেষ দিকে। বেরিয়ে ষ্ট্রমবলী আর কুকুরদের পাশ কাটিয়ে—তাই তো ? আর খোলা জায়গার মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হবে, যেদিকে রয়েছে উত্তরের ক্যারাভ্যানের সারি।"

মঁসিয়ে খেঁরো যোগ করলেন, আর এই ক্যারাভ্যানগুলি। মনে রাখবেন মশাই। এই বিশেষ সময়টায় সব ফাঁকা কেবল একটা ছাড়া। শেষের ক্যারাভ্যান-টা ছাড়া। ওখানে থাকেন সস্ত্রীক বর্ণার। মনে কল্পনা করুন—বর্ণার এই লোকটাকে এগোতে শুনলো। টলতে টলতে ফাঁকা জায়গা দিয়ে। সে দেখলো তাঁর সুযোগ। সে বিরাট হাতুড়ী-টা-তুলে নিলো। গুঁড়ি মেরে এগোলো তাঁর পেছনে। একটা আঘাত। ব্যস্, সব শেষ।"

"কিন্তু কেন ? কেন সে এটা করবে ?"

"হ্যাঁ, তার ও কারণ আছে। সমস্ত সার্কাসের লোকেরা তা জানে। মনে হয় আপনার বাচ্চা-টাও তা জানে।"

প্যাট্রিক তার বাবার দিকে তাকাতে, বল্লেন, "বলো,"

"দশ দিনের আগের ব্যাপার," বিষাদের সুরে প্যাট্রিক বল্লে, "মনফ্রেডোর মরবার ঠিক তিন দিন আগে। নিনা লিওপোল্ড আর লরেঞ্জোক বিকেলে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছিলো নিত্যকার মতো……। লোরেঞ্জো দড়ি ফসকে পালায় একসময়। তারপর মনফ্রেডোর কামরায় ঢুকে একটা কমললেবু চুরি করে। দুজন হনুমানই ধূর্ত চোর। মনফ্রেডোর তাড়া খেয়ে লোরেঞ্জো গাছে গিয়ে

ওঠে। তারপর কমলালেবুটা খেয়ে মনফ্রেডকে খোসা ছুঁড়ে মারে। সকলেই হাসছিলো—অবশ্য মনফ্রেডো ছাড়া। রাগে পাগল সে তখন। তারপর ছুটে গিয়ে বাঘ-সিংহকে মারবার বড় চাবুকটা নিয়ে আসে। এলোপাথারি মার চলে লরেঞ্জোর ওপর। আর একটু হলেই লেজ-কাটা পড়েছিলো তার।”

“আপনি কী মনে করেন,” তার বাবা বল্লেন, “ঐ ব্যাপার একটা হত্যার উপযুক্ত কারণ?”

“সার্কাসের লোকেরা তাদের পোষা জন্তুদের সন্তানের মতো ভালোবাসে,” বল্লেন মঁসিয়ে থেঁরো, “মনে করুন কেউ আপনার ছেলেকে ছপ্‌টি দিয়ে মারলো—”

“তাছাড়া জন্তুগুলি খুবই কাজের।” প্যাট্রিক বল্লো, “ওরা রোজ আর মার্গারেটকে চালায়। আর এটা সার্কাসের আকর্ষণের কারণও বটে একটা। খুবই চালাক ওরা। ঠিক জকির মতো। পনেরো বছর লেগেছে স্যামের ওদের উপযুক্ত তালিম দিতে।”

চেপে গেলো প্যাট্রিক। হঠাৎ-ই তার মনে হলো সে বোধহয় বেশী কথা বলছে। তার বাবা আবার ছবিটা নিয়ে পড়েছেন, বল্লেন তিনি, “একটা জিনিষ আমি বুঝতে পারছি না, “মনফ্রেডো কেন আস্তাবলের সামনে মারা পড়লো।”

“আপনি কী মনে করছেন,” বল্লেন এধার মঁসিয়ে থেঁরো, “কোনো একটা ঘোড়া ওকে লাথি মেরেছে। আশ্বস্ত হচ্ছি এটা সম্ভব নয়। যদি না তার অবশ্য রবারের মতো বাড়াবার উপযুক্ত পা থাকে। সবচেয়ে কাছের ঘোড়াটা তার কাছ থেকে অন্তত দশপা দূরে ছিলো দরজার কাছ থেকে বাঁধা অবস্থায়।”

“আমি এটা ভাবছিনা। লোকটা ওখানে কী করছিলো। তার ক্যারাভ্যান তো অপর দিকে। খোলা মাঠ পার হয়ে সোজা সে নিজের আস্তানায় তো ঢুকবে। কেন সে বাঁ-দিকে মোড় নিয়ে আস্তাবলের দরজার দিকে চল্লো?”

“কে জানে?” বললেন মঁসিয়ে থেরোঁ। “মাতাল হবে হয়তো রাস্তা ভুল করেছিলো।”

“হতে পারে,” প্যাট্রিকের বাবা বললেন। “তবুও ব্যাপারটা অদ্ভুত।” বাবা চিন্তায় ভ্রুকুটি করলেন প্যাট্রিক স্পষ্ট বুঝলো। বললেন, “আমিও যুক্তি মানি। আমার মনে হয় একমাত্র বর্ণারের পক্ষেই এটা সম্ভব। হয়তো ওর বৌ সাহায্য করেছে—কিন্তু সে আমাদের ব্যাপার নয়।......”

বোঝা গেলো মঁসিয়ে থেরোঁ ব্যাপারটা সম্বন্ধে কিছুই ভাবেন নি।

"দুজন লোক ছিলো এই খুনটার সংগে। বেশী লোকও হতে পারে। অগাষ্ট আর টিনা দুজনের মিলিত সম্ভাবনাই বেশী। অগাষ্টকে রাত এগারোটার পর কেউ-ই দেখেনি। মৃত-লোকটাকে কেউ নামধরে ডেকে উঠলো। আমরা জানি টিয়াটা—ঐ সামান্য পাখী কণ্ঠস্বর নকল করতে পারে। তাহলে একটা মেয়ের কাছে ব্যাপারটা কীরকম সোজা?"

এবার ভ্রুকুটি করে মঁসিয়ে থেরোঁ বললেন, "অগাষ্ট, যাই বলুন না কেন, শারীরিক ভাবে কাউকে খুন করতে সক্ষম নয়।"

"ঠিক। তাহলে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা শুনুন, আর সেটা হলো রমণ। ভাইয়ে-ভাইয়ে গণ্ডগোল কতো চরম হতে পারে! কেন কী এবেলকে হত্যা করেনি?"

"কিন্তু—"

"কিন্তু তখন সেই মাঝরাতে রমণ ছিলো পুলিশ-হাজতে।" "নিশ্চয়ই" মনে করুন রমণ ভাইয়ের পেছনে পেছনে গিয়ে সার্কাসের ময়দানে হত্যা করলো আর ঠিক তার পরেই এমন কিছু করলো যাতে সে গ্রেপ্তার হয়। ঐ যে গণ্ডগোলটা সে পাকিয়েছিলো। ঐ সময়ে ওটা কেমন যেন সন্দেহজনক!

"কিন্তু—"

"কিন্তু আমাদের বলা হয়েছে মনফ্রেডো রাত বারোটায় জীবিত ছিলো। কে বলেছিলো? ষ্ট্রমবলী বলেছিলো। কিন্তু কে বলতে পারে যে এর মধ্যে ষ্ট্রমবলীও নেই। রমণ আর ষ্ট্রমবলী দুজনে মিলে—"

"ষড়যন্ত্র," বললেন মঁসিয়ে থেরোঁ। তিনি যেন কিছুটা অসুখী। তিনি ভেবেছিলেন তাঁর সমাধানটাই যথাযথ। কিন্তু শেষে গিয়ে দাঁড়ালো তিনটি সম্ভাবনার মধ্যে সেটি একটি হতে পারে।

"আমি চতুর্থ সম্ভবনার কথা বলতে," প্যাট্রিকের বাবা এবার যোগ দিলেন। এতে রমণ ষ্ট্রমবলী আর শ্যামবর্ণার তিনজনেই আছে।"

"উহু, না," প্রতিবাদ করলেন মঁসিয়ে থেরোঁ, "তিনটা সম্ভাবনাই যথেষ্ট। আপনার কথায় আমার সমাধানটায় সন্দেহ জাগছে। আমি বরংচ শ্যামবর্ণাকে ছেড়ে দেই। একটা নিরীহ লোককে ধরে রাখা ঠিক নয়। আবার উল্টোভাবে ওকে ধরে রাখাটাও যুক্তিযুক্ত ওরই নিজের নিরাপত্তায়। ঐ শয়তান রমণ প্রতিজ্ঞা করেছে ওর ভাইয়ের হত্যার সে বদলা নেবে।"

উঠে পড়লো মঁসিয়ে থেরোঁ। স্বাভাবিক সুন্দর মুখ আর তাঁর নেই। দুশ্চিন্তার কালোছায়া মুখাবৃতি পালটিয়ে দিয়েছে তাঁর। ভদ্রলোক চলে গেলে

প্যাট্রিক তার বাবাকে বললো "বাবা ঐ সম্ভাবনাগুলি তুমি কী বিশ্বাস করো না স্যামবর্ণারের মুক্তির জন্য সবকিছু নাকচ করে দিলে।"

"কেন সম্ভাবনাগুলি কী তোমার যুক্তিগ্রাহ্য মনে হচ্ছে না?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়। ভীষণভাবে যুক্তিসংগত।"

প্যাট্রিকের বাবা তার দিকে কঠোরভাবে তাকালেন। যদি ব্যাটা সত্যি তাঁর পায়ে ল্যাং দিতে পারে তবে তো ছেলে সেয়ানা হয়েছে।

"কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি খুব সন্তুষ্ট নও মঁসিয়ে থেরোর যুক্তিতে।"

"না, সব ঠিক আছে," প্যাট্রিক বললো, "তর্ক-সাপেক্ষও বটে। ওরা ঐভাবেই পরিকল্পনা ছকতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা হলো ওরা ওভাবে কিছু করবে না। কারণ অগাষ্ট কাউকে খুন করবার মতো লোক নয়। আর রমণ মনক্রেডোর সংগে হম্বি-তম্বি করলেও তাকে ঠাণ্ডা করে দেবার লোক নয়। মনক্রেডোকে এমন একজন মেরেছে যে তাকে ঘৃণা করে। আমি এ-ব্যাপারে নিশ্চিত।"

"তাহলে কী স্যামবর্ণার বলছো?"

"না স্যাম-ও নয়," প্যাট্রিক বললো। তার বলার ধরণটা দেখে তার বাবা আগের মতো আবার তার দিকে তাকালেন। ছেলেটি অস্বস্তি বোধ করলো। ধারণাটা হঠাৎ-ই প্যাট্রিকের মাথায় আসেনি। ছোটো-ছোটো ঘটনা ধারণাটার রূপ নিয়েছে। কিছু ব্যাপার দেখেছে, কিছু শুনেছে, কিছুটা আভাস, কিছু সম্পুর্ণ মনোগত ইংগিত। ঠিক যুক্তিতর্ক দিয়ে এ বোঝানো যাবে না। এ-ব্যাপারটা অনেকটা ছবির মতো। মনক্রেডোকে মনে মনে ধারণা করলো,—মদে চুর, আবোল-তাবোল জড়িয়ে জড়িয়ে বলছে কিছু, যেতে যেতে টলছে। সেই সুপরিচিত জায়গাটায় বেড়া টপকানো, ধুলায় ভরা পথ ধরলো। দূরে চন্দ্রালোকিত ফাঁকা মাঠ। আস্তে আস্তে সে এগোচ্ছে তার ক্যারাভ্যান আর বিছানাটার দিকে। এই পর্যন্ত ঠিক আছে এবং তার বাবাও বিশ্বাস করছেন। তারপরই কিছু একটা ঘটনা তাকে বিক্ষিপ্ত করে। প্যাটিক বিশ্বাস করে না পথ ভুল করেছিলো সে। মাতাল হলেও স্বভাব তাকে ঠিক বিছানায় নিয়ে যেতো। কিছু একটা জিনিষ তাকে টাট্টু-ঘোড়াদের আস্তাবলের দিকে নিয়ে গিয়েছিলো। আর দরজার সামনে হত্যাকারী গুঁড়িমেরে বসেছিলো মারাত্মক আঘাতটা হানবার জন্য।……

তিন চারদিনের মধ্যে মূল সার্কাস দল ফিরে আসবে। শীঘ্রি মাঠ-টা মানুষের কথাবার্তায়, চিৎকারে, কাজে ভরে উঠবে। সারা অংগন হবে আলোয়

ঝলমল…। সমস্ত ক্যারাভ্যানগুলি লোকে ভর্তি হয়ে যাবে। সময় চলে যাবে দেখতে দেখতে। শরতের সার্কাসের জন্য যদি কিছু প্রমাণ থেকে থাকে মানুষের পায়ের তলায় তা নষ্ট হবে। হত্যার গন্ধ থাকলেও তা যাবে উবে। প্যাট্রিকের মা-ও ফিরে আসবে তার মা তারই জন্য ইংলণ্ডে গেছেন একটা ভালোমতো স্কুলের সন্ধানে। তার মা একজন ইংরেজ কর্ণেলের মেয়ে। প্যাট্রিক তার বাবার পক্ষে। মার আবার ইংরেজ বোর্ডিং স্কুলের ওপর বেশী ভরসা। তিনি ফিরে এলে তার স্বাধীনতা ব্যাহত হবে।

পরের দু-দিন সে জেটির দিকে সময় কাটালো। যে কোনো লোক দর্শনধারী এগারো বছরের পুলিশের ছেলের সংগে কথা বলবে। প্যাট্রিক খালি শুনে যায়। তার সূত্রের জন্য শুধু একটা খবরের দরকার। দ্বিতীয় দিনের বিকেলের বেশ পরে—রাত নটার পর জলের ধারের কোনো একটা কফি খানার মালিকের ছেলে সেই সংবাদ তাকে দিলো। প্যাটিক আবার তারই সংগে ফিরে গেলো সংবাদটার সত্যতা জানতে। প্যাট্রিক কোনো চালাকি চায় না। দুজন বাচ্চাই পর্দার ফাঁকে উঁকি মারলো। রমন্ অর্ধেক শূন্য মদের বোতল সামনে রেখে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে।

"এই দ্বিতীয় বোতল চলছে" ছেলেটি বল্লো, "যদি আজ সে গোলমাল পাকায় তাহলে বাবা আর কাকা ওকে বানাবে। আমরা কী মজা দেখতে দাঁড়াবো ?"

"না," প্যাট্রিক বল্লে, "আমি টেলিফোন করবো।"

"কেন টাকা পয়সা নষ্ট করবে ?" ছেলেটি বল্লে, "আমাদের ফোনটা ব্যবহার করো। বারান্দায় আছে ওটা। চলো দেখাচ্ছি।"

প্যাট্রিক বাড়ীর দেখা শোনা করার লোকটার সংগে কথা বল্লে। তার বাবা বাইরে গেছেন। যে কোনো সময় ফিরে আসতে পারেন।

"যখন তিনি ফিরে আসবেন," প্যাট্রিক বল্লো," তাঁকে বলো যে আমি আমার কয়েকজন বন্ধুর সংগে পূর্ণিমায় বনভোজন সারবো—।" তত্ত্বধায়ক প্রতিবাদ করবার আগেই ফোনটা ছেড়ে দিলো সে। দশ মিনিট পরে সে কাঁটা-তারের বেড়ার পথে সার্কাসের ময়দানের পৌছালো। লোমওলা কুকুরগুলির পরিদর্শনের পর এলসেসিয়ান-দল গন্ধ শুঁকে তাকে এগিয়ে যাবার অনুমতি দিলে। প্যাট্রিক ঘেরা টোপের পরিসীমায় অন্ধকারের আড়লে ময়দানটা ঘুরলো যতোক্ষণে না সে ক্যারাভানেগুলির কাছে চলে এলো। এবার সে সাবধানের সংগে এগোতে লাগলো। সারির শেষদিকে বর্ণারের ক্যারাভ্যানের পাশে সে ফাঁকা একটা

ক্যারাভ্যান খুঁজছিলো। বর্ণারের শোবার ঘর থেকে আলো আসছিলো। ঘরে নিশ্চয়ই ডোনা আছে। সে মনে হয় বিছানায় শুলেও ঘুমায় নি। সে কী কামের জন্য চিন্তা করছে। তাই এই আলো? খুব সাবধান। অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিনা যে চাবি দিয়েছিলো—সেই চাবি দিয়ে তালা খুলে ফেল্লো। ঘরের ভেতর ঢুকলো একসময়। বর্ণারের ঘরের মতো সুন্দর না হলেও ঘরের কায়দা ওর ঘরের মতোই। জানলার কাছেই একটা গদিওলা কোচ। গদিতে বসে জানলা-টা খুলে দিলো প্যাট্রিক।

তারায় ভরা রাত এটা।…চারদিক স্তব্ধ। রোজ আর মার্গারেটের নড়াচড়ার ফলে মেঝেতে যে শব্দ উঠছে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে তা। বুড়ো সিংহ রোমো তার যৌবনে বনের কার্যকলাপের যে স্বপ্ন সে এখন দেখছে—তার অভিব্যক্তি এখানে বসেও তা যেন টের পাচ্ছে প্যাট্রিক।

হাঁটু গেড়ে বসে বর্নারের বসবার ঘরের সব কিছুই চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে। তার উল্টো দিকে খোলা জানলা-টার সামনে দাঁড়ে বসে নেষ্টর। সেই বিরাট লাল রংয়ের টিয়া, চোখ বন্ধ। সমস্ত জন্তু জানোয়ার আর পাখীর মধ্যে ঐ টিয়া-টা সে বেশী ভয় করে। সে তার বাবার বই পড়ে জানতে পেরেছে ঐ জাতের পাখী অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যাণ্ড-এ ভেড়াদের পেট ফুটো করে মেরে ফেলো। সে পড়েছে কী ভাবে ভয়-পাওয়া ভেড়াকে কোণ ঠাসা করে পেটের ভেতর দিয়ে যকৃতে ঠোকর মারে। সে এ-ও জেনেছে কী ভাবে রাগে ক্ষিপ্ত পশুপালকদের কৌশলপূর্ণ ফাঁদ তারা চাষীদেরও থেকে বেশী চালাকিতে এড়িয়ে যায়। পরন্তু নিজেরাই চাষীদের জন্য ফাঁদ তৈরী করে।

চোখ খুল্লো নেষ্টর। এক মুহূর্তের জন্য প্যাট্রিক ভাবলো সে বোধহয় তাঁকে দেখেছে। হয়তো ঠোঁট খুলে চেঁচিয়ে উঠে সার্কাসের লোকদের সতর্ক করে দেবে। তারপরেই সে দেখলো মাথা গুঁজে কিছু একটা শুনবার চেষ্টা করছে সে। পরের মুহূর্তে প্যাট্রিক ও শুনলো হ্যা রমন ফিরে আসছে। পরের মুহূর্তে নেষ্টর লিওপোল্ড আর লরেঞ্জোর খাঁচার দিকে গেলো। জেগে উঠেছে ওরা। খাঁচার একদিক থেকে আরেক দিকে নড়াচড়া করতে লাগলো হনুমান দুটে।

ছোট একটা খিল দিয়ে খাঁচা আটকানো। অবশ্য ওদের হাতের বাইরে। নেষ্টর ঠোঁট দিয়ে বোধহয় খিল-টা খুলে ফেল্লো। খাঁচা হাঁট হবার একটা ধাতব শব্দ হলো। তারপরেই পালিয়ে গেলো তারা খোলা খাঁচা আর জানলার

পথে। জানলার আলসে কিছুক্ষণ বসে নেষ্টর-ও হাওয়া। খোলা খাঁচার দরজা সামনে থাকা সত্বেও প্যাট্রিক সম্পূর্ণ ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছে না।

ক্যারাভ্যানের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সে স্পষ্ট রমন্‌কে দেখতে পেলো। লোকটা চালা-টার পেছন থেকেই বেরিয়ে চন্দ্রালোকিত মাঠের মধ্যে দিয়ে চলছিলো। আস্তাবলের ছায়ান্ধকার থেকে ভেসে এলো অগাষ্ট-এর গলা। গলা-টা ডেকে উঠলো "রমন্" । নকল-টা এতো সুন্দর যে প্যাট্রিক-ও এক মুহূর্তের জন্য ভাবলো অগাষ্ট-ই বোধহয় ডাকছে। না, গলাটা নেষ্টরের।

রমন বাঁ-দিকে ঘুরে গেলো। তুবড়ীর মতো নোংরা স্পেনীয় খিস্তি বেরিয়ে আসতে লাগলো। টল্‌মল করে রমন ছুটতে লাগলো। ছুটতে ছুটতে সংগে সংগী ছুরিটা উচু করে ধরলো রমন্। চাঁদের আলোয় সেটা ঝক্‌মক্ করে উঠছে। ছুরিটা বাঁ-হাতে স্পেনীয় কায়দায় ধরেছে সে। প্যাট্রিক এবার ছুটলো রমনের পেছনে। ধুলোয় ভর্তি পথে পায়ের আওয়াজ উঠলো না একটু। এবার তৃতীয় বারে অগাষ্ট-এর খিস্তি ভেসে এলো আস্তাবলের ভেতরে থেকে কিছুটা বা উপর থেকে। আস্তাবলের মুখের কিছুটা অংশ চন্দ্রালোকিত। টলছে সেখানে রমন। আস্তাবলের দরজায় সামনে রোজ্ নামে ঘোড়া দাঁড়িয়ে। হনুমান ছুটে তাকে জায়গা থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছে। দরজার একটা কবজায় তার মাথার দড়ি-টা কোনল বাঁধা। লিওপোল্ড তার ওপর জকির মতো বসে। রমম্ পেছন থেকে আসছে। এই সময়ই লরেঞ্জো রোজ এর কান-টা কামড়ে দিলো। পা ছুড়লো রোজ, হোঁচট খেলা রমন আর ঐ হোচট-ই রমনকে বাঁচিয়ে দিলো। লাথি-টা মাথায় না লেগে লাগলো কাঁধে। কিছু একটা ভাংগার শব্দ হলো। হয়তো রমনের কণ্ঠাস্থিটাই ভেংগেছে। কারণ তার বাঁ হাত-টা ঝুলছে। উঠে দাঁড়িয়েছে সে। ভয়ে আতংকে সব মদ তার উবে গেছে। রোজ তার পেছনেই ফর্ ফর্ করে নিশ্বাস নিচ্ছে আর পা ঠুকছে। রমন্ না দেখার ভান্ করলো। মুখ তার ফ্যাকাশে মাথার ওপর চাঁদ-টার মতোই। ধারে-কাছেই নেষ্টর বসে। হলদে গোল চোখে নিস্পলক তাকিয়ে। বুদ্ধির লড়াই এটা। যার বেশী সেই জিতবে।

রমণ পেছন ফিরে চলে গেলো একসময়। তার চলার পথের দিক তাকিয়ে বিরাট সবুজ টিয়া ঘৃণা আর জয়ের এক উল্লাস জানালো।......

"তাহলে," বললেন মঁসিয়ে খেরো 'অপর ভাই রমণ নিজেকে গুটিয়ে নিলো খুব ভোরের দিকে সে চোরাপথে সীমান্ত পেরিয়ে গেছে। আমার রক্ষীদের গুলি কিন্তু ওকে থামাতে পারেনি।' মূল রচনা—মাইকেল গিলবার্ট

"আমাদের কী ওকে থামানো উচিৎ?" এবার বললেন প্যাটিকের বাবা, "ঐভাবে পালিয়ে যাওয়াতে অপরাধ স্বীকার করছে সে। এবার আপনার বর্ণারকে ছেড়ে দেবার পালা।"

"হ্যা নিশ্চয়ই। আমি করেছি তাও।" বললেন মঁসিয়ে থেরো।...... ... কিন্তু আমি জানতে চাই কেন সে নিজের ভাইকে মারলো আর কীভাবেই বা। কে কে তাকে সাহায্য করেছিলো। কারণ এ ষড়যন্ত্রে অনেকের ভূমিকা আছে ....

ঘাতক মহান

এ. ই. ভ্যানভট্

"বিচারটা" শব্দ উঠলো যন্ত্রটার থেকে, "ডগলাস এয়ারড-এর ব্যাপারে যে নাকী গত আগষ্টে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো—"

হাতের কাঁপা কাঁপা হাতে এয়ারড্ যন্ত্রটার শব্দগ্রাম আরো উঁচুতে তুলে দিলো। তৎক্ষণাৎ যন্ত্রটা থেকে শব্দগুলি যেন তাকে তাড়া করে এলো,—"সে ঠিক এক সপ্তাহ আগে ৭ই সেপ্টেম্বর ২৩৬০ খ্রীষ্টাব্দে আত্মসমর্পণ করে তার সবচেয়ে কাছের রক্ষীবাহিনীর হাতে। এরপর তাকে নিকটবর্তী পরিবর্তকের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে যাতে সে মৃত্যুবরণ করতে পারে।"

ক্লিক!

যন্ত্রটা বন্ধ করবার জ্ঞান আর তার ছিলো না। মুহূর্তমধ্যে সমস্ত ঘরটায় বিকট একটা আওয়াজ উঠলো। পরক্ষণেই মিলিয়ে গেলো সেটা। এয়ারড্ চেয়ারে যেন ডুবে গেলো। স্বচ্ছ দেওয়ালের মধ্যে বিচারকদের ঝকঝকে ছাদের দিকে অসুস্থ চোখে চেয়ে রইলো। সমস্ত সপ্তাহটা ধরে সে ভেবেছে পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই। ভেবেছিলো তার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বিচারের সময় তার মুক্তির দিকেই পাল্লা বেশী টানবে এবং তার আবিষ্কার মানবজাতির কতো উপকার করবে সেটা ভেবেও সে উদ্বুদ্ধ হবার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু এখন সে বুঝেছে মহান বিচারপতি তার কীর্তিকে তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করবেন না।

মারাত্মক ভুলটা সে ঠিক করেছিলো তারপরেই। সে 'বন্ধুদের' কাছে উত্থাপন করেছিলো সে সামান্য একজন ডগলাস্ এয়ারড্, অমর আর মহান বিচারকের মতো শাসন করতে পারে…। তার জন্য সে কী চেয়েছিলো? কিছুটা শিথিলতা আর কিছুটা নিজের ব্যক্তিত্বের স্বপ্রকাশ। ঐ দিনই সে উচ্ছলভাবে বলেছিলো সে মুরগীর স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতা একটা কুকুরের স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতায় রূপান্তরিত করতে পারে। উত্তেজিতও অস্বাভাবিক অবস্থায় সে তার পরীক্ষা সকলের সামনে সম্পাদন করতে উদ্যোগীও হয়েছিলো। কিন্তু উপস্থিত আইন-শাসক বলে উঠলেন ব্যাপারটা অযৌক্তিক, অবাস্তব আর অদ্ভুৎ। আবিষ্কারটা যে কী ব্যাপারে সেটা শুনতেও তিনি অরাজী এবং আইনানুগ প্রস্তাব রাখলেন—"সরকারী বৈজ্ঞানিক প্রবক্তা মহান বিচারপতির তরফ থেকে সময়মতো আপনার সংগে দেখা করবেন আর তখনই আপনি আবিষ্কার প্রমাণপত্র সহ দাখিল করতে পারবেন।"

বিষাদ ক্লিষ্ট মনে ভাবলো এয়ারড্ বৈজ্ঞানিক ভদ্রলোক দু-একদিনের মধ্যেই আসবেন। ভাবলো সে তার সমস্ত পরীক্ষার কাগজপত্র আর যন্ত্রপাতি নষ্ট করে ছেলেমানুষী করবে না কী? মাথা ঝুঁকিয়ে সে ঐ ভাবে বিস্মৃতির পথে যেতে চাইলো না। মহান বিচারপতির মানুষের জীবনের ওপর এতো ক্ষমতা যে সে কোনো অপরাধীর পাল্টা আক্রমণকে ভয় করে না। ফলে মৃত্যুপথ যাত্রী মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত স্বেচ্ছায় চলাফেরা করতে পারে। মহান বিচারপতির প্রচার বিভাগ আবার এই ব্যাপারটাকে আরো বেশী ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলেছে। সভ্যতা আর কখনো এতো স্বাধীনতার তুংগে ওঠেনি--এটা বলা হয়ে থাকে। তার আবিষ্কারের জিনিষপত্র নষ্ট করে দিলে সেটা কেবল মহান বিচারপতির ধৈর্যের ওপর আঘাত হবে। আর ঐ হাস্যকর ব্যাপারটা যদি ঠিকমতো না উৎরায় তাহলে তার ওপর সভ্যতার নীচু আইনগুলি তার ওপর প্রয়োগ করা হবে।

তার নিজের ঘরের চারধারে আধুনিক আসবাবে আচ্ছাদিত হয়ে এয়ারড্ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্লো। তার জীবনের শেষ সপ্তাহ-টা তার ইচ্ছামতো যে কোনো বিলাস ব্যসনে কাটাতে পারে। মানসিক শান্তির এই হচ্ছে বিশুদ্ধ-রুচির পরিচয়। এই সময়টায় মানুষ খালি চাইবে মুক্তি। পালাবার এমন একটা উপায় সে বার করবার চেষ্টা করবে—যেটা পালাবার পক্ষে হবে। নিখুঁত কিন্তু মুক্তি কোথায় পাবে? যদি সে 'হপ্-জেট' উড়োজাহাজে পালাবার চেষ্টা করে--তবে কাছের রক্ষী বাহিনীর আস্তানায় ডাকার সংগে সংগেই নেবে

আসতে হবে আর সেখানে তাকে সিগন্যাল দিয়ে ইলেক্ট্রোনিক লাইসেন্স প্লেটে ছাপ মারা হবে। ফল? তার ঐ প্লেট সব সময় তরংগ সৃষ্টি করবে আপনি আপনি। আর তার পালানোর খবর দূর-দূরান্তে সময় স্থানকে পিছনে ফেলে ছড়িয়ে যাবে।

ঐ রকম আরো বাঁধা আছে তার নিজের শরীরে। তার ডান হাতের উপরের দিকে বসানো আছে একটা ইলেকট্রনিক যন্ত্র। কেন্দ্রীয় এক ব্যবস্থা ঐ যন্ত্রের নিয়ন্তক। গড়বড় কিছু হলেই ঐ যন্ত্র চালু হবে আর তার হাতে পোড়ার অনুভূতি ক্রমান্বয়ে শুধু বেড়েই যাবে।

মহান বিচারকের আইনের লম্বা হাত থেকে বাঁচবার আর কোনো উপায় নেই।

এয়ারড্ অস্থির পায়ে উঠে দাঁড়ালো। বৈজ্ঞানিক প্রবক্তার জন্য সে এখন বোধহয় কাগজপত্র ঠিক করতে পারে। কোন উচ্চপর্যায়ের জীবনের ওপর সে তার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রয়োগ করতে পারলো না—এ দুঃখ সে কোথায় রাখবে?—এয়ারড্ তার পরীক্ষাগারের দরজার সামনে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো। সেই মুহূর্তের একটা সম্ভবনা তার মস্তিষ্কে ঝাপটা মারলো। চিন্তার প্রচণ্ডতায় কেঁপে উঠলো তার শরীর। দরজার কপাটে দুর্বলভাবে সে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। সময় নিলো সে নিজেকে সোজা করতে।

'হ্যাঁ, ওটাই ঠিক!' জোরেই বল্লে সে। গলার স্বর নীচু কিন্তু গাম্ভীর্যময়। ব্যাপারটার সম্ভাবনা অবিশ্বাস থেকে পাগলামীর পর্যায়ে পড়ে। উচ্চাশার সম্ভাবনা তাকে দুর্ব্বল করে দিলো। পরীক্ষাগারের কার্পেটের ওপর সে অজ্ঞানের মতো পড়ে গেলো। ওখানেই শুয়ে শুয়ে সে ইলেকট্রোশিয়ান বিশেষজ্ঞের মতো নিজেই নিজেকে শোনালো কিছু উন্মাদ কথা-বার্তা।

"একটা বড় মতো ঝাঁঝরি আর কিছু এসিড—"

বৈজ্ঞানিক প্রবক্তা মহান বিচারপতি দরবারে গিয়ে তাঁর সংগে সাক্ষাতের বিশেষ আর্জি জানালো।

"তাঁকে দয়া করে বলুন," বল্লে সে মহান বিচারপতির প্রধান বেলিফকে, "আমি আজ বিরাট এক বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা দেখে এসেছি। আপনি গিয়ে যদি শুধু বলেন 'সিদ্ধান্ত কক' তাহলেই তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন।"

মহান বিচারপতির আসার সময়টুকুর মধ্যে সে তার যন্ত্রপাতি খুব তাড়াতাড়ি কাজ সারায় উপযোগী করে গুছিয়ে নিলো। তারপর সে অলসভাবে তার বসবার ছোট ঘরটার চারপাশে চোখ বোলালো। স্বচ্ছ দেওয়াল দিয়ে সে

দেখতে পাচ্ছে নীচের কয়েকটা বাগান। চারদিকের সবুজের প্রাচুর্যের মধ্যে হঠাৎ-ই সে দেখলো একটা সাদা জামার নাচের অংশ। মনে পড়ে গেলো তার—মহান বিচারপতির হারেমে সদ-সর্বদা অন্তত সাতজন অতুলনীয়া সুন্দরী বিরাজ করেন।

"হ্যাঁ, দয়া করে এদিকে আসুন। মহান বিচারপতি আপনার অভ্যর্থনায় জন্য প্রস্তুত আছেন।"

ডেস্কের পেছনে যে মানুষটি বসে আছেন, দেখলে মনে হয় তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ। কেবল তাঁর মুখ আর চোখ বলছে বেশী বয়সের কথা। বিবর্ণ নীল চোখ পাতলা-ঠোঁটের নীরবতা আগন্তুককে জরিপ করলো—অমর আর চিরযুবা মহান বিচারপতি।

আগন্তুক কিন্তু সময় নষ্ট করলো না। তাঁর ঘরে ঢোকার সংগে দরজা বন্ধ হলে সে একটা বোতাম টিপে দিলো। বোতাম টেপার সংগে সংগে এক ঝলক গ্যাস্ সোজাসুজি মহান বিচারপতিকে তাড়া করলো। মানুষটিও সংগে সংগে চেয়ারে ঢলে পড়লেন।

আগন্তুক নির্ভয়ে আর তাড়াতাড়ি কাজ করে গেলো। যন্ত্রপাতি রাখবার বাক্সটার কাছে নিশ্চল দেহটাকে টেনে নিয়ে গেলো সে। ওপরের জামা-কাপড় খুলে ফেল্লো। তার নিয়ে আসা আরকে দেহটা ভিজিয়ে দিলো। এর পরই সে স্নায়ুর পর্বগুলি দেহে আটকে দিতে আরম্ভ করলো। দেহের একদিকে ছটা, অপরদিকে বারোটা, এবার এলো নিজের শরীরে তার লাগাবার ব্যাপারটা আর পরে কার্যনিয়ন্ত্রক যন্ত্র চালু করা।

যেদিন সে প্রথম মুরগীর স্নায়ুতন্ত্র কুকুরের উপর আরোপ করে সেদিনই দ্বিধা আসে তার, সাধনা কতোদূর সার্থক ?

ব্যক্তিত্ব, নিজেকে নিজে বুঝিয়েছিলো, একটা জটিল ব্যাপার। ব্যক্তিত্ব তৈরী হয় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার সংযোগে। আর সেই সংখ্যা হলো একের পর চব্বিশটা শূন্য যোগ করে। আর এরাই শেষমেষ স্নায়ুতন্ত্রতে কম্পন জাগিয়ে ব্যক্তিত্বের জন্ম দেয়।

দুটি দেহের মধ্যে ঠিক ঠিক মাপের কম্পন জাগিয়ে একের ব্যক্তিত্ব অপরের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে তো তার পক্ষে ?

একটা কুকুর অপর একটা মুরগীর আচরণ করলো এটাই তার সাধনার সব নয়। স্বাভাবিকভাবেই তার উচিৎ ছিলো পরীক্ষাটা আরো ব্যাপকভাবে অন্যত্র চালিয়ে তবে মানুষের ব্যাপারে যাওয়া। কিন্তু যে মরতে বসেছে তার

পক্ষে সাপের মধ্যে বিষধর খোঁজা নিরর্থক। তাই দুদিন আগে বৈজ্ঞানিক প্রবক্তা যখন তাকে পরীক্ষা করতে আসে সে তৎক্ষণাৎ তাঁকে গ্যাস দেয় আর সেই অবস্থাতেই পরীক্ষা চালায়।

একের ব্যক্তিত্ব অপরের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়া সম্পূর্ণ হয়নি। কিছু অস্পষ্ট স্মৃতি তার থেকে যায়। যায় ফলে মহান বিচারপতির কাছে যাবার স্মৃতিটাও সরল হয়ে আসে তার। চিন্তায় পড়েছিলো সে পরিকল্পনার জন্য। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে সে বিচারপতির কাছে যাবার নিয়ম শৃঙ্খলা মানবে। কারণ যে লোক এগুলি জানেনা সে কখনই মহান মানুষটার কাছে এগোতেই পারে না।

ব্যাপারটা যা ঘটলো এ পর্যন্ত সে ঠিক ঠিকই করেছে। দৃষ্টির অস্পষ্টতা দিয়েই কাজ শুরু হলো। তার বর্তমানের বৈজ্ঞানিক প্রবক্তার ব্যক্তিত্ব ধীরে ধীরে মহান বিচারপতির মধ্যে আরোপিত হচ্ছে। এয়ারড্ সক্রিয় হলো। মহান বিচারপতির দিকে সে আরেকটা গ্যাস ছুঁড়ে দিলো—ফলে সে পাঁচ মিনিটের মধ্যে জেগে উঠবে। একই ভাবে সে নিজের দেহটা মুহূর্তে কার্যক্ষম এমন একটা অবশকারী গ্যাসে ভরিয়ে নিলো। অজ্ঞানতায় ডুবে যাবার মুহূর্তেও সে নিজের মধ্যে মহান বিচারপতির তীক্ষ্ণ কঠোর ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি করলো অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক প্রবক্তার মধ্যে।

পাঁচ মিনিট পরে ডগলাস এয়ারড্ চোখ খুল্লেন। অবশ্য বর্তমানে মহান বিচারপতিরূপে। সতর্ক দৃষ্টিতে নিজের চারদিকে তাকালেন। যত্ন করে তার গুলি খুলে যন্ত্রের খোলে ঢুকিয়ে একজন বেলিফ-কে ডেকে পাঠালেন। যা সে আশা করেছিলো কেউই মহান বিচারপতির কার্যধারায় আশঙ্কিত হলো না। এক ঘণ্টার মধ্যে সবকিছু সমাধা হলো—ডগলাস্ এয়ারড্-এর ফ্ল্যাট বাড়ীতে যাওয়া, মহান বিচারপতির ব্যক্তিত্ব ডগলাস্ এয়ারড্-এর মধ্যে আরোপিত করা, আর বৈজ্ঞানিক প্রবক্তার সত্তা সেই বৈজ্ঞানিক প্রবক্তাকে ফিরিয়ে দেওয়া। সাবধানের মার নেই হিসেবে বৈজ্ঞানিক প্রবক্তার দেহটা সে হাসপাতালে দিয়ে এলো।

"তিন দিন ওর দেহটা পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখুন।" আদেশ দিলেন তিনি।

ফিরে গেলেন তিনি মহান বিচারপতি বিচারালয়ে। অত্যন্ত সাবধানতার সংগে কয়েকটা দিন কাটালেন। একক শক্তির প্রতিভূ হিসেবে আনন্দে জীবন ভাসালেন। হাজারো তার পরিকল্পনা—পুলিশ রাজ্যকে কী ভাবে স্বাধীন

রাজ্যে পবিবর্তন করা যায়। বৈজ্ঞানিক হিসেবে পরিবর্তনটা যাতে নিয়মানুগ হয় সে দকে দৃষ্টি রাখলেন তিনি।

এক সপ্তাহের শেষে কথা প্রসংগে তিনি ডগলাস এয়ারড নামের বিখ্যাত ঘাতকের ব্যাপারটা জানতে চাইলেন। মজার গল্প একটা। মানুষটা বোধহয় পালাতে চেয়েছিলো। সে একটা বেনামী 'হোপজেটে' করে পালাবে ভেবেছিলো। পাঁচশো মাইল দূরে রক্ষী বাহিনী তাকে টেনে নামায়। পাহাড়ে পালিয়ে যায় সে। তার ফাঁসীর দিনে যখন সে এসে পৌছায় না—তখন তার হাতের যন্ত্রটা কাজ আরম্ভ করে। সন্ধ্যার আগে ক্লান্ত রিক্ত হতচ্ছাড়া একটা মানুষ চিৎকার করতে করতে পাহাড়িয়া পুলিশ বাহিনীকে এসে বলে যে সেই মহান বিচারপতি। আর বিন্দুমাত্র দেরী না করে ফাঁসীর তক্তায় চড়ানো হয় তাকে।

রিপোর্টের শেষে বলা হয়, কদাচিৎ একজন ফাঁসীর আসামী এরকম অনিচ্ছাসত্ত্বে পরিবর্তকের কাছে ধরা দেয়।'……

অতল জলের আহ্বান

মার্ক ব্যানারম্যান

অদ্ভুৎ পর্বতশিরার গঠনের জন্য দক্ষিণ ফরাসীর তাঁর কেউ জেলায় সুপরিচিত একটা বুড়ীকে একটা ম্যাজিক বুড়ী আঙ্গুলি ছড়ি দিয়ে একটা বিরাট পাথর নড়িয়ে দেবে। পাথরটির ওজন আটশো টন হওয়া সত্ত্বেও একটা খেলনার মতোই দুলবে। সূর্যতাপিত পাথুরে জমির এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিচিত্র সব পাথর। নামও তাদের অদ্ভুৎ—নেপোলিওনের টুপি, মিষ্টি মুখ, শয়তানের মাথা, কতো কী। মাটির তলায় আবার রয়েছে শয়তানিতে ভরা সব গর্ত। যদি ডাইনীরা সত্যি থাকে তাহলে তারা ওসব গর্তে বসেই শয়তানির জাল বোনে।

সবচেয়ে শয়তানি যদি কোথাও থাকে তবে সেটা আছে আবার পাহাড়ী নদীতে। এখানে কিন্তু জল নেই। আছে জলের বদলে হাজারে নুড়ি-পাথর। বিরাট তাদের আকৃতি আর একটা আরেকটার ঘাড়ের ওপর চেপে। মনে হয় যেন ঐ সব নুড়িগুলি প্রাগৈতিহাসিক যুগের দৈত্য-দানোদের খেলার পাথর। দু-ধারের শান্তি বদ্ধ বনানীর জন্য, নদীর পথ অনাব্য। অবশ্য সবচেয়ে পরিশ্রমী পাহাড়—চড়িয়েরা এর ব্যতিক্রম।

আগস্টের এক গরম বেস্পতিবার আমি প্রজাপতির রংয়ের খেলায় মোহিত হলাম। প্রজাপতি ধাওয়া করার পথে পার হলাম বন আর পাথর। কিন্তু দেখলাম না মানুষ জন একজনও। থামলাম এক জায়গায়। ভুরুর ঘাম মুছতে আর পা ফসকালাম তখনই গ্রানাইট পাথরের এক পিচ্ছিল গায়ে। মুহূর্তের মধ্যে এক অন্ধকার গর্তে নিজেকে আবিষ্কার করলাম। খুব জোরেই পড়েছিলাম। উঠবার চেষ্ট করলাম আর চিৎকার করে উঠলাম। প্রচণ্ড ব্যথা পায়ে। উপরে তাকালাম গর্তটার। শক্ত মুখটা যেন একজোড়া ঠোঁট আর আকাশটা এক চিলতে ফিতে। পনেরো ফুট নীচে পড়ে গেছি আমি।

কষ্টে সৃষ্টে নিজেকে কোনো রকম বসা অবস্থায় রাখলাম। থির থির করে কাঁপছি। বাঁ পায়ের হাড় পরীক্ষা করলাম, হাঁটুর ঠিক নীচেই ভাংগা হাড় টের পেলাম। ভয় হলো সারা জীবনের জন্য তো আবার খোঁড়া হয়ে যাবো না! তেতো মুখে সারা দেহে পরীক্ষা চালালাম। ঘাড় ভালো করেই ছরে গেছে। পড়ার চোটটা পায়ের ওপর দিয়ে গেছে। মনে হলো আর কোথাকার হাড় ভাংগেনি।

চার মাইল দূরে আমার মোটর গাড়ী দাঁড় করানো। এই দেহ ওখানে টেনে নিয়ে যাওয়া নরক যন্ত্রণা বিশেষ পাথরের ওপর দিয়ে। কিন্তু অগত্যা মধুসূদন। আমাকে সাহায্য করে ধারে-কাছে এমন কেউ নেই। কিন্তু এখন আমার প্রথম কাজ হলো গর্ত থেকে নিজেকে টেনে তোলা। কষ্টের ঠেলায় দাঁত চেপে ভালো হাঁটুটার ওপর নিজের ওজন রাখলাম আর নিজের চারদিকে তাকালাম। দেখে উৎসাহ পাবার মতো কিছুই নেই। বিষাদে ভরা গর্তটা প্রকৃতির চালাকি। তলাটা পনেরো ফুট চওড়া। কিন্তু আমার মাথার ওপর থেকে অনেক উঁচুতে মুখটা খুবই ছোটো।

যতো দূর পারি ন্যক্কারজনকভাবে হ্যাচার প্যাচার করতে করতে আমি ওপরের দেওয়াল বেয়ে ওপরে উঠবার চেষ্টা করলাম। একটা খোঁচা মারা পাথরে আমার আংগুল জোরে বসে গেলো। চাপ পড়তেই পাথর সরে গেলো। আঁৎকে উঠলাম যখন দেখলাম সমস্ত গর্তটাই কেঁপে উঠলো। তাকালাম ওপরে। ওপরের সমস্ত এবড়ো-খেবড়ো পাথরগুলিই নড়ছে। হঠাৎই মানুষের ওজনের সমান বিরাট এক পাথর মেঝেতে ধপাস্ করে পড়লো। একগজ দূরে থাকায় বেঁচে গেলাম। ঝুরঝুর করে ছোটো-খাটো নুড়িও পড়তে লাগলো। আমার ঘাড়ের ওপর। ভয়ে কাঠ। এক সময় টের পেলাম পাথর পড়া বন্ধ হয়েছে যখন গায়ে পাথর পড়া টের পেলাম না। যে কোনো মুহূর্তে হয়তো

আমি পাথরে থেৎলিয়ে যেতাম। আবার তাকালাম আর হাঁ হয়ে গেলাম। ওপরে পাথর আর নুড়িগুলি এমন অবস্থায় আছে যে একটু কম্পন হলে সবকিছুই আমার ওপর হুড়মুড় করে এসে পড়বে। কিছুদিন আগেই হয়তো গ্রানাইট পাথরের মৃদু কম্পনে গর্তটা সৃষ্টি হয়েছে আর এখন একটা কম্পনেই আমাকে নিয়েই বুঁজে যাবে।

ভয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে চারপাশের দেওয়ালগুলি পরীক্ষা করলাম। মসৃণ পাথর ধরে ধরে উঠে দাঁড়ালাম কিন্তু এই সময় ধরার মতো আর কোনো পাথর পেলাম না। ব্যাপারটা গর্তটার একপাশে ঘটেছিলো। দূরে তাকিয়ে আমার শেষ ভরসাও উবে গেলো। পরিত্যক্ত ঐ জায়গা দিয়ে পালাবার উপায় নেই। বিরাট একটা পাথর ঐ পথ বন্ধ করে আছে। ওখানে ধরবার মতো কোনো জিনিষই নেই।

দড়ি ছাড়া যে কোনো লোক, এমন কী সার্কাসের দলের ভল্ট-খাওয়া লোকদের পক্ষেও বাইরে বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব। পা-ভাংগা একটা মানুষের কাছে ঐ ছোটো মুখ গর্তটা সদ্য খোরা কবর ছাড়া কিছুই নয়। ভাবলাম এক সপ্তাহ মতো সময়ের পর খবরের কাগজে কী বেরোবে ফরাসী দেশে বেড়াতে গেছে এমন একজন ব্রিটীশ দাঁতের ডাক্তারের হারিয়ে যাওয়ার কথা? কেঁপে উঠলাম।

আর ঐ সময়েই মাছিদের উৎপাত টের পেলাম। অবাক হলাম মাছির ঝাঁকের বন্ বন্ শব্দ আগে কেন টের পাইনি। নীচের দিকে তাকালাম আর দেখলাম চষা জমির মতো মেঝেতে কীভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে জমা হয়েছে। হ্যাচোর-প্যাকোড় করতে করতে এগিয়ে গেলাম। পেলাম একটা মড়া যার একটা অংশে একটা ফাটলের মধ্যে। বয়স্ক লোক একজন। গরমকালের জামা আর হাফ-প্যাণ্ট পরণে। সারাটা মাথা তার কালো আর বড়ো বড়ো মাংস মাছিতে ভরা। হাতের নাড়াতে পালিয়ে গেলো মাছিগুলি আর তখুনি চোখে পড়লো মাথার খুলি। মাছিগুলি ওড়বার সময় খুলির ওপর নৃশংস আঘাতটা আমার স্মৃতির পটে আঁকা হয়ে গেলো। খুলির একপাশে লেগেছে প্রচণ্ড এক আঘাত। ফলে হাড়ের কিছু কুচি খুলিতে ঢুকে গেছে। ভয় পেয়ে মাছিদের গতির দিকে তাকিয়ে রইলাম। চোখের গর্ত দিয়েও তারা ঢুকতে আরম্ভ করেছে। মরা-পচার গন্ধে ঘর এখনো দূষিত হয়নি। তার মানে দাঁড়াচ্ছে লোকটা খুব বেশীক্ষণ মারা যায়নি!

মাথা ঘুরে গেলো। মুখ ঘোরালাম। টেনে হিচড়ে নিজেকে ঐ অভিশপ্ত

জায়গা থেকে সরিয়ে আনলাম। ভয়ে হারিয়েযাওয়া বুদ্ধিকে জোড়া দেবার চেষ্টা করলাম। গদা জাতীয় কিছু দিয়ে মানুষটাকে মারা হয়েছে। আমি পড়ার কিছু আগে মানুষের অগম্য এই গর্তে দেহটাকে ছুরে দেওয়া হয়েছে।

শিরদাড়া বেয়ে ভয়ের একটা কাঁপনি বয়ে গেলো যখনই মাছিতে ঢাকা ঐ মৃত দেহটার কথা আমার মনে এলো। কিন্তু আমি কী করতে পারি? ঘড়ির দিকে তাকালাম। আমার গর্তে পড়ার পর আধঘণ্টা সময় চলে গেছে। এক ঘণ্টার মধ্যেই অন্ধকার নেবে আসবে। অবশিষ্ট আলোয় আমার কারাগারটা

আর একবার দেখে নিতে হবে।

আচারের বায়মে ধরাপড়া পিঁপড়ের মতো আমি চার ধারে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। পাথুরে দেওয়ালে আবার পরীক্ষা চালালাম। নিঃখুতভাবে পায়ের ব্যথ বেড়েই চল্লো। ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি গর্তটার মধ্যে সেধোতে লাগলো। তাদের গুণ-গুণ শব্দে বাতাস ভারী। আমার চিন্তা আবার মৃত সংগীটার দিকে বাঁক নিলো। লোকটা কে?

গুঁড়ি মেরে লোকটার দিকে গেলাম। বেগে হাত দিয়ে বাতাস কাটলাম। মাটি যদি নরম থাকতো লোকটাকে হয়তো কবর দিতে পারতাম। খুঁজতে গিয়ে লোকটার জ্যাকেটের পকেটে যেন কিছু একটা ঠেকলো, বার করলাম চামড়ার মনিব্যাগ। মানুষটাকে জানতে সঙ্গে সঙ্গেই ব্যগ্র হয়ে পড়লাম। কারণটা যে কী জানিনা। তবে এটা বুঝলাম ফলে আমি কিছু সময়ের জন্য দুর্ভাবনা থেকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়বো।

পকেটের কাগজপত্র থেকে বুঝলাম আমারই মতো সে ইংরেজ, নাম আর্থার ডি. মীগার। ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে জড়িত। নিবাস গীল্ডফোর্ড। দশ পাউণ্ডের মতো টাকা-পয়সা যথাক্রমে ডলার আর ফরাসী মুদ্রায় পেলাম। ব্যাগের অপর দিকটা খুল্লাম। বেরিয়ে এলো জড়ানো একটা কাগজ। আলো চলে গেছে। চোখের কষ্ট সত্ত্বেও টাইপ করা কথাগুলি খুঁজে পেতে নিলাম।

"তুমি আর্থার ডি. মীগর,—কেউটের ছোবলের পবিত্র সাত ধারা নিয়মভঙ্গ করেছো। মৃত্যুই এর উপযুক্ত শাস্তি। এর পর বিশ্বাসঘাতক তোমার জিভটা কেটে পুরোহিত প্রবরকে দেওয়া হবে মঙ্গল কামনায়। যেখানেই পালাও আর লুকাও, কেউটের ছোবলের বাহকেরা তোমাকে অবশ্যই খুঁজে বার করে শাস্তি দেবে।

কেউটের ছোবলের আদেশানুসারে।'

আঙুলের ফাঁক দিয়ে চিঠিটা খসে পড়লো। তোলবার কোনো চেষ্টাই নেই আমার। অন্য পরিবেশে ব্যাপারটায় হয়তো হেসে উঠতাম। দূরেই মাথা ফাটা মৃতদেহটার কথা ভেবে চিন্তাটা আমার উবে গেলো। ঢোক গিলতে গেলাম। মুখটা শুকনো। লালা নেই মুখে।

কেউটের ছোবলের প্রতি আনুগাত্যের কথা পড়েছি। ইংরাজী কাগজে কয়েকদিন আগে বিবরণও দেখেছিলাম একটা। গোড়ায় আছে এর ঝাঁড়-ফুঁক ……। কর্ণওয়েলে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিলো। সংঘের কারো পাঠানো সংবাদের ভিত্তিতে কিছু কাজও হয়েছিলো। এখন আমার মনে হচ্ছে এই মীগরই সংবাদ প্রেরক। পরিণামে সংঘ-পুরোহিত দিয়েছে মৃত্যুদণ্ড। মীগর ফরাসীদেশের দূরপ্রান্তে পালিয়ে এসেছিলো, কিন্তু সংঘের লোক ঠিক তার পিছু পিছু এসেছে।

গর্তের বাতাস বেশ ভারী। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। মড়া পঁচার গন্ধটা বেশ স্পষ্ট পাচ্ছি। অসুস্থ শরীরের অনাহারে জর্জরিত নাড়িভুঁড়িগুলি যেন পাক দিচ্ছে। আগামীকাল আমি চিৎকার জুড়ে দেবার জন্য তৈরী হলাম। কিন্তু সেটা হবে ব্যর্থ প্রয়াস। এছাড়া আর কী-ই বা করতে পারি? মাছিগুলি আমার দেহটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে কতোদিন আর বাঁচবো আমি? হিংসে হলো মীগরের উপর। অন্তত লোকটা তাড়াতাড়ি মরেছে। তার সব চিন্তা-ভাবনার শেষ।

ব্যাপারটা চিন্তা করলাম। কাছের বনে আশ্রয় নিয়েছিলো সে। নিজেকে নিরাপদ ভেবে জল বা খাবারের জন্য বেরিয়ে এলো সে একদিন। নিশ্চয়ই সে পাথরের উপর দিয়ে যাচ্ছিলো আর ঠিক তখনই পথে ওরা ধরলো।

হঠাৎ একটা ভয়ের কথা মনে এলো। চিঠিতে বলা হয়েছে উৎসর্গের জন্য তার জিভটা কেটে নেওয়া হবে। এই শেষ ন্যক্কারজনক কাজটা কী করা হয়েছে?

চারদিকে বেশ অন্ধকার। স্পর্শেই আমাকে কাজ সারতে হবে। আবার দেহটা মৃতের কাছে টেনে নিয়ে গেলাম।

নিজে আমি দাঁতের ডাক্তার। কিন্তু কখনো এমন অনিচ্ছুক চোয়াল-জোড়ার সংগে কাজ করেনি।

মনে হলো যেন যুগ-যুগ ধরে তার দাঁতের মাড়ি টানাটানি করছি। কুল-কুল করে ঘাম শরীর থেকে ছোটো ছোটো নদীর মতো বইতে লাগলো। মাছিগুলি সেই ঘামে জাবড়ে গেলো।……অবশেষে একটা জিনিষে স্থির হলাম আর্থার

মীগরের জিভটা এখনো ঠিক আছে। চরম আঘাতে মাথা ঘুরে গর্তে পড়বার মুহূর্তে তার শত্রুপক্ষ ধরতে পারেনি তাকে।

ওপরের গর্তটার চারপাশে তাকালাম। হত্যাকারীরা অবশ্যই তাদের কাজ শেষ করবে। নীচে নামবার জন্য দড়ি বা ঐ জাতীয় কিছু তল্লাশের জন্য হয়তো তারা কোথাও গেছে। যে-কোনো মুহূর্তে ফিরবে তারা। একটা পাথরে মুঠো আমার শক্ত হয়ে গেলো। মীগরকে যেভাবে শেষ করেছে ওরা নিশ্চয়ই আমাকে সেভাবে খতম করতে পারবে না।·· ···

গর্তের অন্ধকারতম জায়গায় নিজেকে সরিয়ে নিলাম। তৈরী হও, নিজেকে বল্লাম, ওরা এলেই তুমি প্রস্তুত হবে।

কেউটের ছোবলের বাহক······হায় ভগবান! কীরকম লোক ওরা? দেহগুলি ওদের সাপের মতো আর মুখে রয়েছে ড্রাকুলার মতো দুটো দাঁত? কেঁপে উঠলাম। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গেলো কিন্তু ভয়ের চোটে সেটাও উবে গেলো। ···

শত চেষ্টা করেও ঘুমকে এড়াতে পারলাম না। চোখের পাতা ভারী হয়ে বুঁজে আসতে লাগলো।· · ·

ছিটকে আসা নুড়ির শব্দে ঘুম ভেংগে গেলো আমার। নুড়ির শব্দের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে কাণ খাড়া করলাম আমি। ওপরের দিকে তাকাতে ভোরের আলোর মৃদু আভাস পেলাম। তারপরেই পেলাম কোনো একটা লোকের গলার স্বর। রক্ত হিম মেরে গেলো। ওই ওরা মীগরের জিভের জন্যই আসছে।

নিজেকে অন্ধকারের আরো গভীর অংশে নিয়ে গেলাম। আর বিস্ফারিত চোখে গর্তের কাণার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সাপের মতোই জড়িয়ে জড়িয়ে দড়িটা প্রথমে নামলো। তারপর নামলো দুটো মানুষের কাঁধ আর মাথা। ড্রাকুলার মতো তাঁদের দাঁত বা কেউটে সাপও নয় তারা। কালো কোট-পরা মোটাসোটা লোক। মুখগুলি নির্দয় আর ভোম্বলের মতো। ঐ শয়তানগুলিই গদা-জাতীয় কিছু দিয়ে মীগরকে খুন করেছে—কেউটের ছোবলের বাহক। ·····

চোখ রাখলাম যখন তারা দড়ি পরীক্ষা করছিলো।······দুজনের মধ্যে মোটা লোকটা মাটিতে নেমেই মড়ার দিকে দৌড় দিলো। সে মৃতদেহের দিকে ঝুঁকে পড়বার আগেই দ্বিতীয় লোকটা গর্তে নেমে এলো। এখনো তারা আমার উপস্থিতি টের পায়নি।

পাথরটা হাতে নিয়েই আমি জীবন ফিরে পেলাম। দ্বিতীয় লোকটা মাটিতে পা দেবার আগেই আমি পাথর নিয়ে তার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তার মুখে পাথরের আঘাত দেবার আগের মুহূর্তে আমি তার অবাক হওয়া মুখটা দেখতে পেলাম। পড়ে যাওয়া তার দেহের ওপর আমিও হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। সেই সময়ই পেলাম ঝুলে-ওঠা দড়িটা। নতুন পাওয়া জীবনী-শক্তিতে উপরে উঠতে লাগলাম।

ইতিমধ্যে অপর মানুষটা মড়ার দিক ছেড়ে আমার দিকে ঘুরে তাকিয়েছে। আমি দড়িবেয়ে উঠে যাবার আগে সে রাগে ফেটে পড়তে চাইলো। গর্তের ধারে এসে দাড়টা ভারী ঠেকলো। সেও আমার মতো দড়িবেয়ে উঠছিলো। হতাশায় চারদিকে তাকালাম আর তুলে নিলাম আর একটা পাথর। তার মাথা ওপরে আসার সংগে সংগে আমার শেষ শক্তিটুকু জড়ো করে আঘাত করলাম। মুহূর্তের মধ্যে গর্তের নীচে ধপাস করে একটা শব্দ উঠলো। মীগরের উপযুক্ত শাস্তি এটা মনে করলাম।

মুক্ত-মুক্ত আমি। আমি যে ভাবে গর্তে চাপা পড়েছিলাম এই শয়তানগুলো সে ভাবেই ধরা পড়েছে। এখন আমার কাজ পুলিশকে খবর দেওয়া—তাই কী? মনে হয় এরাই একমাত্র কেউটের ছোবলের বাহক। কাছে-পিঠে নিশ্চয়ই আরো চেলাচামুণ্ডা এদের সাহায্যের জন্য ওৎপেতে আছে। নতুন কোনো খুন বা বড একটা আতংকের জন্ম দিতে ওরা বেঁচে বর্তে থাকবে।

একটা জিনিষ পরিষ্কার হয়ে এলো। সমাজের কাছে আমারও কিছু বাধ্য-বাধকতা আছে। এই শয়তানগুলিকে অবশ্যই পালাতে দেওয়া উচিৎ নয়। উপরে উঠলাম কোনো রকমে। সাবধানে ঘোরাঘুরি করে একটা গোলমতো পাথর পেলাম। সমস্ত ভারটা ওর ওপর রাখলাম। গড়িয়ে দিলাম সামনে। ঘরঘর করতে করতে গতি ওর বেড়ে গেলো। ছোটো-বড় নুড়ি ছিটকে যেতে লাগলো। নিজেকে নিরাপদে সরিয়ে নিতে না নিতে হিমবাহের আন্দোলন শুরু হয়ে গেলো। বেশ কয়েক টন পাথর গর্তটার মধ্যে পড়তে লাগলো। নরকে তালা লাগিয়ে দেবার যোগাড়। নরকে যা 'কেউটের ছোবল।' চিৎকার করে কেঁদে উঠলাম আর হঠাৎ একটা শূণ্যতা আমাকে পেয়ে বসলো। সবকিছুই জয় করেছি আমি—একজন নগণ্য দাঁতের ডাক্তার।

পাথরের নদী পর্যন্ত বুকে হেঁটে যাওয়া দীর্ঘপথের কষ্ট আমি জীবনে আর

কখনো ভোগ করিনি। পায়ের ব্যথা অসহ্য। অত্যন্ত সুখী আমি। আমি সমাজের জন্য, সত্যধর্মের জন্য আঘাত দিয়েছি।

মোটর গাড়ী পর্যন্ত আর পৌছাতে পারলাম না।......অজ্ঞান হয়ে গেলাম একসময়। পরে শুনি একদল ভ্রমণার্থী আমাকে উদ্ধার করে।

পরের দিন হাসপাতালে আমি উঠে বসেছিলাম। পায়ে প্ল্যাষ্টার দিয়ে বাঁধা। ঠিক এই সময়ই পুলিশ-তরফের ইনেস্‌পেক্টর ব্লানচোঁ দেখা করলো আমার সংগে। বিরাট লম্বা, সিঁদুর গোলার মতো লম্বাটে লাল মুখ। আমার গল্প সে শান্তভাবে শুনে গেলো। বল্লে সে, "তাহলে মশাই, নিজের কাজে আপনি খুবই গর্বিত এখন?"

হাসলাম। তারপরই ঠাট্টা জুড়লাম, "দাঁতের ডাক্তার না হয়ে পুলিশ হলেই আমায় মানাতো ভালো।"

"পুলিশ-বাহিনীতে কিছু চাকরী খালি আছে," নীরসকণ্ঠে বলে উঠলো সে। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে খাবি খেলাম। চোখে তাঁর ঘৃণা, "আপনার শিক্ষা হওয়া দরকার," গর্জন করে উঠলো সে' "মীগরের হত্যাকারীকে আমরা ইতিমধ্যেই ধরে ফেলেছি। মৃতদেহটা উদ্ধারের জন্য আমি দুজন লোককে পাঠিয়েছিলাম। ওদের দু'জনকেই আপনি অপদার্থের মতো শেষ করে দিয়েছেন। ফরাসী দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ দুজন গোয়েন্দা তারা!"

॥ সম্পূর্ণ রহস্যোপন্যাস ॥

ভাবানুবাদ/শম্ভু ঘোষাল

ঘুম ঘুম রাত

জেমস্ হেডলী চেজ্

(১)

মানুষটা সার্কামেনটো অঞ্চলে গ্রেহাউণ্ড বাসটায় ঠিক আমার পাশেই চেপে বসলো। দেখে মনে হল সে যেন উনবিংশ শতাব্দী থেকে সরাসরি চলে এসেছে। মার্ক টোয়েন মার্কা গোঁফ, টাই, আল্‌পাকা কাপড়ের একপ্রস্থ প্যান্ট-কোট আর সাদা ষ্টেটসন্ টুপী। বছর ষাট-পঁয়ষট্টি বয়েস। ঢাই পেট। অন্ধকারে সেটাকে নোংরা ফেলার ক্যানাস্তারা মনে করার সমূহ সম্ভাবনা। বাস চলতে আরম্ভ করলে আলাপ-জুড়লে সে। "কতোদূর? অধমের নাম জো-পিনার, নিবাস উইকষ্টীড্।"

কুৎকুতে বাদামী চোখের আড়ালে সে আমায় দু-বছরের পুরণো দুশো-ডলারে কেনা কোট-প্যান্ট জরিপ করে চলেছেন। বল্লাম, "কীথ ডেভারী. নিউইয়র্ক"

কথা চালালেন জো-পিনার, "ডেভারি সাহেব আগে উইকষ্টীডে কখনো গেছেন?"

যায়নি শুনে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন জো-পিনার। "প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্তী শহরগুলির মধ্যে সর্বোত্তম।"

"মাপ করবেন, আমি ফ্রিসকো যাচ্ছি।"

"উদ্যোগী যুবকদের উইকষ্টীডে কখনো কাজের অভাব হয় না।"

মনে মনে ভাবলাম লোকটা বোধহয় ঠিকই বলেছে, গত দশমাস ধরে তো অনেক কাজই করলাম। আর পকেটে এখন রয়েছে উনষাট ডলার সাত সেণ্ট। চুরুটে টান মারতে মারতে পিনার বল্লেন "শত অসুবিধা হলেও উইকষ্টীডে আপনার একবার থামা উচিৎ। উইকষ্টীড বন্ধুর মতো সকলের দিকেই হাত বাড়ায়।"

কিছুক্ষণ পরে আবার তিনিই বল্লেন, "ডেভারি সাহেব মোটর গাড়ী চালানোটা রপ্ত আছে?"

"নিশ্চয়ই।"

"মোটর গাড়ী চালানো—শেখানো হয় এমন কোনো ইস্কুলে মাষ্টারীর কাজে ইচ্ছা করেন?"

মুখটা আপনা থেকেই বিকৃত হয়ে গিয়েছিলো, "কী বলছেন? গাড়ী চালানোর মাষ্টার? ঐ কাজের জন্যও আপনার বিদ্যার দরকার।"

"উইকষ্টডে ঐ চাকরী পাওয়া আকাশের চাঁদ পাকড়ানোর গোছের কোনো ব্যাপার নয়। আমরা অল্পে সন্তুষ্ট মানুষ। খুব ভালো মোটর চালিয়ে, নিখুঁত লাইসেন্স আর প্রচুর ধৈর্য, ব্যাস্ খতম। আমার বন্ধু বার্ট রাইভার ঐরকম একটা ইস্কুলের মালিক। ওর ইনসট্রাকটর হাসপাতালে। মজা হচ্ছে বার্ট কখনো জীবনে মোটর গাড়ী ছোঁয়ানি।"

"প্রস্তাবটা ভালোই।" দেখুন এতো দিনে নিশ্চয়ই নুতুন লোক এসে গেছে। আনন্দের আতিশর্য ঢাকতে বললাম আমি।

"আজকের সকাল পর্যন্ত তো নয়।"

নিজের বিশ্রী স্যাটকেস নিয়ে বাস ষ্টেশনের স্নান ঘরে ঢুকলাম। দাড়ি কামিয়ে ভালো করে স্নান সারলাম। গায়ে চড়ালাম সবচেয়ে ভালো জামাটা। আয়নায় মুখ দেখে মনে হবে না ঘৃণ্য কোনো অপরাধে পাঁচ বছর আমাকে জেলে কাটাতে হয়েছে। জুতোটাও পালিশ করতে ভুললাম না।

বেরিয়ে পড়লাম রাইডার এর মোটর চালানো শিক্ষার জায়গাটার সন্ধানে। যা বলেছিলেন পিনার ভদ্রলোক ঠিক তাই। পথের সারসার বাড়ীর একটায় গেলাম ইস্কুলটা একতলা বাড়ী। ঝকঝকে হলুদে সাদায় মেশানো রং। বাড়ীর ছাদে নাম। খোলা দরজা পেয়ে ঢুকে গেলাম ভেতরে।

সদ্য স্কুল থেকে বেড়িয়ে এসেছে, শূয়োরের লেজের মতো চুল, টকটকে ফর্সা গোল সুন্দর মুখ। পৃথিবীটা কতো খারাপ জায়গা এটা বোঝবার আগের স্তরে আছে মেয়েটা। টাইপ করা হাত থামিয়ে হাসলো সে।

"রাইডার সাহেব আছেন?"

"আছেন। চলে যান, এখন কোনো কাজের ঝামেলা নেই।" হাত দিয়ে ঘরটা দেখিয়ে দিলো সে।

টেবিলের ওধারে যে লোকটা বসেছিলো তাকে দেখেই আমার হ্যারি এস. ট্রুম্যানের কথা মনে পড়ে গেলো। লোকটার বয়স কম করেও পচাত্তর বছর। মাথায় টাক। চোখে চশমা। উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। বন্ধুর হাসি মুখে, আসুন, আসুন। আমিই বার্ট রাইভার।

"আমি কীর্থ ডেভ্যারি।"

"খুব ভালো কথা ডেভারি সাহেব। তা আপনার জন্য কী করতে পারি?" বসে পড়লাম আর দু-হাঁটুর ফাঁকে হাত কচলাতে লাগলাম।

"জো পিনারের সঙ্গে বাসে আলাপ হলো। রাইডার সাহেব, শুনলাম আপনি একজন গাড়ী চালানো শেখাবে এমন একজন মাস্টার খুঁজে বেড়াচ্ছেন?"

"জো পিনারের কথা বললেন?" মাথা ঝাঁকালেন, "সত্যি অপরের জন্য মানুষটা কতো চিন্তা করে। ভালো কথা, মাষ্টার হিসেবে অভিজ্ঞতা টভিজ্ঞতা আছে কিছু ডেভোরি সাহেব?"

"না, তবে খুব ভালো গাড়ী চালাতে পারি। নিখুঁত লাইসেন্স আর প্রচুর ধৈর্য আছে আমার। পিনার সাহেব বলছিলেন ও গুলি থাকা একান্ত দরকার। রাইভার খ্যা খ্যা করে হেসে উঠলো, "আপনার লাইসেন্স-টা দেখতে পারি?" লাইসেন্স-টা দেখলেন তিনি। হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, পাঁচ বছর কী হয়েছিলো আপনার?"

তাকালাম তাঁর দিকে। একসময় কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঠে পড়লাম, "দুঃখিত, আপনার সময় বেশ কিছুটা নষ্ট করলাম, রাইডার সাহেব।"

"বসে পড়ুন, বসে পড়ুন ভেভারি সাহেব।"

আবার চেয়ারে বসে পড়লাম। করুণভাবে হাসলেন রাইভার, "আপনি কী দয়া করে লাইসেন্সে দাগ পড়ার ব্যাপার-টা বলবেন?"

"হ্যা। আমি একসময় প্রথম সারির একজন দালাল ছিলাম। কাজ করতাম বারটন সেরম্যান-দের ওখানে। ওরা ছিলো মেরিল লিঞ্চের ঠিক পরের সারির দালাল। ভিয়েতনামে উচ্চাভিলাষী কিছু মানুষের সংগে আমার আলাপ হয়েছিলো। তারাই আমাকে শিখিয়ে ছিলো কালোবাজারে অল্প টাকা খাটিয়ে কী করে প্রচুর টাকার মালিক হওয়া যায়। দুটো দালাল-সংস্থা অর্থাৎ মেরিল লিঞ্চ আর বারটন সেরম্যান এক হয়ে যাচ্ছে। জীবনে সুযোগ একবারই আসে। আমার সব ধ্যান ধারণা নিয়ে এই এক হয়ে যাওয়া গুজবের ওপর বিশ্বাস করে একজন খদ্দরের সব টাকা ঢাল্লাম। না, জুয়ো খেলাটা চল্লো না। গুজবটা গুজবই। পরিণামে আমার হলো পাঁচ বছরের জেল।"

"এখনও কী আপনার বড়লোক হবার নেশা আছে?"

"পাঁচ বছর ছোট একটা কুঠুরিতে দিন কাটানোয় যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে আমার।"

"আমার চাকরীটা কী আপনি করবেন? মাসে দুশো ডলার।"

"ধন্যবাদ, কাজে লাগতে হচ্ছে কবে?"

"কালকে সকাল থেকে। বাইরের মেয়েটার সংগে কথা বলুন। ওই চাকরীর ব্যবস্থা পত্র-টত্রগুলি ঠিক করে দেবে।"

পকেটের ম্যা নব্যাগ থেকে একশো ডলারের একটা নোট বের করে টেবিলে রাখলেন, "ধরুন, এটা আপনার অগ্রিম। থাকবার তো একটা জায়গা চাই, কী বলেন? এ ব্যাপারে আপনি শ্রীমতী হ্যানসানের সংগে দেখা করুন।"

* * * *

একদিন বিকেল ঠিক ছ-টার সময় বাট্ রাইভারকে শুভ-রাত্রি জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম তারই গাড়ীটা নিয়ে। রাইভার গাড়ীটা প্রায় আমাকে গছিয়ে দিয়েছে। নিজে গাড়ী চালাতে জানে না। পেট্রোলের খরচ আমার। চল্লাম আমার বাড়ীউলি শ্রীমতী হ্যানসেনের ডেরায়।

পুলিসের সাইরেনে চমকিত হলাম। ডান দিকে তাকালাম। বাদামী পুলিশী পোষাকে লম্বা লোক একটা। মাথায় ধূসর ষ্টেট্সন্ টুপী। হিপ-পকেটে পিস্তল। আংগুল তুলে ঈশারা করলো আমায়।

আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। হাত ঘামে ভিজে গেলো। বুকের ধুক্-পুকানিটা হঠাৎ বেড়ে গেলো—যখন দেখলাম আয়নার মধ্যদিয়ে মানুষটি হেলতে দুলতে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। শার্টের একটা হাতায় ব্যাজ রয়েছে—সহকারী সেরিফ এবেল রস্।

"আরে ম্যাক গাড়ীটা কী তোমার না কী?" সিনেমায় দেখা যায় এরকম এক কর্কশ গলায় মানুষটি বলে উঠলো।

"না, গাড়ীটা আমার নয়। আর আমার নাম-ও ম্যাক্ নয়। আমার নাম ডেভারি।"

সরু চোখ জোড়া সে আরো ছোটো করলো, "যদি গাড়ীটা তোমারই না হলো তবে গাড়ীটা নিয়ে চল্লে কোথায়?" "বাড়ী যাচ্ছি সহকারী সেরিফ রস্ সাহেব।"

"তা ম্যাক্ মশাই রাইভার সাহেব এটা জানেন তো?"

"আবার বলছি, সহকারী শেরিফ রস্ সাহেব আমার নাম ডেভারি," বল্লাম আমি, "হ্যাঁ তিনি জানেন।"

"লাইসেন্স-টা দেখি।" শুওরের পেছনের পায়ের মাংসের মতো বিরাট হাত-টা ও মেলে ধরলো। দিলাম লাইসেন্স খানা। মনোযোগ দিয়ে দেখলো সে, "লাইসেন্স-টা নূতুন করা হয়েছে দেখছি। আচ্ছা পাঁচ বছরের ব্যাপারটা কী?"

"পাঁচ বছর মোটর চালাতাম না।"

"কেন ?"

"গাড়ীর দরকার ছিলো না ."

"আগে তো কখনো দেখা যায়নি। এই সহরে কী করতে আসা হয়েছে ?"

"রাইভারের মোটরের কারখানায় নৃতুন মাষ্টার আমি। গাড়ী চালানো শেখাই। সন্দেহ থাকলে আপনি রাইভারকে জিজ্ঞাসা করে নিতে পারেন।"

"ঠিক। নূতুন লোক দেখলেই আমরা যাচাই করে নেই। বিশেষত যদি দেখি সে পাঁচ বছর মোটর চালানো বন্ধ রেখেছে।" চলে গেলো। রাস্তায় অপর পাশে একটা বার। নাম লেখা আছে প্রবেশ পথে জো'র বার। নেশায় পেয়ে বসলো। চাবি দিয়ে ঢুকলাম বার-টায়।

"আরে ডেভেরি সাহেব, আসুন, আসুন," এক ঝলকে মনে হয় বছর পঞ্চাশ বয়েস, বেঁটে-খাঁটো, মোটা। সুখী চেহারা।

"আপনাকে দেখে খুবই আনন্দ পেলাম। অধমের নাম জো সামারস্। জায়গাটার মালিক। কোন্ পানীয় চলবে ?"

"স্কচ্ অন্ দি রক," কিছুটা বা ভয় নিয়ে আঁচ করতে লাগালাম লোকটাকে, "আপনি আমার নাম জানলেন কী করে ?" হাসলে মানুষটা, "আমার ব্যাটা আজ সকালেই আপনার কাছে মোটর চালাতে শিখতে গিয়েছিলো।"

মদে চুমুক দিতে দিতে কোণের দুটো মানুষের দিকে নজর গেলো আমার।

"জো! এদিকে এক পাত্তর স্কচ্ নিয়ে এসো তো বাপ!" চিৎকার করে উঠলো চার্লি চ্যাপলিন গোঁফ, কালো-নীলচে এক প্রস্থ কোট-প্যান্ট পরা সাদা জামা লাল টাই-ওলা মানুষটা, "কী হলো দিয়ে যাও না বাওয়া এক পাত্তর।"

"মাপ করো ফ্রাংক, তোমাকে গাড়ী চালিয়ে বাড়ী যেতে হবে।" জো উত্তর করলো, "বে-সামাল হবার মতো বেশ কয়েক পাত্তর মাল টেনেছো তুমি।"

"কে বল্লো আমি গাড়ী চালাচ্ছি ? টম-ই তো আমাকে বাড়ী পৌঁছে দিচ্ছে গাড়ীতে।"

"না বাবা আমার দ্বারা হচ্ছে না," ফ্রাংকের পাশের হাড় ডিগ্‌ডিগে লোকটা বল্লো, "তুমি ভাবলে কী করে আমি আট মাইল রাস্তা পায়ে ঠেংয়াবো ?"

"আচ্ছা, দাদা আমি কী আপনাদের সাহায্য করতে পারি ?" প্রস্তাব টা দিলাম এবার আমি। মোটা মানুষ ফ্রাংক ঘুরে তাকালো আমার দিকে, "তুমি লোকটা কে হে ?"

"কী হচ্ছে ফ্রাংক, এভাবে কথা বলো না," জো বল্লো, "উনি হচ্ছেন

ডেভেরি। আমাদের নূতুন মোটর চালাবার মাষ্টার মশাই। বার্টের মোটর চালাবার ইস্কুলটায়।"

শুকনো মানুষটা আমার হাত দুটো জাবরে ধরলো, "সত্যি আপনার দয়ার তুলনা নেই, ডেভারি সাহেব। বাঃ, ঝামেলা তো মিটেই গেলো। ভালো কথা, আমি হলাম টম মেসন্। আর ও হলো ফ্রাংক মার্শাল।"

মার্শাল আর টম একটা ঝরঝরে সবুজ প্লাইমাউথে উঠলো। আমি গাড়ী নিয়ে ওদের পিছন পিছন গেলাম। শেষমেষ একটা কানা রাস্তায় একসময় গিয়ে পৌছালাম। লোকটার বাড়ীটা দোতালা। নির্জন, গাছের জটলা আর ঝোপ-ঝাড় প্রায় অর্ধেক বাড়ীটা ঢেকে রেখেছে।

লোকটাকে বাড়ীতে পৌছে দিয়ে গাড়ীতে উঠতে উঠতে শুকনো মানুষ টম বল্লো, "সত্যি আপনি চমৎকার ডেভারি সাহেব। ওর স্কুলের বয়স থেকেই আমার ওকে চেনা। মাল না টানলে লোকটা চমৎকার। দোষও দেওয়া যায় না ওকে। লোকটা একদম হতাশ হয়ে গেছে। দশ লক্ষ ডলারের বেশী সম্পত্তির ফ্রাংক উত্তরাধিকারী"

কথাটা শুনে সোজা হয়ে বসলাম খুব মনোযোগ দিলাম লোকটা কী বলে না বলে শুনতে।

(২)

রাতের খাওয়া-দাওয়ায় পর টম মেসনের কথাগুলিই চিন্তা করতে লাগলাম। পাঁচ বছর ধরে সত্যিকারের মালকড়ির ধান্দায় আছি আমি। এখন এই ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুরে কী সেই রোশনাই দেখা যাচ্ছে ?"

পাঁচ বছরের জেল জীবনে আলাপ হয়েছিলো এক জোচ্চারের সংগে। সে সব সময় তার জোচ্চুরির প্রশংসা করতো, বলতো মানুষটা,—একজনের দু ডলার এলে সে চার ডলারের ধান্দা করে। পাঁচ হাজার থাকলে, কামনা করবে দশ হাজারের। মানুষের সংস্কার এটা। আমার জানা একজনের পঞ্চাশ লক্ষ ডলার ছিলো। তার ধ্যান-জ্ঞান ছিলো কী করে ওই টাকা-টা সত্তর লক্ষ করা যায়। মানুষ তার নিজের অবস্থায় কখনোই সুখী নয়।

মার্শাল উত্তরাধিকারী সূত্রে যা পাবে সেটা চোরের সুবিধার জন্য এখানে সেখানে পড়ে থাকবে না। দালাল আর ব্যাংক-কর্তৃপক্ষ যত্ন নেবে। আমি নিজেও এক কালে দালাল ছিলাম। সত্যি যদি মার্শান কয়েক লক্ষ টাকা পায় তাহলে বাজী রেখে বলতে পারি ভজুং ভাজুং দিয়ে ঠিক আমি ও টাকা

বগলদাবা করবো। আমার পক্ষে একটা সুবিধে আছে। লোকটা মদ খায়। যতোদূর বুঝতে পারছি—ভালো একটা টোপ দিলে মর্শাল অবশ্যই গিলবে। একটা জিনিষ জানা খুবই দরকার—ওর বৌয়ের ব্যাপারটা।

যে করেই হোক মার্শালের বন্ধু সাজতে হবে। মদে চুর হবার ফাঁকে ওকে গাঁথতে হবে। তারপর নাড়ী নক্ষত্র সব টেনে বার করবো। কিন্তু ব্যাপারটা খুব একটা সোজা হবে বলে মনে হচ্ছে না।

পরের দিন বিকেল ঠিক ছ টায় বার্ট রাইডারের স্কুল থেকে বেরিয়ে জো-এর বারে এসে ঢুকলাম। আগের দিন টম মেসন ফ্রাংকের টাকা পয়সা ব্যাপারটায় যা বলেছিলো সেটাই জো-এর কাছে যাচাই করে নিলাম। তারপর তার ছেলে সমি-র গাড়ী চালানো ব্যাপারটা নিয়ে যখন কথা চালাচ্ছি—ঠিক তখনই বিরাট দশাসই চেহারার একজন বারে ঢুকলো। তাকালাম তার দিকে,—ব্যস্ আমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়ার জোগাড়। হ্যা লোকটার গায়ে ধূসর জামা। মাথায় ষ্টেটসন্ টুপী। আমার কাছেই দাঁড়ালো সে। অভিবাদন জানালো জো-কে। বল্লো জো, "তারপর কী খবর স্যাম? বলো তোমার কী সেবা করবে পারি?"

—"বীয়ার দিতে বলো।"

"ভালো কথা স্যাম, এই হচ্ছে আমাদের ডেভারি সাহেব," গ্লাশে মদ ঢালতে ঢালতে জো বলে চলে, "বার্ট-এর স্কুলে নতুন গাড়ী চালানো শেখাবার মাষ্টার।"

"নমস্কার, নমস্কার" বলতে বলতে ম্যাক্ কুইন্ হাতটা বাড়িয়ে দিলো।

হাত ঝাঁকালাম আমরা, কিছুক্ষণ চুপচাপ। নীরবতা ভাংগলেন ম্যাক্-কুইন,—"আপনার কথা শুনেছি ডেভারি সাহেব। আসুন, বসা যাক। সমস্ত দিন ঠায় দাঁড়িয়ে আছি।"

মদের গ্লাশটা নিয়ে আমিও তার পাশের চেয়ারে বসে পড়লাম। মানুষটা একটা চুরুট এগিয়ে ধরলো। বল্লাম, "ধন্যবাদ, আমি চুরুট খাই না।" সিগারেট ধরালাম নিজে।

"উইকষ্টীড্ আপনাকে স্বাগতম জানাচ্ছে। ভালো কথা, আমার ছোকরা শেরিফের সঙ্গে কী হয়েছিলো আপনার?"

"ওঃ, ভদ্রলোক ভেবেছিলেন আমি বোধহয় বার্ট-এর গাড়ী চুরি করেছি।"

"ওর খুব বিরাট আশা। সত্যিকরের কেউকেটা হতে চায় ও। আমিও চাইছি,—যেখানে খেল জমে সেই ফ্রিসকোতে ওকে পাঠাতে। ব্যাটাচ্ছেলে

কিছু বলার আগেই আপনার গাড়ীর কাগজ পত্র দেখে বসে আছে। রিপোর্ট-টা পড়ে আমার মনে হলো, আমার নিজেরই একবার জিনিষট দেখা উচিৎ। সকলের সঙ্গে কথা বল্লাম আমি। রাইডার, পিনার মেসন। এমন কী শ্রীমতী হ্যানসেনের সঙ্গে কথা বলতেও পিছালাম না। আমি সককেই জিজ্ঞাসা করলাম—আগন্তুক হিসেবে তারা আপনার সম্বন্ধে কী ভাবে। বুঝতেই পারছেন—এ শহরের নুতুন মানুষদের নিয়েই আমার কারবার। আশ্চর্যভাবে সকলেই আপনাকে ভালো বল্লো। শুনুন, এশহরের কেউ আপনার সঙ্গে ঝামেলা করবে না, যদি না আপনি নিজে আগ বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পরিষ্কার হয়েছে ?"

"বুঝতে পেরেছি শেরিফ সাহেব।" মুখটা যেন আমার বালি বালি ঠেকলো।

চতুর্থ দিন সকালবেলা ভাগ্য আমার খুলে গেলো। শ্রীমতী হ্যানসেন সকালের জল খাবার নিয়ে এলেন। "আমার উপকার করবেন একটা ?"

"বলুন, বলুন।"

"আমার বোন তার স্বামীর সঙ্গে খামারে থাকে। প্রায়ই তাদের চাষের ফসল থেকে এটা-ওটা পাঠায়। এখন আপনি কী দয়া করে ফ্রিসকোতে আমাকে পাঠানো জিনিষ নিয়ে আসবেন ?" "হ্যাঁ" ষ্টেশন মাষ্টার হেইনস্‌কে বলবেন আপনি আমার তরফ থেকে মালটা ছাড়াচ্ছেন। অজস্র অনুবাদ, ডেভেরি সাহেব।"

অফিস ছুটির পর রেল-ষ্টেশনে পৌছালাম। অন্যমনস্কভাবে সিগারেটটা ধরাতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ চোখে পড়লো সহকারী শেরিক রস পুলিশের একটা গাড়ী থেকে বেরিয়ে আসছে। ঘুরে দাঁড়ালাম ট্রেনের আওয়াজে। ষ্টেশন মাষ্টার এলেন ঠিক তখুনি, "এই যে ডেভারি সাহেব, এই জায়গায় সই করুন।" সই করতে করতেই দেখতে পেলাম মার্শাল বগী থেকে নাবছে। নাবা দেখে মনে হলো মানুষটা যেন এভারেষ্টের চূড়ো থেকে নাবতে চাইছে। পুরো মদে চুর। ষ্টেশনমাষ্টার হেইনস্‌ অফিসে ঢুকে গেলে মার্শাল আমার দিকে টলতে টলতে এগিয়ে এলো। পড়েই যাচ্ছিলো বোধহয়—পার্শেলের বাক্সটা মাটিতে রেখে ধরে ফেল্লাম ওকে, "মার্শাল সাহেব," ঘুরলো আমার দিকে চোখ পিট্‌পিট্‌ করতে করতে, "কে ?" "জো-এর মদের আড্ডায় মোলাকাত হয়েছিলো আমাদের। আমি ডেভারি।"

"তাতে চুলোর ছাই হলোটা কী ?"

"মনে হলো আমার আপনাকে বলা দরকার সহকারী শেরিক রস বাইরে অপেক্ষা করছেন। ঝামেলা এড়াতে মনে করুন না কেন আমি আপনাকে

গাড়ী ত করে বাড়ী পৌছে দিয়ে এলাম। হ্যা, আমার সময়ও আছে প্রচু", ।" মাথাটা সে একদিকে ঝুঁকিয়ে দিলো। অবাক হয়ে তাকালো। "বন্ধুর মতোই কথাটা ছেড়েছো। ঠিক তো ইয়ার ?"

"নিশ্চয়ই ।"

গাড়ী ছাড়লাম। বকবকানি আরম্ভ করলো ফ্রাংক মার্শাল, "দেখে নিও, ঐ হারামী রসকে আমি দেখে নেবো। কয়েক দিনের মধ্যেই হবো আমি এই নোংরা শহরটার সবচেয়ে বড়লোক !"

"মার্শাল সাহেব, কী বলছেন ?" গাড়ীটা তখন প্রধান সড়কে ঢুকে গেছে।

"ঐ সব সাহেব-টাহেব ছাড়ো। আমি আমার বন্ধুদের কাছে শুধু ফ্রাংক। ফ্রাংক নামেই ডাকবে। তোমার ডাক নামটা কী ?"

"কীথ।"

"হ্যা', নামের মতো নাম একটা।" লোকটার গাছ পালায় ঢাকা বাড়ীটার এসে পড়লাম এক সময়। যাক রাস্তা টা ঠিকই চিনতে পেরেছিলাম। সামনের দরজা খুলে হাত ধরে মার্শালকে নামিয়ে নিলাম।

"ফ্রাংক আমরা এসে গেছি।"

"উত্তেজনায় শরীরটা টান টান হয়ে গেলো। শ্রীমতী মার্শালকে যাচাই করা দরকার—সে আমার ধান্দায় কতোটুকু সাহায্য করতে পারে। না কেউই এলো না। বার বার তিনবার ঘন্টিটা টিপে ধরা সত্বেও ভেতরের কেউ এসে দরজা খুললো না। মার্শালকে তার নাক ডাকার শব্দে ডুবিয়ে রেখে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে গেলাম আমি নোংরা আর ধুলোয় ভরা রাস্তাটা দিয়ে। পাক্কা আট মাইল।

পরের দিনটা শনিবার। পোষাক-টোষাক পরা শেষ করতেই শ্রীমতী হ্যানসেন সকালের জল খাবারের ট্রেটা নিয়ে হাজির, "কাল রাতে অতো রাস্তা পায়ে হেঁটে নিশ্চয়ই নিজেকে ক্লান্ত বোধ করছেন ?" ট্রেটা রাখলেন ভদ্রমহিলা টেবিলে, "বা-ব্বা ! এক নাগাড়ে আট মাইল !"

"না, ভাগ্যটা আমার ভালোই বলতে হয়। পথে একজন আমাকে গাড়ীতে তুলে নেয়।" বল্লাম ভদ্রমহিলাকে আর ওটা ঘটনাও বটে। কিছুক্ষণ পরে শ্রীমতী হ্যানসেন বল্লেন, "কালকে—রবিবার। ছোটো খাটো একটা খাওয়ার আয়োজন করেছি। কেবল আমার দাদা আসছেন। আমাদের সঙ্গে যোগ দিন না কেন ডেভরি সাহেব ?" কিছুটা বা আশ্চর্য হলাম আর সানন্দে

নেমন্তন্নে রাজী হয়ে গেলাম। ভদ্রমহিলার যে একটা ভাই আছে জানতামই না।

কথা প্রসঙ্গে বার্ট রাইডারকে নেমন্তন্নের কথাটা বল্লাম। ওঁর ভাইও যে আসছে সেটাও বল্লাম। বল্লে বার্ট, "ভাইটি হলেন উইল ওলসন্। এ অঞ্চলের একমাত্র উকিল। শহরটার সব মামলা মোকদ্দমা ওই দেখে। ভালো লোক। তোমারও ভালো লাগবে।

শ্রীমতী হ্যানসেনের নেমন্তন্নের দিন উকিল ওলসন স্বীকার করলেন। সত্যি ফ্রাংক কয়েক লক্ষ টাকা উত্তরাধিকার সূত্রে পাচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটা হলো বৌকে নিয়ে। যতোদূর শোনা যাচ্ছে বৌটা সন্ন্যাসিনীর মতো থাকে। ঠাণ্ডা মাথার মেয়ে না হলে আমার সৌন আবেদনে নিশ্চয়ই সাড়া দেবে—ভাবলাম আমি। খেলিয়ে তুলতে পারলে বর-ব্যাটার থেকে ওই বেশী সুলুক-সন্ধান জানাবে। কিন্তু মূল সমস্যা থেকেই যাচ্ছে ওকে দেখা পাই কী করে? না ঘুমটা আর হলো না ছাই। সাঁতারের পোষাক পরে—তোয়ালেটা কুড়িয়ে সমুদ্রের তীরে চলে এলাম।

শ্রীমতী হ্যানসেনের ডেরায় ফেরবার পথে কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছে। পিছু ফিরে দেখি পিনার। হাতের ইশারা করলেন তিনি। মানুষটা তালগাছের ছায়ায় লম্বা চেয়ারে গা এলিয়ে বসে। পাশেই বসে পড়লাম আমি। চুরুট ধরিয়ে বল্লেন তিনি, "শুনলাম ফ্রাংককে তুমি নানা ভাবে সাহায্য করেছো। সত্যি সাহায্যের দরকার ওর এখন। অনেক বন্ধু অবশ্য ওর জুটে গেছে।" সিগারেটের ছাই ঝাড়লাম আমি, "আচ্ছা পিনার সাহেব, ওকে নিয়ে অতো মাতামাতি করার দরকার কী?"

"কারণটা হলো আমাদের নগর পরিকল্পনা সমিতি। আমি তার একজন সভ্য। বহুৎ দিন ধরে আমাদের একটা পরিকল্পনা আছে। শ্রীমতী ফ্রেমলিন মানে সেই নার্স ভদ্রমহিলা যাঁর টাকার ফ্রাংক উত্তরাধিকারী হচ্ছে,—তাঁর কাছেও পরিকল্পনাটা পেশ করা হয়েছিলো। কিন্তু ভদ্রমহিলা কোনো সাড়া দেননি। আমার মনে হয়—তোমার ভারী কোনো অসুখ হলে—তুমিও ঐ ভবিষ্যতের পরিকল্পনা টল্পনায় সাড়া দেবে না। ভদ্রমহিলা অবশ্য বলেছিলেন তাঁর দেহান্তরের পর ভাইপো ফ্রাংকই সব কিছু পাচ্ছে। সুতরাং যা হয়—ঐ সব করবে।

খুব সাবধানতার সঙ্গে এবার আমি প্রশ্ন রাখলাম, "কিছু যদি মনে না করেন, —আপনাদের পরিকল্পনাটা কী নিয়ে?"

"না, না, মনে করার কী আছে। আর এটাও এখন ঢাকঢাক্ গুড়গুড় জাতীয় কিছু নয়। শোনো আমাদের শহরটায়—একটা প্রমোদোভানের অভাব আছে। হ্যা, ভালো একটা হোটেলও নেই। আমরা যদি এখানে প্রমোদোভান খাড়া করতে পারি তাহলে প্রচুর দর্শনার্থী জুটবে। কিন্তু খরচ আছে—প্রায় পাঁচ লাখ ডলার। একার কাজ নয় এটা। চাঁদা করে টাকাটা তুলতে হবে। তাই মার্শালের বেলায় চাঁদা ধরা হয়েছে প্রায় লাখ তিনেক ডলার। যদি ও টাকাটা দেয়, তাহলে দর্শনীয় বস্তুর মানচিত্রে উইকষ্টীডের নামটা উঠবে।" আমি বল্লাম এবার,—

"পরিকল্পনাটা তো ভালোই বলতে হবে। ফ্রাংকের মনোভাবটা কী?" চুরুটে টান মারলেন পিনার। মুখটা বিকৃত হলো কিছুটা,—"ওখানেই গলদ। মানুষটা তো ঝেড়ে কাশছে না,—বলে ওকে চেয়ারম্যান করতে হবে। যদি বলি,—টাকাটা লগ্নী করলে ও ভালো টাকাই পাবে। তখন বলবে,—টাকা তো এখনো হাতে পায়নি। তারপরেই সাফ্ কথা বলে দেবে,—টাকা হাতে এলে ব্যাপারটা খতিয়ে দেখবে।" আবার আমি বল্লাম,—"ওর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন? কিছু কিছু মানুষ বৌয়ের কথায় ওঠে-বসে। ভদ্রমহিলা স্বামীকে রাজী করতে পারেন না?"

জোরে শ্বাস ফেল্লো পিনার, "আজো আমরা কেউ ভদ্রমহিলাকে দেখিনি।"

"কী ব্যাপার! ওদের বিয়ে কতোদিন হলো হয়েছে?"

"মদে মাতাল হবার আগে—তা বছর তিনেক হলো।"

"ওদের তো কোনো ছেলে-পুলেও নেই?"

"না, ছেলেপুলেও নেই, নেই কোনো আত্মীয় স্বজন।"

ফেরার পথ ধরলাম। শ্রীমতী হ্যানসেনের কুটীরের দিকে। মজা পেলাম, আমি যেমন মার্শালের টাকায় নোংরা হাত ঠেকাতে চাই ঠিক তেমনি উইকষ্টীড পরিকল্পনা সংস্থা ঐ টাকায় সমান লালা ঝরায়।

(৩)

জো পিনারের প্রতিজ্ঞা—যে করেই হোক মদের কেলেংকারী থেকে মার্শালকে বাঁচাতেই হবে। কিন্তু পুরোপুরিই ব্যর্থ হলো সে। ব্যাপারটা হলো যখন আমি শ্রীমতী হ্যানসেনের বাড়ীতে ঢুকেছি, ঠিক তখনই। "ও, ডেভেরি আপনি এসেছেন তাহলে! বাঁচলাম, ম্যাক্‌কুইন সাহেব আমার ভাইকে ফোনে ধরতে পাচ্ছেন না। গীর্জায় কোনো ফোন নেই। আপনি কী আমাকে সাহায্য করবেন?"

"নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! কিন্তু ব্যাপারটা কী?"

"ব্যাপারটা মার্শালকে নিয়ে। ও তো মোটর গাড়ীতে এক্সিডেন্ট বাঁধিয়ে বসেছে।"

ছুটে বেরিয়ে গেলাম গীর্জার পথে কোনো রকম জামা-কাপড় পাল্টে। পথে দেখলাম ওলসন গীর্জা থেকে বেরিয়ে আসছেন।

"শেরিফ ম্যাককুইন আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।" বললাম আমি, "মার্শাল কোনো একটা ঝামেলায় পড়েছে। মোটর গাড়ীর ঝামেলা। মারধরও করেছে বোধহয়। থানায় বসে আছে সে।" গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। গীর্জার কাছে ফোন করার খুপরীতে ঢুকে পড়লাম। পাতা উল্টে জো পিনারের টেলিফোন নাম্বার বার করে ফোন করলাম। মনে মনে ফন্দী আঁটলাম,—খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে দিতে ভয়টা কী আমার। বার করলাম টম মেসনের বাড়ীর নাম্বার।

চলে এলাম এক সময় থানায়। দেখলাম জনতা যেন থানাটা ঘিরে ধরেছে। তিনজন সাংবাদিক আর চারটে ছবি তুলিয়ে গোঁৎ গোঁৎ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেন সবকটা শকুন। ভাগর খুচ্ছে। জো পিনার মুখে চুরুট গুঁজে তাঁর কালো ক্যাডিলাকটার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর কাছে গেলাম আমি। টম মেসন, ভিড় ঠেলে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালো এক সময়। পিনারের হাত ধরে টেনে গাড়ীর ওপাশে নিয়ে গেলেন তিনি। আমিও তাঁদের সঙ্গে সবে গেলাম। মেসন বল্লেন, "আপনি ফোনটা করে ভালোই করেছেন। আসুন আমরা গাড়ীর ভেতরে কথা বলি। পিনার জানলা গুলি ভালো করে এঁটে শীততাপ যন্ত্রটা চালু করে দিলেন। গাড়ীর জানলায় ঠকঠক শব্দ উঠলো ঠাং। দেখি একটা পুলিশ ইশারা করছে আমায়। জানলাটা নামালাম, "আপনি কী ডেভারি?" জানতে চাইলো সে।

"হ্যা।"

"ওলসন্ সাহেব তলব করেছেন।"

শেরিফের অফিসে ঢুকে ওলসন্ ম্যাক্‌কুইন আর মার্শাল টেবিল ঘিরে বসে রয়েছেন দেখলাম। ওলসন্ বল্লেন, "ফ্রাংক, এই যে ডেভারি এসেছেন।"

"আরে কীথ এসো-এসো। আমাকে কিন্তু বাড়ী পৌঁছে দিতে হবে।"

মানুষের জটলা ঠেলে সাংবাদিকদের এড়িয়ে বেরিয়ে এলাম একসময় মার্শালকে নিয়ে। তারপর সোজা গাড়ীতে উঠে চালিয়ে দিলাম মার্শালের বাড়ীর দিকে।

"কীথ, ঝামেলায় দড়ে গেছি। ওরা আমার গাড়ীর লাইসেন্স কেড়ে নিচ্ছে। এসময় বেথ—মানে আমার বৌয়ের সাহায্যের দরকার। অর্থাৎ ষ্টেশনে পৌছে আর নিয়ে আসা ওকেই করতে হবে। ড্রাইভার তো এখন রাখতে পারবো না। তুমি ওকে গাড়ী-চালানোটা শিখিয়ে দাওনা।"

ব্যাপারটা এতো সোজা হয়ে আসবে ভাবতে পারিনি।

"ওটা আমার পেশা ফ্রাংক। মানুষকে গাড়ী চালানো শেখানো।"

আমার কব্জিটা ওর ঘামে-ভেজা হাতে চেপে ধরলো—"নাও গাড়ী ছাড়ো।"

ধুলোয় ভর্তি রাস্তা পেরিয়ে বাড়ীর বাইরে গাড়ীটা দাঁড় করালাম একসময়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম ফ্রাংক সিঁড়ি দিয়ে টলমল করে উঠে সামনের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেলো। সংগে সংগে দরজাটাও দড়াম করে হলো বন্ধ। ওপরের দিকে তাকালাম। দোতলার একটা জানলায় পর্দা নড়ে উঠলো। বাঃ, বেড়ে মজা তো! মহাশয়া তাহলে ওখানেই ছিলেন। শ্রীমতী মার্শাল!

* * * * *

গাড়ীর ড্যাশবোর্ডে ঠিক এগারোটা বাজলে আমি গাড়ী নিয়ে ফ্রাংকের বাড়ীর সামনে পৌছালাম। সেই নির্জনে বিরাট বাড়ীটা।

ঘণ্টি বাজালাম। শুনতে পেলাম বাড়ীর ভেতরে কোথায় ঘণ্টির শব্দ হচ্ছে। অপেক্ষা করলাম। ঘামে জামা-কাপড় জবজবে। আরেকবার বেলটা বাজাবো কী-না ভাবছি। ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার পাল্লা দুটো খট করে খুলে গেলো!

দরজার সামনে দাঁড়ানো মেয়েটাকে দেখে মাথাটা যেন আমার ঘুরে গেলো। বছর তেত্রিশ বয়স। আমারই মতো লম্বা। রোগাটে। আমার পছন্দে খুবই রোগা। আমার আবার ভরাট মেয়েদের খোঁজখাজগুলি ভালো লাগে। সুন্দর আকৃতি নৈর্ব্যক্তিক কালো বড় চোখ। খুব আস্তে অথচ ভরাট গলায় মেয়েটি বল্লো,—

"আপনি নিশ্চয়ই ডেভারি। আর এসেছেন আমাকে মোটর চালানো শেখাতে?"

নিজের পরিচয়ে সম্মতি জানালাম। তারপর এগোলাম তার সংগে মোটর চালানো শেখাতে। আমি পৌছাবার আগেই সে ড্রাইভারের আসনে বসে গেছে। অগত্যা আমাকে ঘুরে গিয়ে বসতে হলো। গাড়ী-চালাবার যন্ত্রগুলি তর্ভোক্ষণে সে রপ্ত-করার চেষ্টা করছে।

"জ্ঞান দিতে হবে না।" অভদ্রভাবে বলে উঠলো সে…। গাড়ীর চাবি ঘোরালে তারপরই। গাড়ী গতি নেবার পাদানিতে চাপ দিলো। কিছু বলবার

আগেই গাড়ীটাকে রাস্তায় আনলো। যাহোক করে হ্যাণ্ড-ব্রেক মেরে একটা গাছের সংগে সংঘর্ষের কেলেংকারী থেকে গাড়ীটাকে বাঁচালাম।

"ভুলটা হলো উল্টো দিকে গাড়ীটা না চালাতে। যা হোক ফেরফিত্তি আরেকবার চেষ্টা করবো।" কিছু সময় পরে দোহাই দিলো যেন, "প্রায় বছর খানেক গাড়ী চালাইনি। আমার একটা উপকার করুন না। আপনি এখানে তাঁবু গেড়ে বসুন। আর আমার কাজ আমাকে করতে দিন।"

শেষমের মেয়েটি তার গভীর আর যৌনতাভরা গলায় বল্লো—"গাড়ী নিয়ে উইকষ্টীডে যাচ্ছি না—ওই লুচ্চার মানুষগুলির চোখের ক্ষুধা হবার জন্য। আমি যাবো ফ্রিসকো। ফ্রিসকোতে বেশ কয়েক বছর যাওয়া হয়নি আমার।"

ইতিমধ্যে গাড়ী চালিয়ে বাথ ধুলো-ভরা রাস্তায় চলে এসেছে। গাড়ী চলতে বুঝতে পারলাম মেয়েটি ফ্রিসকোর রাস্তা আমার চেয়েও ভালো চেনে। দশ মিনিট হলো আমরা ফ্রিসকোতে ঢুকেছি। হঠাৎ একটা লাগোয়া রেষ্টারেন্ট —হোটেলে ঢুকলো। সুইং-ডোর ঠেলে ঢুকবার সময় বল্লো মেয়েটি, "আমি আগে এখানে কাজ করতাম। একসময় এসে পড়লাম রেষ্টারেন্টের খোলামেলা চত্বরে। দূরে বারে একটা বেঁটে-খাটো লোক কাজ করছিলো। মাথায় বড় রাঁধুনীর লম্বা টুপী। হ্যা, লোকটা স্যাণ্ডউইচ জাতীয় খাবার তৈরী করছিলো। মেয়েটাকে দেখেই মানুষটা কাঠ হয়ে গেলো। ছুরি গেলো খসে। আর চোখ দুটো যেন কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইলো, "আই মোর বাপ! বেথ তুমি!!"

"ঠিকই বলেছো মেরিও। বেশ কিছুদিন পরে।" নিরাসক্ত গলায় জবাবে মেয়েটি বল্লো, "এখান দিয়েই আমরা যাচ্ছিলাম। এই ভদ্রলোক হলেন ডেভারি। উনি আমাকে গাড়ী চালানোয় তালিম দিচ্ছেন।"

মেরিওর দেওয়া খাবার কফি আর মদ খেতে খেতে অনেক কিছু বল্লে বেথ। তার কথা থেকে ধারণা হলো সে বোধহয় আমারই পথের পথিক। বল্লো একসময়, "মেরিওর বৌ আর আমি এককালে বন্ধু ছিলাম। আপনি দাঁড়ান ওর সংগে একটু ব্যক্তিগত কথা সেরে আসি। আপনি নিশ্চয়ই কিছু মনে করবেন না?"

টেবিলে মেরিও গ্লাস সাজাচ্ছিলো—বেথ তার পাশে গিয়ে দাঁড়োলো ঝুঁকে পড়ে। তাকে বোধহয় কিছু বল্লো। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলো সে আমার কাছে। বল্লাম, "শ্রীমতী মার্শাল কী যেন আপনি তখন বলছিলেন·····"

"আমাকে বেথ বলেই ডাকবে।"

"তুমি সত্যি অদ্ভুৎ!"

"মদ আর ব্যবসা ছাড়া স্বামী-দেবতার আর কোনোদিকে নজর নেই। সত্যি বলছি কীথ,—দু-বছরের বেশী আমি তাকে ধরে রাখতে পারিনি।" থামলো সে। আবার সময় নিয়ে বল্লো,—"রাস্তায় খালি কুঠি আছে একটা।" সুন্দর হাসলো সে, চোখে নেমন্তন্ন। মুখে বল্লো—ভাবছিলাম যে তুমি কী……"

(৪)

পরের দিন সকাল ন'টায় শরীরটা খারাপ থাকা সত্বেও মোটর চালানো শেখাবার ইস্কুলে ঠিক হাজির হলাম। বার্টকে বল্লাম আগের দিন প্রায় আর্ধেক সময় শ্রীমতী মার্শাল্লকে শিক্ষা দিতে সময় কেটে গেছে। কথাটা না বললেও চলতো। কারণ উইকস্টীডে মৌমাছির চাকে খবরটা ঠিকই পৌছে গেছে। আশ্চর্য এঁদের সংবাদ গ্রহণ আর পরিবেশন।

দুপুরের খাবার সময় কাছের একটা সাধারণ ফোন করবার জায়গা থেকে মার্শালের বাড়ীতে ফোন করলাম।

"ফ্রাংক আজ রাতে এখানে থাকছে না। ও ফ্রিসকোতে থাকবে।" কিছুক্ষণ চুপচাপ, "আমি শ্রীমতী মার্শাল কথা বলছি।"

"পাঁচটার আগে তোমার সংগে দেখা করতে পাচ্ছি না। ফ্রাংক ফিরছে কখন?"

"রাতে ও ফ্রিসকোতেই থাকবে।" আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তুকি কা রাতটা আমায় কাছেই কাটাবে?"……

পুরোপুরি উলঙ্গ হয়ে বেথ শুয়ে। লম্বা, সুঠাম দেহ। মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। চোখ বোজা। মড়ার মুখোশ পরে। মুখে নেই কোনো অভিব্যক্তি। হঠাৎ-ই বললে সে, "আমাকে বাদ দিয়ে কোনো ধান্দা করতে যেয়োনা।"

শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেলো।

মেয়েটা যখনই অদ্ভুত কিছু বলছে বা করছে, তখনই আমি এটা অনুভব করছি, "ধান্ধা?"

"ভালোই জানো তুমি। তুমি যেমন ওর টাকায় হাত বসাতে চাও আমিও ঠিক তাই" বালিশের ওপর চুলগুলি গুছিয়ে রাখলো, "শোনো কীথ, যা করবো দুজনে একসাথে, একাট্টা হয়ে" ঘড়িতে রাতের গতি ঘণ্টা-ধ্বনিতে প্রকাশ পেলো।

বল্লাম আমি, "কাল সকালে আমরা এ-নিয়ে কথা বলবো।" তাকে ওভাবেই

রেখে সিঁড়ি দিয়ে নাবলাম। তারপর সোজা গাড়ীতে। নোংরা ধূলোয় ভরা রাস্তা দিয়ে গাড়ী চালাতে চালাতে ঐ মেয়েটার কথা ভাবতে বসলাম।

ওর মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে। আর ঐ কিছু একাই আমাকে অস্থির করে তোলে। কী সেইটা? মারাত্মক কিছু?

আমি যে মার্শালের টাকায় হাত বসাতে চাই—বুঝলো কী করে? পঞ্চম ইন্দ্রিয়? 'তুমি ওর টাকায় হাত বসাতে চাও।' তারপরই বলছিলো, 'ফ্রাংককে কমা ভেবো না। কেউ না······আবার বলছি কেউ পাবে না যদি ফ্রাংক মনে করে পুরো টাকাটা সেই খরচ করবে।"

সাবধান করে দেওয়া? তারপরেই বলছিলো বেথ,—'আমাকে ছেড়ে কেনো ধান্দায় যেয়োনা '

শ্রীমতী হ্যানসনের গ্যারেজে গাড়ী ঢুকিয়ে দোতলায় নিজের ঘরে চলে এলাম। হাতে রুমাল চোখ দুটো ক্রমাগত কান্নার ফলে লাল শ্রীমতী হ্যানসেনের।

"ডেভারি, কিছু মনে করে না। আজে রাতের খাবার পেতে তোমার দেরী হবে।" ভদ্রমহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলাম।

"ঠিক আছে। মনে করবার কী আছে? কিন্তু ব্যাপারটা কী?"

"আমার বন্ধু ফ্রেমলিন একঘণ্টাও হয়নি মারা গেছে!" বুকের হৃদস্পন্দন থেমে বন্ধ হয়ে পড়ে খুব জোরে চলতে লাগলো। বহুৎ যেষ্টা করে মনের উপযুক্ত ভাব মুখে ফুটিয়ে বল্লাম.

"আমি, আমি সত্যি দুঃখিত।"

দ্রুত গ্যারেজে ঢুকে গাড়ী বার করতে করতে চিন্তা করলাম। যে জিনিষটা চেয়েছিলাম ঠিক সেটাই হতে চলেছে। পথের ধারে একটা ফোন করবার খুপরী থেকে বেথকে ফোন করলাম, "সে মারা গেছে।" স্পষ্ট শুনলাম মেয়েটার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে।

"কী হয়েছে, আবার বলো!" আবার তাকে বললাম ফ্রেমলিন মারা গেছে। সময় দিলাম না ওকে ওযে লক্ষপতির বৌ হয়েছে সংবাদটা দেওয়ার পর, 'আমি আজই তোমার সংগে কথা বলবো······আমাদের মতলব সম্বন্ধে। আজকেই রাতের বেলা।"

সংগে-সংগেই উত্তর এলো" না, আজ নয় খবরটা শোনবার সংগে-সংগেই বাড়ী চলে আসবে ও। দেখোগে এতোক্ষণ বোধহয় রওনা-ও দিয়েছে. না, তুমি আমার কাছ থেকে দূরে থাকো।"

ছোট ফোন করবার গরম খুপরীতে ঘামতে ঘামতেই মনে এলো বেথকে

গাড়ী চালানো শেখাবার আর কোনো প্রশ্নই আসে না। মার্শাল অবশ্যই একজন শোফার রাখতে পারবে। বেথের সংগে আর রগড়ারগড়িও হবে না। মার্শাল-ও ফ্রিসকোতে ব্যবসা লাটে চড়িয়ে বাড়ীতে মদের কাঁড়া নিয়ে বসবে।

"না, না, বেথ বোঝার চেষ্টা করো, এটা খুবই দরকারি। যেখানেই হোক যে ভাবেই হোক আমাদের দেখা হওয়া দরকার। আমরা..." ঠাণ্ডা মেরে গেলাম যখন বুঝলাম ও পক্ষ থেকে লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে।

* * * * *

দরজায় মৃদু করাঘাত শুনে দরজা খুলে দিলাম। দরজার বাইরে থেকে শ্রীমতী হ্যানসেন বল্লেন, "মার্শাল সাহেব আপনাকে ফোনে ডাকছেন।"

বোকার মতো ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমায় যেন হুকে গেঁথে ফেলা হয়েছে, "মার্শাল সাহেব?" মাথা নাড়লেন তিনি। উত্তেজনায় চোখ-জোড়া তাঁর জ্বল জ্বল করছে। "ধন্যবাদ।" তাঁর পাশে পাশেই সিঁড়ি দিয়ে নামলাম।

"কে কথা বলছো, কীথ?" না মার্শালের গমগমে আওয়াজে ভুল হবার কোনো সম্ভবনাই নেই, "খবরটা শুনেছো?"

"কে শোনেনি বলো? আমার সম্বর্ধনা জেনো অবশ্যই।"

"এটা আমাদের সকলের জীবনের পরিণতি আর সে খুব তাড়াতাড়ি কিছু মারেনি।" হাসলো সে। তার হাসির ববরবানি দেখে বুঝলাম—পুরোমাল টেনে আছে ব্যাটা বুড়ো ভাম। "এখন শোনো কীথ যা বলি। এই মুহূর্তে তুমি আমার কাছে চলে এসো। তোমার সংগে কথা বলা দরকার। যা পাবে হাতের কাছে নিয়ে চলে এসো। সংগে কেবল একটা টুথ ব্রাশ নেবে। আমায় এখানে থাকবার প্রচুর খালি জায়গা আছে।" তারপর ফোন কেটে দিলো মার্শাল।

মার্শালই দরজা খুলে দিলো। মোটা-লাল-চকচকে ঘামে ভেজা মুখ থেকে বেরুচ্ছে আনন্দের হাসি।

"এসো, আমাদের বিরাট আনন্দে অংশগ্রহণ করো।" বলেই আমার হাত হাবড়ে ধরে বসবার ঘরে নিয়ে গেলো।

তার মুখোমুখিই বসলাম আমি, "আমার অভিনন্দন গ্রহণ করো ফ্রাংক।" উত্তরে চোখ মারলো সে আমায়, "বলো তো আমার বৌকে কেমন লাগলো?"

কথাটা অভাবনীয়! বিরাট যেন একটা খাই খেলাম। চুপ মারলাম। "কী হলো?" মুখ বিকৃতি করলো সে। মনোযোগ দিয়ে দেখতে চাইলো।

"খুব ভালো!" গলাটা যেন খসখসে শোনালো, "গাড়ী চালানো-টা রপ্ত করতে খুব একটা দড় নয়।" ঠ্যা ঠ্যা করে হেসে উঠলো সে—তার নিজস্ব ভংগীতে।

"তোমার আর আমার মধ্যে কথা হচ্ছে ইয়ার, তোমাকে ঝোলাচ্ছে সে। তোমার মতোই গাড়ী চালাতে ওস্তাদ ও। কিন্তু আমাকে নিয়ে চালাবে না!"

আমি অবাক হয়ে তার কথা শুনতে লাগলাম। কথায় ফাঁকেই গ্লাশে মদ ভরে এক ফাঁকে সেটে দিলো। "যাক্, যে কথা বলছিলাম। ট্রেণে আসতে আসতেই সব ব্যাপারটা ভেবে দেখেছি। আরেক পাত্তর হোক।"

উঠে গিয়ে সোডার সংগে হুইস্কি মিশিয়ে এমন একটা মাল খাড়া করলাম যেটা খেলে একটা অশ্বেতর পর্যন্ত কুপোকাৎ হতো, "রাইডার তোমাকে কতো টাকা দিচ্ছে?"

"খুব একটা মারাত্মক কিছু না।"

"হ্যা ঠিকই ভেবেছি। আচ্ছা, মনে করো তুমি আমার শোফার হচ্ছো?"

"আমাকে ঠিক কী করতে হবে বলোতো ফ্রাংক?"

"খুব ভালো প্রশ্ন তুলেছো। তোমাকে আমায় ষ্টেশনে দিয়ে আর নিয়ে আসতে হবে। খুচরো দুয়েকটা কাজ হয়তো বাড়ীতে করতে হবে।" রাইডার দিতো দুশো ডলায়—আমি তোমাকে দেবো সাতশো কীথ।" হৃদ স্পন্দন যে খুব বেশী লব্-ডপ্ শব্দ করে চলেছে! প্রস্তাব-টা লুফে নিলে বেথের ঠিক পাশটাতেই চলে আসতে পারবো আমি। এটাই তো আমার কামনা। বল্লাম, "আমি খুবই সৌভাগ্যবান।"

"ব্যস্, ব্যস যথেষ্ট হয়েছে। চলো যে যায় বিছানায় শুয়ে পড়ি।" টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো সে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে। দাঁড়িয়ে রইলাম বারান্দায় দরজার হাতলে হাত রেখে। ভাবছিলাম বেথ ঠিক এসময় কোথায় থাকতে পারে। তাকে নিবিড় করে পাবার ইচ্ছায় আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম। ঘরে ঢুকে আলোর সুইচ্ টিপলাম এক সময়। বিছানায় শুয়ে বেথ। হাত-দুটো বালিশের মতো করে। পরণে রাত্রি বাস। কিন্তু এতো স্বচ্ছ যে দেহের গোপনতা একটুও আড়াল করেনি।

(৫)

একদিন দুপুর সাড়ে-বারোটার কাছাকাছি ষ্টেশনের গাড়ী-রাখবার জায়গায় মার্শালের প্লাউমাউথটা রাখলাম। দুর্ঘটনার পর গাড়ীটার কাগজপত্র ঠিক

করার ব্যাপারটা সে প্রয়োজন মনে করেনি। একটা মডগার্ড তুমড়ানো। হেডলাইটও ভেংগেছে এ টা। তবুও গাড়ীটা ভালোই চলে।

গাড়ী থেকে বেরোতে না বেরোতে সহকারি সেরিফ রস্ হঠাৎ উদয় হলো, "গাড়ীটা এখনো রাস্তায় নাবাবার উপযুক্ত নয়," তুমড়ানো মডগার্ডটায় আংগুল দিয়ে দেখিয়ে মন্তব্য করলো সে।

"আপনি বরংচ এই শহরের একমাত্র লাখপতি মার্শাল সাহেবের সংগে কথা বলুন" বললাম আমি, "বেশী বাড়াবাড়ী করলে আপনাদের অফিসে শেরিফ ম্যাককুইনের সংগে কথা বলতে বাধ্য হবো আমি।"

"ঠিক আছে এই গাড়ীটার কথা আমিও জানাচ্ছি," বন্দুকে আংগুল রেখে চলে গেলো সে।

প্ল্যাটফরমে ঢুকতে না ঢুকতে ফ্রিসকো এক্সপ্রেস্ থামলো। প্রথমে বেরিয়ে আসা মানুষগুলির মধ্যে মার্শাল একজন।

"এই যে কীথ্।" কাঁধে হাত রাখলো সে, "কী নিশ্চয়ই খুব খাটাখাটনি গেছে? ঠিক আছো তো তুমি?"

"খুব ভালো," আমার মন বেথের চিন্তায় ঘুরে গেলো, "হ্যাঁ, কাজ অনেক করেছি।"

গাড়ী চলতে আরম্ভ করলে একসময় বললে সে,

"এ-গাড়ীটা ছাড়ো মাইরি। সবচেয়ে ভালো গাড়ী দেখো কীথ্। তোমাকে ভার দিলাম। ধারে টাকার অভাব হবে না"

সংগে-সংগেই গাড়ীর দোকানে গিয়ে বললাম মার্শালের জন্য গাড়ী কিনতে এসেছি—দোকান-কর্মচারিগুলি যেন নতজানু হয়ে সেলাম করলে। বললে তারা, "খুব ভালো একটা গাড়ী আছে। প্রায় হাতেই তৈরী বললে হয়। এ-ধরনের গাড়ী এই প্রথম বাজারে ছাড়া হয়েছে। মাখন আর নীল এই দুটো রংয়ে মেশানো গাড়ীটায়। গাড়ীর নির্মাতাদের কল্পনায় যতোরকম ব্যবস্থা থাকতে পারে।—সবরকম ভোগোপকরণের ব্যবস্থা রয়েছে গাড়ীটায়।"

দোকান থেকে নতুন গাড়ীটা যখন রাস্তায় বার করলাম দেখবার মতো ব্যাপার হলো একটা। গাড়ী ওসলনের অফিসের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলাম। ছেড়ে দিলাম ষ্টেরিও রেডিওটা। বেরিয়ে এলো একসময় মার্শাল ওসলনের অফিস থেকে। হর্ণ বাজালাম। হর্ণটা যেন গান গেয়ে উঠলো। হাত দিয়ে ইশারা করলাম এবার! দেখতো পোলা এবার মার্শাল। ভিড়মি খাওয়া মানুষের দৃষ্টির

মাঝ দিয়ে ডাঁটের মাথায় গাড়ীটার কাছে এলো। বসবার আসনের দরজা খুলে ধরলাম আমি। মার্শাল গাড়ীর চা পাশ ঘুরে-ঘুরে দেখলো।

"কী ব্যাপার কীথ্, এ-রত্ন জোটালে কোত্থেকে? ওরে বাপরে, গাড়ীর মতো গাড়ী একটা। দাম পড়লো কতো?"

"পনচাশ হাজার ডলার।"

"ও: কিছুই না। এরকম দশটা গাড়ী আমি কিনতে পারি! হ্যাঁ, এখন একটু মদ খেলে হয়।"

গাড়ীর টুকিটাকি রাখবার জায়গা থেকে আগের কেনা আর অর্ধেক খুশ, খাওয়া স্কচ্ বার করে দিলাম। বাচ্চারা যেমন দুধের বোতল চাটে—ঠিক সেইভাবে সারা রাস্তা মদের বোতলটা চুক্-চুক্ করে টানতে টানতে চললো সে। ওর বাড়ী পৌঁছাবার আগেই বোতল শেষ।

গাড়ীটা গ্যারেজে ঢুকিয়ে আগের প্লাইমাউথটা যেভাবে রাখতাম—ঠিক সেইভাবে রেখে দরজা বন্ধ করতে গেলাম, দরজা বন্ধ হলো না। গাড়ীটা বড়। সুতরাং আবার গাড়ী চালু করে একেবারে সামনের দেওয়ালে গাড়ীর বাম্পার ঠেকিয়ে দিলাম। গাড়ীর ইঞ্জিন চালু রেখে বাইরে বেরিয়ে দেখলাম—দরজা বন্ধ হবে কী-না। হ্যা। এবার কোনক্রমে দরজা বন্ধ করলাম।

আবার ঢুকলাম গ্যারেজে লাইট-টা নেভাবার জন্য। ফিরে আসবার সময় পেট্রোলের গন্ধ পেলাম। গন্ধটা আসছে একহস্ট পাইপ থেকে। আবার সবকিছু ঠিকঠাক করে ফেরবার সময় অনুভব করলাম—প্রচুর গ্যাস জমেছে! আশ্চর্য! মোটরের ইঞ্জিন এবার বন্ধ করলাম। তারপর রান্নাঘরের দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

একদিন সকালে বসবার ঘরে কাগজপত্র ছড়িয়ে মার্শাল ডিম্বাকৃতি টেবিলে বসে আছে। বিরাট এক গ্লাশে স্কচ্ ঢেলে বললে, "বসো কীথ্"। পাশের চেয়ারে বসতে বললো, "দশলক্ষ ডলার শুনতে ভালোই লাগে। কিন্তু ট্যাক্স-ফ্যাক্স দিয়ে দেখবে টাকাটা অনেক কমে গেছে।"

"কথাটা ঠিক," বসতে বসতে বললাম, "তবুও ফ্রাংক, যাই থাক টাকা তো বটে। দিয়ে থুয়েও তো তোমার দু'লক্ষ টাকা থেকে যাচ্ছে। আবার বলি তুমি ঐ টাকাটা ব্যবসাতে খাটাও—লগ্নী-তো ফেরৎ পাবেই পরন্তু লাভও কিছু ঘরে ঢুকবে।"

"হয়েছে, আমাকে আর জ্ঞান দিতে হবে না," স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে তাকাল সে, "চেরিংটন্ ইস্পাত কারবারে ভালো একটা দাঁও পেয়েছি। ইক এখন

পনেরো ডলার' মজা হচ্ছে পিটাস্‌বার্গ আর চেরিংটন কোম্পানী এক হয়ে যাচ্ছে।"

মনে পড়লো,—এই চেরিংটন কোম্পানীর জন্য আমাকে জেলে যেতে হয়েছিলো। "একটা কথা ফ্রাংক, এই চেরিংটন কোম্পানীর হাড়-হদ্দ জানি আমি। যেখানে যা খুশী টাকা তুমি লগ্নী করো কিন্তু এখানে নৈব নৈব-চ। ওটা গোলমেলে কারখানা। আর ঐ দুটো কোম্পানী পিটাস্‌বার্গ আর চেরিংটন কখনোই এক হচ্ছে না। দু-বছর আগে ওরা এক হবার চেষ্টা করেছিলো। হাজার হাজার লোকের সর্বনাশ হয়েছিলো। তাদের মধ্যে আমিও একজন। যে কেউ ওপর-চালাক হয়ে ওখানে লগ্নী করবে, ঠকবে সে। এতে কোনো ভুল নেই ফ্রাংক।

"তাই নাকী? ভালো, ভালো। কিন্তু আমি আবার তোমার চেয়ে বেশী জানি।" ইতিমধ্যে গ্লাশের মাল সে শেষ করেছে, "যে-সব ওপর-চালাক হেরে গিয়েছিলো তাদের জানি আমি। কিন্তু এবার আমি ঠকছি না। আমি পাঁচ লক্ষ ডলারের ষ্টক কিনছি। হ্যাঁ, প্রবেটটা পেলেই আমি কিনে ফেলবো।"

গলায় যথেষ্ট জোর দিয়ে বললাম এবার, "আমি কিন্তু পুরোপুরী দায়িত্ব নিয়ে আমার বক্তব্য রেখেছি।"

"যাও, ভাগো। বেথকে বাগানের কাজে সাহায্য করোগে", চোখে হীনভাব ফুটিয়ে খেঁকিয়ে উঠলো মার্শাল, "কাজ আছে আমার এখানে ঘুর-ঘুর করতে হবে না।"

তার মানে দাঁড়ালো আমি ভাড়া-করা লোক। তাকে উপদেশ দেবার মতো মানুষ আমি নই।

"তুমি যাই বলো ফ্রাংক," আমি উঠে পড়লাম। সেও মদ ঢাললো গ্লাসে, "টাকাটা তোমার কিন্তু ভেগে যাবে।"

"হ্যাঁ, এটা অবশ্য তোমার বক্তব্য।" আমার দিকে আংগুল উঁচিয়ে বললে সে, "শোনো গোপাল, টাকার ব্যাপারে এখন পর্যন্ত আমার যা ধারণা সারা জীবনেও তোমার সেটা হবে না। যখন জ্ঞান মানে তোমার উপদেশ দরকার হবে চিৎকার করে তোমাকে জানানো আমি।"

'কিন্তু ফ্রাংক আমি ....."

"যাও গোপাল, কাটো। ব্যস্ত আছি আমি।" একটা দলিল তুলে নিলো সে। দরজায় পৌছাতে পৌছাতে শুনতে পেলাম। "তুমি তোমার কাজে

ওস্তাদ। গাড়ীটা সত্যি ভালো! গাড়ীর কাজ করে বাড়তি সময়টা—এই বাড়ীর কাজে লেগে যাও। আর টাকার ঝামেলা আমার ওপর ছেড়ে দাও।"

"ঠিক আছে ফ্রাংক, তোমার যা ইচ্ছা।"

একটা দলিলে ঝুঁকে পড়লো সে। মুখটা রাগে লাল। চোখে হীন দৃষ্টি তখনো, "মনে করো আমরা ঐ নামধরে ডাকা, 'তুই-তুমি করে বলা ভুলে যাই?" গলায় মদ চড়িয়ে নিলে,—"মনে করো। তুমি আবার আমায় মার্শাল সাহেব বলে ডাকছো, কীহে বলো? নিশ্চয়ই আমারা বন্ধু থাকবো। কিন্তু তোমার আমার যে পার্থক্য সেটা ভুলছো কী করে, কী বলো গোপাল?"

"আপনি ঠিকই বলছেন মার্শাল সাহেব।"

"ঠিক আছে গোপাল, তুমি আমার সংগেই থাকো। কিন্তু ভুলোনা চাঁদ আমি লাখপতি।"

"সে কথায় কী ভুল আছে মার্শাল সাহেব।"

বাগানে চলে এলাম আমি। বেথকে দেখলাম সাদা-গামলায় গোলাপজাম জমা করছে। লোকটা আমায় বললে "বাগানে বেথকে সাহায্য করোগে।" তার গায়ের কাছেই প্রায় থামলাম আমি। তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাকালে সে আমার দিকে, "ঠিক এই কথাই কী বলেছে?"

"ঠিক তাই। আর তাকে মার্শাল সাহেব বলে ডাকতে হবে। কারণ আজ তিনি লাখপতি। আমি তার চাকর। সামাজিক মর্যাদা দুজনের সমান নয়। অবশ্য তার কথায়।"

"আমি তোমাকে অনেকবার বলেছি—মাতাল হলেও মানুষটা খুব চালাক।"

"হতে পারে। কিন্তু ইস্পাতের শেয়ারের ব্যাপারে সে এখন বিকোতে বসেছে। তার ধ্বংস অনিবার্য। সামনের সপ্তাহের শেষের দিকেই টাকা ধার নিয়ে শেয়ার কিনছে।"

"আবার বলছি,—সে খুব সেয়ানা।"

"কিন্তু আমি নিশ্চিত এই শেয়ারের ব্যাপারে সর্বস্ব খোয়াবে সে। ঐ একই জালে একবার আমি জড়িয়ে ছিলাম। আপাত-মধুর হলেও শেষকালে ঠকঠক্ লবডংকা! যে টাকা সে পেতে চলেছে সবটাই সে খুঁইয়ে দেবে।"

কিছুটা সময় দিলাম। বললাম তারপর, "তুমি কী ব্যাপারটা খতিয়ে দেখেছো বেথ?"

"হ্যাঁ। তুমি কী স্থির নিশ্চয় যে টাকাটা খাটালে ভরাডুবি হবেই?"

"দ্বিমত নেই আমার।"

"তুমি ওকে রুখতেও পারবে না বলছো?"

"সম্ভবনা নেই। কিন্তু তুমি কী ভাবছো বেথ?"

"ভাবছি আমি, লোকটা এখনো মরেনি কেন?"

"ঠিক। আর লোকটা না মরলে আমরা কিছু টাকাও পাচ্ছি না।"

মাথা নাড়লো বেথ। ফিরে এসাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ঠিক করলাম—পনেরো দিনের মধ্যেই তুমি মরছো বুড়ো।

(৬)

একটার পর একটা সিগারেট ধ্বংস করতে করতে ভাবলাম—সত্যিকারের টাকায় হাত ঠেকাবার এই আমার দ্বিতীয় সুযোগ। প্রথম পরিকল্পনা ব্যর্থ আর আমি গেলাম জেলে। কিন্তু এখন আর দনো-মনো নয়। সামান্য জচ্চোরি এ নয়। একজন মানুষকে খুন করা। মোটা মাতাল হামবড়াই মানুষটাকে যে না কী ঠিক এই মুহূর্তে নিচে ফোন করছে, মারতে একটুও দ্বিধান্বিত নই। কিন্তু কী ভাবে খতম করা যায়—নানা পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই মাথায় পাক খাচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটা এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে মনে হয় স্বাভাবিক দুর্ঘটনা। আর তার পর? টাকা আর বেথ দুজনকেই পাবো আমি।

নীচে বোধহয় পেঁয়াজ ভাজা হচ্ছে। চলে গেলাম নীচে সোজা রান্না ঘরে। ফ্যালা ফ্যালা মাংস পেঁয়াজ সস্‌পেনে ভাজছে বেথ" গন্ধটা খুব দিল খারাবি। "দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে বল্লাম আমি, "বুড়ো কোথায়?"

"তার নিজের জগতে। মদে চুর!"

ধাক্কা দিলাম মার্শালকে। কোনো সাড়া নেই। "ডাকতার ডাকা উচিৎ" বেথের সঙ্গে খেতে খেতে বল্লাম আমি।

"আর আধঘন্টা দেখবো। এতেও জ্ঞান না ফিরলে ডাঃ সণ্ডার্সকে ডাকবো।"

খাওয়া-দাওয়ার পর আবার ডাকলাম মার্শালকে। ধাক্কালাম, পড়ে যাচ্ছিলো—ঠিক সময় মতো না ধরলে মেঝেয় পড়ে যেতো।

"হাতুড়ে ডাকতারকে এবার ডাকো।" বল্লাম আমি, তারপর নিজেই মার্শালের মাতাল দেহটা দোতলায় নিয়ে গেলাম। শুনতে পেলাম বেথ ডাক্তারকে ফোন করছে। তারপর বল্লে বেথ একসময়,—"মাতালরা চট করে

মরে না।" ঝাঁ করে তাকালাম ওর মুখের দিকে। না, সেই আগের মতো শূণ্য-প্যানের মতো কোনো ভাবান্তর নেই।

ডাক্তার আসতেই আমি কেটে উঠলাম। স্পষ্ট শুনলাম এক সময় মার্শালকে দেখে ডাক্তারের গাড়ীটার চলে যাওয়া। বেথ বল্লো, "ডাক্তার বলেছে ভালো একটা ঘুম দিলেই মার্শাল ভালো হয়ে যাবে।" বল্লাম, "মনে করো তোমার স্বামী-দেবতার ভালোমন্দ কিছু হয়ে গেলো, তখন তুমি কী আমাকে বিয়ে করবে ?"

"কী যা-তা বকছো ? মাতালরা চট্ করে মরে না। ভালো কথা, টাকা পেলে কী করবে ?"

"ঐ টাকা তিনগুণ করে ফেলবো এক বছরে। বিরাট বাড়ী লোকজন, বড় মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব। দেখবে তোমার জীবনধারাই পাল্টে গেছে। তুমি নিশ্চয়ই আমার পাশে থাকছো ?"

"হ্যা নিশ্চয়ই। এই নির্জন পচা জায়গা আর ভালো লাগে না," "আগামী দু-সপ্তাহের মধ্যে মার্শাল তার সব টাকা ইস্পাতের শেয়ারে লগ্নী করবে। আর সব টাকাটাই যাবে অগাধ জলে।

"তুমি তো বলেছিলে লোকটা মরছে না কেন ? বলেছিলে না ?"

মাথা নাড়লো বেথ। বল্লাম, "তুমি কী এখনও ঐ একই কথা বলবে ?"

"হ্যা।"

"তাহলে ও মরবে !"

"কিন্তু কী ভাবে ?"

"কথাটার মানে বুঝতে পারছো ?"

বেথ কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে শুলো সোজা চাঁদের দিকে তাকিয়ে, "কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করছি কাজটা কীভাবে করবে কীথ্ ?"

"আমরা মার্শালকে খুন করতে যাচ্ছি। ভালো কথা, ওর উইলটা কোথায় জানো ?"

"জানি উইলটা কোথায় আছে।"

"টাকাটা পাবো শুধু তুমি আর আমি। নিশ্চয়ই এতে দ্বিমত নেই ?"

"না।"

"আর আমাকেও বিয়ে করছো ?"

মাথা নাড়লো বেথ।

পরের দিন বেশ সকালেই জল খাবার না খেয়েই মার্শাল হুকুমজারি করলো, "শীঘ্রি গাড়ী বার করো।"

বিরাট একটা স্যুটকেশ গাড়ীতে ঢুকিয়ে বসবার জায়গায় ঝপ্ করে বসে পড়লো সে, "যে কোনো মাগীর চেয়ে এই গাড়ীটা অনেক ভালো। ওঃ, কবে যে গাড়ীটা চালাবো।"

"না, মার্শাল সাহেব আপনাকে আর খুব বেশী দিন অপেক্ষা করতে হবে না।"

"ঐ সব সাহেব-টাহেব ছাড়ো, গতকাল তোমার সঙ্গে খুব হীন ব্যবহার করেছি। তুমি-বাবা ফ্রাংক বলেই ডেকো।"

"হ্যা, তাই হবে ফ্রাংক" জোরে বল্লাম ওকে কথাটা আর মনে মনে বল্লাম, "শোনো কুত্তার বাচ্চা তুমি শীঘ্রিই মরছো!"

মার্শালকে ষ্টেশনে পৌছে বাড়ীর কাজে লেগে গেলাম। বিকেল চারটে পর্যন্ত বাড়ীর সামনের মাঠটায় ঘাস কাটলাম। তারপর চলে গেলাম নিজের ঘরে। স্নান শেষে পরিষ্কার একটা শার্ট গায় চড়িয়ে নিলাম। গোলাপ জামের জেলীর গন্ধে সমস্ত বাড়ীটা ভরে গেছে। গেলাম বেথের কাছে। দেখলাম অত্যন্ত অন্যমনস্ক। আমাকে যেন চেনেই না, "কী হয়েছে বেথ?" জেলীর সস্‌প্যা টার তলাটা ক্রমেই সে ঘষতে লাগলো. "কী ব্যাপার কী? আমি কী মহাভারত অশুদ্ধ করেছি না কী?" গলায় জোর দিয়ে কথাটা বললাম এবার।

এবার উত্তর দিলো বেথ, "এ বাড়ী ছাড়ার পর আমাকে তুমি অন্য মানুষ দেখবে।"

তার কাছে এগিয়ে গিয়ে ঘাড়ের পেছন দিকটায় চুমু বসিয়ে দিলাম একটু। কেঁপে উঠলে. বেথ আর সরেও গেলো।

ষ্টেশনে চলে এলাম এর পরেই। মার্শাল সকালের স্যুটকেশটা নিয়ে নীচে নাবছে। আমার দিকেই আসছে সে। গাড়ীটা তার কাছে নিয়ে গেলাম।

গাড়ী রাখবার জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে এসে প্রথমেই প্রশ্ন রাখলাম, "কাজ কারবার ভালোই হয়েছে তো ফ্রাংক?"

"ওসলনের অফিসে গাড়ী রাখবে। কথা আছে ওর সঙ্গে।" তাই করলাম।

মার্শাল অফিসের ভেতর গেলে সিগারেট ধরালাম একটা। প্রায় আধঘণ্টা কাটিয়ে মার্শাল ফিরে এলো। বসবার সিটে স্যুটকেশটা ছুঁড়ে দিয়ে হ্যা-হ্যা করে হেসে উঠলো। বুঝেছো এখন থেকে ফ্রিদকোর উকিলই আমার বিষয়-সম্পত্তির

দেখা-শোনা করবে। কাজের লোক বটে সে। ওসলোন কাজ কাকে বলে কিছুই জানে না।"

সতর্কভাবে বললাম, "হ্যা ঘোড়ার উকিলই বটে!"

"একেবারে হক্ কথাটা বলেছো। সত্যি, উকিল হিসেবে হ্যারি বার্নষ্টেইনের জবার নেই। আচ্ছা রাতে কিছু মজা লুটলে হয় না। বার্নষ্টেইন উকিলের নামটা মনে গেঁথে নিলাম। টুকি-টাকি জিনিষ রাখবার খুপরী থেকে একটা স্কচের বোতল বার করলাম। সেই যে বোতলটা নিয়ে সে চুষতে আরম্ভ করলো—বাড়ী গিয়ে তবে সেটা শেষ হলো। হঠাৎ বললে পথে, "কালকে তুমি আমাকে মোটরে ফ্রিসকোতে নিয়ে যাচ্ছো। অনেক কিছু কাজ আছে সেখানে। দু-তিন দিন থাকতে হতে পারে। তুমিই আমাকে চারদিক ঘোরাবে। গাড়ী থেকে নাববার আগে শূণ্য বোতলটা ফেরৎ দিতে দিতে বললে সে, "তুমি তো বুঝতেই পাচ্ছো আমি শ্যালা মদটা একটু বেশী খাই।"

মনে মনে ভাবলাম—আমিও সেটা চাই। তুমি শ্যালা মদ খেতে খেতেই যেন টেঁসে যাও।

পরদিন মার্শালকে নিয়ে ফ্রিসকোর পথে বেরিয়ে পড়লাম। ও এবার বসলো গাড়ীর পেছনের সিটে। ফ্রিসকো শহরে ঢুকেই আমাকে র‍্যাভেন হোটেলে যেতে বললো। হোটেলে পৌঁছে দুটো ঘরের ব্যবস্থা করেই টেলিফোন করতে হবে বলে কেটে পড়লো। আমিও বসে বসে টি. ভি দেখতে লাগলাম।

দুপুরের দিকে ফিরে এলো মার্শাল পুরো টং হয়ে মদে। একটা চেয়ারে গা এলিয়ে বললো, "বলছিলে না একদিন যে তুমি বার্টন সেরমনে কাজ করতে?"

মদ খাওয়া বন্ধ হয়ে গেলো আমার। বার্টন সেরমনে যে কোন মানুষকে জিজ্ঞাসা করলে বলে দেবে যে আমি পাঁচ বছর শ্রীঘরে ছিলাম। আর কুষ্ঠ রোগীর মতো পরিত্যাজ্য আমি বারটনদের কাছে।

"সত্যি কথা বলতে ফ্রাংক ছ'বছর আগে আমি ওদের সঙ্গে ছিলাম। আর আমাকে যদি বলো তবে নিশ্চয়ই আমি মেরিল লিঞ্চকে বার্টনদের থেকে বেশী পছন্দ করবো।

"পছন্দ করবে তুমি?" এক টানে মাল শেষ করলো "গ্লাস দিলো আমার মদে ভর্তি করতে। পায়রার মতো দুটো গাল ফোলালো," আমি ধার চাই। মদ্দা কথা হলো এটাই। তাই ভাবলাম, কীথ্ তো ওখানে এককালে কাজ করতো—তা যদি আমার হয়ে কিছু করতে পারে।"

"ধারটা কীসের জন্য চাইছো?"

"ঐ যে চেরিংটন্ ইস্পাতের ব্যাপারটা। এখনই আমি ওটা কিনে ফেলতে চাই। আচ্ছা, তুমি কী মনে করো মেরিল লিঞ্চ আমাদের ধার দেবে ?"

"আমি ঠিক বলতে পারবো না ফ্রাংক। তবে একটা কথা নিশ্চয় করে বলতে পারি বারর্টনরা ধার দেবে না। তাহলে তুমি এই ইস্পাতের ব্যাপারে টাকা লাগাবেই ?"

"বাদ দাও। নাও চলো উঠে পড়ি। কাজের জন্য সারাটা দিন পড়ে রয়েছে।"

"ফ্রাংক বলছিলাম কী—এই চেরিংটন ইস্পাতের ব্যাপারটা" ···কোনো কথায় জবাব না দিয়ে নুতুন কেনা ক্যাডিলাক গাড়ীটায় উঠে পড়লো সে। বাইরে রোদের কী তেজ। ঠিক আছে শ্যালা শূওরের বাচ্চা মাতাল। তুমি মামলা এগিয়ে নেবার আগেই তোমায় ঠাণ্ডা মেরে দিচ্ছি ড্রাইভারের আসনে বসতে বসতে কঠিন শপথ নিলাম আমি। গিরালডেলে দুপুরের খাবার খেতে থামলাম। বেয়ারা দেখলাম মার্শালকে বিশেষ আপ্যায়িত করে কোণের একটা টেবিলে নিয়ে গেলো। "হ্যারি বার্নষ্টেইনের সঙ্গে আমার এখনই কথা বলার দরকার।" মুখে মধ্যে গুচ্ছের খাবার ঢুকিয়ে বললো মার্শাল, "কাছাকাছিই থেকো। অনেক কাজ আমার। আগের ব্যবসাটা ছেড়েই দিচ্ছি।" কফির পর—পরই উঠে গেলাম আমরা। ভাবলাম মেরিল লিঞ্চদের ভজাতে পারলেই ও টাকা পাবে। আর সে টাকা ঢালবে চেরিংটন ইস্পাতে। যতো আগে মরে ব্যাট ততো ভাল আমার ও বেথের।

কিন্তু সময় বয়ে যাচ্ছে। সে যদি সত্যি শেয়ার কেনে । হঠাৎ-ই চোখে পড়লো দুই মক্কেলকে। মার্শাল আয় সংগের মোটা-বেঁটে, মাথায় চওড়া কানা টুপী, ফুল ফুল ছাপা টাই। গাড়ীর দরজা খুলে দিলে পরিচয় করিয়ে দিলো,—"হ্যারি, এই হচ্ছে কীথ, ডেভারি। কীথ, এই ভদ্রলোক হচ্ছেন হ্যারি বার্নস্টেইন।" একটা শুকনো অথচ ঠাণ্ডা হাত আমরাটা জাবড়ে ধরলো। পরস্পর পরস্পরকে দেখলাম, "আপনার কথা শুনেছি ডেভারি। গলাটা ঠাণ্ডা আর খসখসে। মার্শাল বল্লো এবার, "চলো" ওরা ব্যাংকে ঢুকলে গাড়ীতে বসে রইলাম। প্রায় ঘণ্টাখনেক পরে ফিরে এলো-দুজন। মার্শাল বল্লো, "আমাকে হোটেলে পৌছে দিয়ে হ্যারিকে ওর অফিসে পৌছে দাও।"

মার্শালকে হোটেলে ফিরিয়ে হ্যারিকে অফিসে পৌছে দেবার পথে হঠাৎ হ্যারিই বল্লে, "ফ্রাংক বলছিলো তুমি না-কী বারর্টন সারমন-দের ওখানে ছিলে।"

"হ্যা। পাঁচ বছর আগে।" অফিসে পৌছে গাড়ী থেকে নাববার তাঁর কোনো তাড়া দেখলাম না। "আমাকে একটা উপকার করো না।" অবাক হলাম। "কীসের উপকার?"

"তোমাকে ও বিশ্বাস করে। বৌ-য়ের ব্যাপারে ও সুখী নয়। ব্যাপারটা বুঝতেই পাচ্ছো। সুতরাং স্বামীর হাত থেকে রেহাই পেলেই ভদ্রমহিলা সুখী হবে।—হয়তো আমার ভুল হতে পারে। তবু-ও মানুষটাকে খেয়াল রেখো তুমি। ঝামেলা কিছু আরম্ভ হলেই খবর দেবে আমাকে। ঠিক?…"

শির দাঁড়া বেয়ে কী যেন একটা শির শির করে চলে গেলো "ঝামেলা? আপনি ঠিক কী ইংগিত করতে চাইছেন?" চিন্তান্বিতভাবে আমার দিকে তাকালো এবার, "যদি ঠিক মতো চলে দশ লক্ষকে ত্রিশ লক্ষ করতে পারে ফ্রাংক। কিংবা তার-ও বেশী। লোকটার সম্ভাবনা আছে। আচ্ছা, তুমি কী পারো না ওর মদ খাওয়া বন্ধ করতে? পারো না কী তুমি বৌ-টাকে ওর সংগে সংঘাতে না লিপ্ত হতে দিতে? ও বলছিলো তুমি-ও নাকী ওর সংগে বড় হতে চাও। আর বড় হতে চাইলে ওর দিকে তোমার নজর রাখতেই হবে।"

হ্যারিকে অফিসে নাবিয়ে দিয়ে আর প্রচুর অস্বস্তির সংগে ফিরে এলাম হোটেলে এক সময়।

ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই জিজ্ঞেস করলো মার্শাল, "হ্যারি-কে কী রকম বুঝলে?" টেবিলে কাগজ-পত্র ছড়িয়ে আর অবশ্যই কাছে মদের বোতল রেখে কাজ করছিলো মার্শাল। "খুব চালাক।" দরজা থেকেই উত্তর দিলাম আমি। "ঠিক বলেছ। খুবই চালাক। মেরিল লিঞ্চ-দের ওখান থেকে ধারের ব্যাপারটা—ওই ভার নিয়েছে।" দাঁত বার করলো হেসে, "কালকেই শেয়ার কিনতে আরম্ভ করছি।"

"এই যে চেরিংটনের ব্যাপারটা,—এটার সম্বন্ধে বার্নষ্টেইন সাহেবের মনোভাব-টা কী?"

"এ—সব ব্যাপারে তোমার যা-জ্ঞান-গম্যি ওর-ও ঠিক তাই। ওর জ্ঞানের আমার দরকার নেই।"

"ভালো। টাকাটা তোমার। টাকা নিয়ে তুমি যা-ইচ্ছে করতে পারো। পরে কিন্তু আমাকে দুষোনা।"

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে বসলাম—ঠিক এখুনি এই মুহূর্তে ভোদাই-টাকে মারবো না কী! যাতে সে শেয়ার কিনতে না পারে। কিন্তু ও-কে মারবার

নিরাপদ কোনো উপায় বার করতে হবে। শেষমেষ বিকেল ছটার সময় ঠিক করলাম· আমি অসুস্থ, কাল কাজে বেরোতে পারবো না। না, তার আর দরকার হলো না। দেখলাম মদের বোতল পাশে রেখে বাহ্য জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে লম্বা হয়ে আছে মানুষটা। সংগে সংগে ডাকতার কে ডাকলাম। ভালো করে দেখলো ডাক্তার ভদ্রলোক। বল্লে, "আমার কিছুই করার নেই। বিশ্রামের দরকার ওর।" কয়েকটা পিল-ও দিলেন ওকে খেতে। যাবার আগে বলে গেলেন—এভাবে মদ গিল্লে বেশী দিন টিকবে না ও। ডাকতার চলে গেলে ভাবলাম হ্যারিকে ডাকলে আমার কাজ অনেক এগিয়ে থাকবে। ফোনে ডেকে বল্লাম সব হ্যারিকে।

ঘণ্টা তিনেক বোধহয় ঘুমিয়ে ছিলাম। কোনো একটা শব্দে ঘুমটা ভেংগে গেলো। দেখলাম মার্শাল ঘরে দাঁড়িয়ে। চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে, মুখটা ফোলা, উস্কোখুস্কো চুল।

"তোমাকে শুয়ে শুয়ে নাক ডাকতে হবে না। এক পাত্তর মালের ব্যবস্থা করো।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। দাঁড়াও, গাড়ীতে একটা বোতল আছে। আমি এক্ষুণি নিয়ে আসছি।"

পরের দিন সকাল সাতটায় ওর ঘরে সাড়া দিয়ে ঢুকলাম। সন্দেহ ছিলো ও কী মাথা খাড়া রাখতে পারবে? দেখলাম সাংঘাতিক অবস্থা। রাতের বোতল-টা অর্ধেক খালি। 'কীরকম আছো ফ্রাংক?" দরজা থেকেই জিজ্ঞেস করলাম। "বিশ্রী অবস্থা। শীঘ্রি যে কোনো ডাকতার পাও, ধরে নিয়ে এসো।"

হ্যারি বার্নস্টেইনকে ফোন করলাম। সব বললাম। শুধু চেপে গেলাম যে রাতে মদ ওকে আমিই দিয়েছি। গালাগালি দিয়ে উঠলো হ্যারি। আমাকেই ডাক্তার ডাকতে বললে। শেষমেষ ও নিজেই আসছে—সেটাও জানিয়ে দিলো।

ডাক্তার ও বার্নস্টেইন প্রায় একই সঙ্গে এলো ডাক্তার যথা কর্তব্য করে চলে গেলে হ্যারি বললো, "ফ্রাংক বাড়ী যেতে চায়। ডাক্তারও বলছে সেটাই সবচেয়ে ভালো। এখন কথাটা হলো—বাড়ীতে যদি কোথাও মদ-টদ থাকে হাটাও সব। ভবিষ্যতে মদ খেয়ে যদি এ অবস্থায় আসে বাঁচানো মুস্কিল হবে। বুঝতে পারলে সব?"

"কিন্তু উনি কী গাড়ীর ধকল সহ্য করতে পারবেন?" জিজ্ঞেস করলাম আমি। "চেরিংটনের ব্যাপারে একটা দিন যাওয়া মানে একটা দিন ক্ষয় করা।"

"ডাক্তার ও-কে কিছু বড়ি-টড়ি দিয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি গাড়ী চালাতে যেওনা। ঘাবড়াবার কিছু নেই।"

জিনিষপত্র গোছানো হয়ে গেলে মার্শাল বললো, "বাড়ী গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"ঠিক বলেছো ফ্রাংক চলো যাওয়া যাক।" বিছানার তলা থেকে সে আধ খাওয়া বোতল বার করলো। "এটা গাড়ীতে রেখে দাও কীথ।"

মার্শালের বাড়ী পৌছে দেখলাম সহকারি শেরিফ রস হলঘরে আর বেথ ওপরে উঠবার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে। রসের দিকে দৃষ্টি রাখলাম। ও নুতন কেনা ক্যাডিলাক গাড়ীটার দিকে গেলো। মার্শাল তখনো নাক ডাকাচ্ছে। বেথকে জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপার কী? উত্তরে জানালো রস গাড়ীর কাগজ-পত্র পরীক্ষা আর আগের গাড়ীটা সারানো হয়েছে কীনা জানতে এসেছে।

মার্শালকে গাড়ীর বাইরে বার করতে আর দোতালায় পৌছে দিতে আমাকে রীতিমত যুদ্ধ করতে হলো। দড়াম করে পড়লো সে বিছানায়। তাকিয়ে বললো তারপর, "যাও এক পত্তর মাল নিয়ে এসো।" নড়লাম না আমি। রেগে গিয়ে আধ-শোওয়া-আধ-বসা অবস্থায় উঠতে চাইলো মানুষটা। বললাম "ও সব মদ ফদ এখন চলবে না। ডাক্তার না করেছে।"

"ও-সব ঘোড়ার ডাক্তারদের কথা আমি শুনি না" চোখে তার ফুটে উঠলো হীন-নোংরা একটা ভাব। শেষমেষ বললাম, 'ঠিক আছে।" চলে এলাম নীচের বসবার ঘরে। বেথ জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলো। কালো চোখ স্থির। বললাম, "যা করতে হয় আজই করতে হবে বেথ। গতকাল বেঁহুশ না হলে আজ সকালেই চেরিংটন শেয়ার ও কিনতো। খুব আস্তে বললে বেথ, 'কাজটা করবে কীভাবে?" ও প্রশ্নের জবাব দেবার আগে সোজা চলে এলাম গ্যারেজে। খুঁজে পেতে দুটে কাঠের গোঁজ বার করলাম। গ্যারেজে যাবার দরজায় একটা গোঁজ লাগাবার চেষ্টা করলাম। খুব মোটা ঢুকলো না। কুড়ুল দিয়ে কেটে সরু করলাম কিছুটা। দ্বিতীয় গোঁজটা ওদিকের দরজায় লাগালাম। রান্নাঘর আর হলঘর হয়ে সোজা চলে এলাম বাগানে। এবার এলাম গ্যারেজে ঢোকবার সামনের দিকের দরজায়। গোঁজটাকে ঠিক মত লাগিয়ে রাখলাম। আবার চলে এলাম গ্যারেজের ভেতর হলঘর আর রান্নাঘর দিয়ে। গোঁজটা ভালো ভাবেই লেগে আছে। শত ধাক্কায়ও খুললো না। সন্তুষ্ট হলাম নিজের কাজে। বেথের সঙ্গে দেখা হতেই টান-টান গলায় প্রশ্ন করলো, "মতলবটা কী তোমার?" বললাম, "গতরাত তিনটের সময় ও

আমাকে বলেছিলো মোটর গাড়ীর টুকি টাকি রাখবার খুপরী থেকে মদ নিয়ে আসতে। আজকেও ওই জিনিষটার ওপর জুয়া খেলতে চাই। যদি না হয় অন্য চিন্তা করতে হবে।" চুপ করে শুনলো ও। কিছুক্ষণ পরে বললো,—"নীচে আসবে তো ফ্রাংক।" বললাম, "জুয়া খেলাটা তো ওখানটায়।"

আশ্চর্য! মেয়েটার কোনো ভাবান্তর, কোনো উচ্ছ্বাস কিছুই নেই। মনে হলো আমরা যেন একটা বিড়াল মারার ষড়যন্ত্র করছি, "শোনো খুনটা হবার পরেই সবাই মাছির মতো ছেঁকে আসবে। শেরিফ, রস্। রস্ আবার ঝামেলা পাকাতে ওস্তাদ। আমাদের কপাল ভালোই বলতে হবে—রস্ নিজের চোখে দেখে গেছে কী মালটাই না টেনেছে ফ্রাংক। আমরা যা যা করবো একমন এককাটা হয়ে করবো, দুজনের বিবৃতি একই ধরনের হবে। গ্যারেজে ও মরে থাকবার পর সাতটার সময় আমরা ঘুম থেকে উঠবো। খোঁজা-খুঁজি করার পর যেন হঠাৎ-ই ওকে গ্যারেজে পাবো। প্রথম ডাক্তার, তারপর শেরিফকে ডাকবো।"

এবার বললো বেথ, "কিন্তু ফ্রাংক তো এখনো মালিকানা সত্ব পায়নি।" "আমরা অপেক্ষা করতে পারবো না। কোনো ঝামেলা হবে না। উত্তরাধিকার সূত্রে তুমিই সব পাবে। বার্নস্টেইন বড় কঠিন ঠাঁই। ওর সঙ্গে অসহায় বিধবার প্রচুর অভিনয় করতে হবে। একবার যদি সে তোমার টোপ গেলে- দেখতে হবে না। কোনো ঝামেলাই করবে না সে। সব বুঝতে পেরেছো?"

"হ্যা।"

আস্তে করে মার্শালের শোবার ঘরে ঢুকলাম। লোকটা ঘুমায়নি। আলো জ্বলছে। মদের বোতল শূণ্য। বললো, "এই খালি বোতল হাটাও। নুতুন একটা নিয়ে এসো।"

"মাপ করো ফ্রাংক। অনেক হয়েছে আর নয়।" তাকালো আমার দিকে এবার। চোখে চালাকীর আভাষ, "বেশ শেষ একপাত্তর তো নিয়ে এসো।

"মনে থাকে যেন এই পাত্তরটাই শেষ।" এক পাত্তর মদ দিয়ে বোতলটা বাগানের এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখলাম যে খুঁজে বার করা ওর কর্ম্ম নয়।

(৭)

রাত নটার পর এক সময় গ্যারেজে গেলাম। ক্যাডিলাক মোটর চালু করে দিয়ে ঠিকমতো গরম রাখার যন্ত্রটা চালিয়ে দিলাম। জানলাগুলি আর দরজাগুলি গাড়ীর বাইরে এসে খুব ভালো করে চাবি মারলাম—যেন ফ্রাংক ইঞ্জিন বন্ধ করবার কোনো সুযোগই না পায়।

*　*　*　*　*

সকাল চারটেয় হল ঘরের ঘড়িতে ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলাম। নীচের বসবার ঘরে আলো জ্বলছে। মার্শাল সমস্ত ঘরটা হাটকে খুঁজতে আরম্ভ করেছে। পরণে পায়জামা মুখ কোলা। এক সময় মদের শূন্য আলমারির কাছে মাথা ভাঙ্গা অবস্থায় দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর রান্নাঘরে অজান্তে অনুসরণ করলাম মানুষটার। হ্যা ঢুকে গেলো সে গ্যারেজে। বিড়বিড় করতে শুনলাম মানুষটাকে, "কী ব্যাপার ইঞ্জিনটা যে চলছে।" দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলো। স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলেও নিশ্চয়ই গ্যাসের গন্ধ পেতো। কারণ এতো দূর থেকেও আমি ভালোই বিষের ধোঁয়া পাচ্ছি। ব্যাস্! দড়াম করে গ্যারেজের দরজা বন্ধ করে খুব ভালো করে দরজার ফাঁকে গোঁজ বসিয়ে দিলাম। ঘামে মুখ ভিজে গেছে। রুমালে মুখটা মুছে নিলাম। বেথ দাঁড়িয়ে। কড়া এক গ্লাশ হুইস্কি হাতে। মদটা সে জোর করে আমার হাতে ধরিয়ে দিলো। মুখে নেই কোনো অভিব্যক্তি। ভয় পেয়ে গেলাম। রাগও হলো প্রচণ্ড, "লোকটা ওখানে মরছে আর তোমার কী কিছুই মনে হচ্ছে না?" অসংলগ্ন চিৎকারে গলাটা চিরে গেলো আমার। "মতলবটা তুমিই করেছিলে।"

নিচের ঘড়িতে সাতটা বাজলো? এতোক্ষণ আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম। বাথরুমে গিয়ে দাড়ি কামিয়ে চান করে নিতে ভুললাম না। বেথকে দেখলাম। চোখের কোণে কালি পড়েছে। কিন্তু মুখ সেই আগের মতো ভাবলেশহীন। বেথকে জানিয়ে গ্যারেজে এলাম। কিন্তু মার্শালের পাত্তা নেই। ব্যাটা নিশ্চয়ই গাড়ীর পেছন দিকে পড়ে আছে। এবার রান্নাঘরের দিক দিয়ে দরজার নীচের গোঁজটা সরিয়ে ঢুকলাম। প্রথম গোঁজটা আগেই সরিয়েছিলাম। দুটো গোঁজই শেষমেষ তেলের বয়লারের আগুনে বিসর্জন দিলাম। গাড়ীর গ্যাস বেরোয় যে পাইপ দিয়ে তার কাছে মুখটা রেখে উপুর হয়ে শুয়ে আছে মার্শাল। কাঁপা হাতে পকেট থেকে গাড়ীর চাবি বার করলাম। গাড়ীর দরজা খুললাম। ভেতরের গরম আমায় যেন সপাটে

আঘাত করলো মুখে। গাড়ীর ইঞ্জিন করলাম বন্ধ। টুকিটাকি রাখবার খুপরীর মধ্যে অর্ধেক খাওয়া মদের বোতলটা দেখলাম। বোতলে মার্শাল আর আমার দুজনের হাতের ছাপ আছে, কারণ স্বাভাবিক ভাবে দুজনেই বোতল নাড়াচাড়া করেছি। বোতলের মুখ খুলে সবটাই মেঝের কার্পেটে ঢেলে দিলাম একটা দাগ পড়লো কার্পেটে। এবার তাকালাম মার্শালের দিকে। চিৎ করে দিলাম দেহটা। চোখ বিস্ফারিত আর বড় বড়। হ্যা, সে মারা গেছে।

বেথ দরজায় দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে মার্শালকে লক্ষ্য করছিলো। বল্লো এক সময়, "ও-কী মারা গেছে ?"

"নিজেই দেখো না সখী। হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে মারা গেছে। এখন দয়া করে ডাক্তার স্যাণ্ডার্সকে ডাকো। বলে গাড়ির ভেতর বসে সে। মোটর চলছে। বোধহয় মারা গেছে মানুষটা।"

ড্রাইভারের সিটে মার্শালের দেহটা বসিয়ে সামনে ঝুঁকিয়ে দিলাম। বেথের ভাব আর আমার মোটেই ভালো লাগলো না। বল্লাম, "দেখো সুন্দরী বার্নষ্টেইন বা শেরিফ কেউ তোমাকে কোনোদিন দেখেনি।

ভগবানের দোহাই, তোমার ঐ মরা মানুষের ভাব হাটাও। তুমি সবে তোমার স্বামীকে হারিয়েছো। মানি তার মাতলামী অসহ্য! কিন্তু মরা মানুষটার প্রতি তোমার একটুও দরদ থাকবে না। কিছু দুঃখের ভাব ফুটিয়ে তোলো।"

নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিলো, "আর তুমি নিজের চড়কায় তেল দাও" হিস্ হিস্ করে ঠাণ্ডা গলায় বল্লে সে, "তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে—তুমি স্পষ্ট ভয় পেয়েছো!"

বার্নষ্টেইনকে ফোনে সব বল্লাম। সব শুনে বল্লেন তিনি, "তুমি নিশ্চয় যে-ফ্রাংক মারা গেছে ?"

"হ্যা, আমি নিশ্চত।"

"আচ্ছা আমি আসছি।"

শেরিফ ম্যাক-কুইন রসের সংগে আর ডাক্তার স্যাণ্ডার্স প্রায় এক সংগে ঢুকলেন। দশ মিনিট পরে ডাক্তার বেরিয়ে এলেন! শেরিফ ডাক্তারের সংগে কথা বলে রসকে এঁটুলির মতো এঁটে গ্যারেজে চল্লেন বসে বসে আমি শুধু সিগারেট ধ্বংস করতে লাগলাম চারটে সিগারেট শেষ হতে দেখলাম ডাক্তার চলে গেলেন। আরো তিনটে সিগারেট শেষ হতে ম্যাক্‌কুইন আর রস নীচের বসবার ঘরে এলেন। রসের হাতে প্ল্যাষ্টিকের

মোড়কে মদের বোতল। ম্যাক্‌কুইন-ই জিজ্ঞাসা করলেন, "মেমসাহেব কোথায়?' উত্তরের বল্লাম, "উপরে ভদ্রমহিলা শক্ পেয়েছেন। আপনি বল্লে অ'শু ডেকে আ-তে পারি।"

"আগে আমি তোমার সংগে কথা বলবো। আচ্ছা বলো তো ঠিক কী হয়েছিলো?" আদ্যপ্রাপ্ত সব বল্লাম পাখী পড়ার মতো। মাথা নাড়লে ম্যাক্‌কুইন শেষমেষ বল্লেন "মনে হয় এবার আমরা শ্রীমতী মার্শালের সংগে কথা বলতে পারি। রস বল্লে এবার, "বস্, যতোদূর বুঝতে পারছি, কেস-টা সোজা।" ম্যাক্‌কুইন্ জানতে চাইলেন, "তুমি কী বলছো এই মুহূর্তে ভদ্র-মহিলাকে বিরক্ত করবো না?" ধীরভাবে বল্লো রস্, "শ্রীমতীই সব টাকা পাবে। সুতরাং বিরক্ত করে লাভ কী?"

"কয়েক দিনের মধ্যেই অনুসন্ধান আরম্ভ হচ্ছে। ঠিক কখন হচ্ছে পরে জানাবো আমি। হ্যা ডেভাটি, শোনো বাবা, শ্রীমতী কিন্তু এখন খুবই বড়লোক। উল্টে পাল্টা যেন কিছু না হয়। উপরে উঠতে উঠতে শুনলাম ওদের গাড়ীটার বেরিয়ে যাওয়া। বেবে'র ঘরে ঢুকলাম। দরজায় দাঁড়িয়েছিলো সে।

প্রথমটায় চিনতেই পারিনি। কালো ঢোলা জামা। গলায় সাদা উড়নি। এমন কী চুলটার রং-ও পাল্টে ফেলেছে। দেখে মনে হচ্ছে কোনো ভদ্রমহিলা হঠাৎ-ই বিধবা হয়েছেন।

এম্বুলেন্স আসবার সময়-ও দেখলাম বার্নষ্টেইন আর বেথ কথা বলছে। এম্বুলেন্স যখন চলে গেলো, আমি বাগানে। ফিরে গেলাম অনেক পরে বাড়ীর দিকে। বসবার ঘরের দরজা খোলা। বার্নষ্টেইন সিগারেট খাচ্ছে। আমাকে দেখে ডাকলো। "বসো।" মুখ-টা তাঁর পাথরের মতো শক্ত, "তোমাকে যতোটা বলেছিলাম,—তুমি ঠিক ততোটা করোনি।"

"কী হলো আবার?"

"তুমি যদি গাড়ীর ভেতর মদের বোতলটার কথা-টা ভুলে না যেতে তাহলে হয়তো ফ্রাংক বাঁচতো।"

"আপনি কী তাই ভাবেন না কী? তাহলে বলি শুনুন—মাতালের কাছ থেকে মদ আপনি লুকোতে পারবেন না। একদিন হয়তো পারলেন লুকোতে পরের দিন পারবেন না কিছুতেই।"

অনেকক্ষণ তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কাঁধ ঝাঁকালেন আর বল্লেন, "আমি তোমার মেমসাহেবকে নিয়ে যাচ্ছি। ভালো কথা ফ্রাংক তোমাকে কতো দিতো?"

"সাতশো ডলার।" মনিব্যাগ থেকে সাতশো ডলার ভদ্রলোক টেবিলে রাখলেন। "ডেভারি আমি চাই তুমি এখানেই বাড়ীঘর দেখাশোনা করো।"

"মেমসাহেব কী বাড়ী-ঘর বেঁচে দিচ্ছেন?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"স্বাভাবিকভাবেই ভদ্রমহিলা আর এখানে থাকতে চান না।"

"ঠিক উকিল সাহেব। আমি থাকবো আর যথারীতি ব্যবস্থা ও করবো।"

এই সময় বেথ এসে দাঁড়ালো দরজার সামনে। ওর হাতে একটা হোল্ড-অল। তীরের মতো আসন থেকে উঠে উকিল বার্নষ্টেইন্ হোল্ড-অল নিয়ে নিলো। "শ্রীমতী মার্শাল ডেভারি বাড়ী ঘর দেখশোনা করতে রাজী হয়েছে।" বল্লেন উকিল মুখে মতো যতোটা তেল দেওয়া যায়, "দয়া করে আমার গাড়ীতে গিয়ে বসুন। আসি আসছি।"

কাঁপা কাঁপা গলায় বল্লো বেথ, "ডেভারি তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ।"

সমস্ত বাড়ীটা খাঁ খাঁ করছে। কে-ও কোথাও নেই। নেই কোনো সাড়া শব্দ। আমি আর থাকতে পারলাম না। বিকেল ছটার সময় বেরিয়ে পড়লাম উইকষ্টীডে।

দু-দিন পরে বাড়ির দালাল এক খদ্দের নিয়ে এলো। চাষী খদ্দের। আবার সংগে এনেছে তার হোঁদল কুৎ-কুৎ বৌ—ওরা যেন সমস্ত বাড়টা দাপিয়ে বেড়ালো কিছু সময়। হ্যাঁ, ওদের বাড় পছন্দ হয়েছে।

ঠিক তার পরের দিন ফোন বাজলো। বার্নষ্টেইন কথা বলছে। "আমি তোমার ব্যাংকে সাতশো ডলার জমা করে দিচ্ছি ডেভারি।" ওর গলার স্বর শুনেই বুঝতে পারলাম আমার সংগে কথা বলার ওর মোটেই সময় নেই। "তোমার আর দরকার নেই। আর একটা কাজ দিচ্ছি তোমায়। গাড়িটা বিক্রি করে দাও। যতো বড় দাও পাও নেবে। চেক-টা পাঠিয়ে দেবে আমায়।"

এবার বল্লাম আমি, "আমি একটু মেমসাহেবের সংগে দেখা করতে চাই। আচ্ছা কোথায় দেখা পাবো তার বলুন তো?"

"ধরো। উনি এখানেই আছেন।" অনেকক্ষণ চুপচাপ। তারপরই বেথের গলা, "কে কীথ?"

"হ্যাঁ। আমরা কোথায় কথা বলবো?" খুব জোরে ফোনের রিসিভারটা চেপে ধরলাম। গাঁটগুলো সাদা হয়ে গেলো. "তুমি ফ্রাংকের জন্য যা করেছো তার জন্য আবার ধন্যবাদ জানাই। আমার মনে হয়—তুমি অন্য কোথাও ঠিক একটা চাকুরী পেয়ে যাবে।" ব্যস্ ফোনটা যোগছিন্ন হয়ে পড়লো।

সমস্ত ঘরটায় চরকির মতো ঘুরতে লাগলাম। সন্দেহ আর অবিশ্বাসের কুটিল ছায়া মনে উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে অবশ্য তৃতীয় সম্ভাবনা মনে এলো। ভাবলাম—বেথ ঠিকই বলেছে। পাশেই দাঁড়িয়ে বার্নষ্টেইন। একজন চাকরের সংগে সে নিশ্চয়ই আলাপের দিন ঠিক করতে পারে না। বেথ এখন লাখপতি আর আমি। কিন্তু কী করে দেখা করবো?"

ক্যাডিলাক-টা ফিরিয়ে দিলাম যেখান থেকে কিনেছিলাম। আর নিজের জন্য কিনলাম খুব সস্তায় ভকস্‌ওয়াগন। বাড়িতে ফিরে আবার ফোন করলাম বার্নষ্টেইনের অফিসে বিকেল পাঁচটায়, "আমি কীথ ডেভারি বলছি। মার্শালের সংগে কথা বলতে চাই।"

"উনি তো এখানে নেই।"

"কিন্তু ওনার সংগে যে আমার কথা বলা খুবই দরকার।" গলার স্বর যতো-দূর পারলাম ঠিক রাখলাম, "ভদ্রমহিলার টেলিফোন নাম্বার-টা কী?"

"আপনি বার্নষ্টেইন সাহেবের সংগে কথা বলুন।" ওপাশ থেকে এরপর আর সাড়া পাওয়া গেলো না।

জানলার পাশে ফ্যাকাশে মুখ নিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। মুখে রক্ত জমলো একসময়, "ঠিক আছে বেথ।" জোরেই বললাম মুখে থুথু ছিটিয়ে, "ভেবো না তুমি পার পেয়ে যাবে। তোমাকে ঠিক খুঁজে বার করবো। তারপর চাই আমার পাঁচ লক্ষ ডলার।"

(৮)

মনে পড়লো ফ্রিসকোর সেই হোটেল ও লাগোয়া রেষ্টুরেন্টের কথা। হ্যাঁ, ওখানে তো বেথ কাজ করতো। হোটেলের সেই লোকটার নাম…কী যেন,—মেরিও। মেরিও স্পষ্ট বেথকে ভয় পেয়েছিলো। ঠিকমতো খেলাতে পারলে লোকটা নিশ্চয়ই গান গাইবে। না, আর সময় নষ্ট করা যাবে না। ফ্রিসকোর পথেই শেরিফ ম্যাক্‌কুইনকে দেখলাম। কী ব্যাপার সহকারী শেরিফ রস্‌ তো নয় পাশে! এ-যে দেখছি নতুন একটা পুরুষ। গাড়ি থামিয়ে শেরিফের কাছে গেলাম, "নমস্কার শেরিফ সাহেব। চলে যাচ্ছি।"

"আরে কীথ। এই যে আমাদের নতুন সহকারী শেরিফ—এলিসন।"

"আচ্ছা তাহলে রস্‌ শেষমেষ বদলীটা পেলো?"

"না. না। ও-তো চাকরী ছেড়ে দিলো," ম্যাক্‌কুইন কাঁধ ঝাঁকালো, "ফ্রিসকোর একটা কারখানায় নিরাপত্তার দিকটা দেখে আজকাল"

"আচ্ছা। তা আমি তো নিজেই ফ্রিসকোয় চল্লাম। চাকরীর ধান্দায়।" পকেট থেকে এনভেলাপ করা চাবি-টাবি আর কাগজ-পত্র ওঁকে ধরিয়ে দিলাম, "বাড়ির দালালকে যদি এটা দেন তবে বাধিত হই।"

"ঠিক আছে দেবো।"

বিকেল তিনটে নাগাদ ফ্রিসকোর সেই হোটেল-রেষ্টুরেণ্টে হাজির হলাম। মিনিট দুয়েক পরে রান্নাঘর থেকে মেরিও এলো। অবাক আমাকে দেখে, "ওঃ, আচ্ছা আপনি তো বেথের বন্ধু" হাত বাড়ালো সে। "এক পাত্তর বীয়ার খেতে, হাতে তোমার কাজ না থাকলে।" বল্লাম আমি, হাসলো আর খালি ঘর দেখিয়ে বল্লে, "দেখে কী মনে হয় আমি ব্যস্ত ?"

"বেথের স্বামী ফ্রাংক মার্শালের কথা শুনেছো ?"

"কই না তো ?"

"মারা গেছেন ভদ্রলোক !" মেরিও বল্লো, "ভগবান যেন তাঁর আত্মার কল্যাণ করেন। আচ্ছা শুনেছিলাম ভদ্রলোকের বিরাট একটা বাড়ি আছে। বেথ কী বাড়িটা পেয়েছে ?"

"হ্যাঁ বাড়ি আর বেশী কিছু টাকা।"

"হ্যাঁ, ওই হচ্ছে ঠিক বেথ। সব সময়ই জিতবে।" মোটা উরু চাপড়াতে চাপড়াতে বল্লো মেরিও, "আচ্ছা কতো টাকা পেয়েছে বলুন তো ?"

"বলতে পারবো না। তবে বেশ কিছু টাকা।"

"ভালোই হলো বেথের। এখন দিব্বি মদ আর সিগারেট—ভালোবাসার পুলিশটাকে চুবিয়ে রাখতে পারবে।"

"ভালোবাসার পুলিশ মানে ?"

"আপনি ওকে চেনেন না। উইকষ্টীডে সহকারী শেরিফ। সব সময় গোলমালের জন্য ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়। নাম রস। রসের ছুটির দিনে মেয়েটা পাগল হয়ে যেতো। সব কিছু আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে রসকে নিয়ে ঘরে খিল আঁটতো।"

মেরিওর দিকে তাকিয়েই রইলাম। যা বল্লো সেটা ঠিক কোনো বৃত্তান্ত নয়। যেন একটা ঘুষি—তলপেটে সজোরে এসে আঘাত করলো। মুখটা তেতো হয়ে গেলো। "বেথের কথায় বুঝেছিলাম,—এখানেই থিতোতে চায়।"

"ঠিক বলেছেন। বেথের জন্য এখানেই। এর্কাড এভিন্যুতে ওর বাপ ছোটো-খাটো একটা বাড়ি রেখে গেছে। ও আবার আদর করে নাম রেখেছে "আপেল গাছ"।" যা জানতে চেয়েছিলাম সবই জানা হয়ে গেলো।

সস্তার একটা হোটেলে উঠলাম। বসে বসে চিন্তা করতে লাগলাম—কী রকম অন্ধ আমি। মেরিও-ই মোহমুক্তি ঘটালো। ওঃ কী বোকা আমি!

প্রথম যেদিন বেথের সংগে দেখা হয়েছিলো সেদিনের কথা ভাবলাম। তাহলে সব ব্যাপারটাই ও জানতো। শহরে নতুন এসেছি আমি। সদ্য জেল থেকে বেরোনো। উফঃ! ওরা আমাকে যন্ত্রের মতো ব্যবহার করেছে!

রাস্তার ম্যাপ বার করে অর্কাড এভিন্যু খুঁজলাম। বেথের দেখা পেলে কী করবো?

নানা রকম পরিকল্পনা মাথায় এলো। কিন্তু কোনোটাই কাজের নয়। হঠাৎই মনে পড়লো মেরিও বলেছিলো বেথ রসের জন্য পাগল। রসকে বড়শীর টোপ করতে হবে।

অর্কাড এভিন্যু শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, পাহাড়ের ওপর থেকে যে রাস্তাটা বেরিয়ে গেছে। খুব কষ্ট করে বার করলাম। প্রত্যেক বাড়ীটারই একটা নাম আছে। কিন্তু "আপেল গাছ" মার্কা কোনো বাড়ী চোখে পড়লো না। পথের অর্ধেকটা গিয়ে দেখলাম একজন মোটা ভদ্রমহিলা গেটে হেলান দিয়ে সিগারেট ফুঁকছেন আর হাওয়ায় সংগে কথা বলছেন. "কী বাবা তুমি কোন বাড়ীটা খুঁজছো বলোতো?"

"নমস্কার, হ্যাঁ, আমি "আপেল গাছ" নামে বাড়ীটা খুঁজছি। বাড়ীটা বলে ভাড়া পাওয়া যাবে?"

"ওঃ তাই বলো "আপেল গাছ" খুঁজছো। ও বাড়ী বলে না দিলে সারা জীবনেও খুঁজে পাবে না। এই রাস্তার মাথায় কানাগলির শেষে কতোগুলি গাছের জটলার পেছনে। তবে ওখানে না যাওয়াই ভালো। কদিন হলো সে ফিরে এসেছে।"

বয়স্ক ভদ্রমহিলা যেভাবে 'সে' কথাটা বল্লেন ঘৃণার সংগে—আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বল্লাম, "হ তো বাড়ীটা এখন ভাড়া দিলেও দিতে পারেন।"

"মনে হয় না আর তা ছাড়া এটা ভদ্রপাড়া। ওরা দু-জন যে সব কাজ কারবার চালায়—তাতে ওদের এখানে থাকাই চলে না।"

"আচ্ছা চলি!" চলে আসছিলাম। ভদ্রমহিলা বল্লেন পেছন থেকে, "কী যেন বাছা বল্লে তোমার নামটা?"

"লুকাস্, হ্যারি লুকাস্।"

"ওঃ আচ্ছা। আমার নামটা হলো আবার এমা ব্রডী।"

ধুলোর রাস্তা পেরিয়ে কাণা গলিটার শেষে পেলাম বাড়ীটা। লাল পর্দার

আড়ালে জানলা দিয়ে দেখলাম, আলো জ্বলছে। কোথাও বোধহয় টি-ভি-ও চলছে গ্যারেজে গাড়ীও দেখলাম একটা। নিঃসারে জানলার কাছে চলে গেলাম অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরেই চিৎকার শুনলাম, "এই ভাবে যদি টি, ভি, চলতে থাকে, তবে আমি পাগল হয়ে যাবো।" টি, ভি-টা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলো। বেথের গলা, "অরেকটা ষ্টেশন দেখো সোনা।" বেথ কোনোদিন আমাকে সোনা বলেনি। আবার বল্লে সে, "দাঁড়াও না আধ-ঘণ্টার মধ্যে লড়াইয়ের ছবিটা আরম্ভ হচ্ছে।"

"ওসব মারামারির ছাই-পাঁশ কে দেখতে চায়?"

"দু-সপ্তাহের আগে কিন্তু টাকা পাচ্ছি না।" এবার বল্লো বেথ। "দু-সপ্তাহ! ওরে বাপ, দু-সপ্তাহে আমি এখানে থাকছি না। তুমি তো বাড়ী বেচার টাকাটা পেয়েই যাচ্ছো। একটা ভালো দেখে বাড়ী কেনো। বার্নষ্টেইন ঢ্যামনার কাছে টাকা চাও।"

"সোনা, একটা কথা মনে রেখো—উকিলটা কিন্তু তোমার সম্বন্ধে কিছুই জানে না। এমন কিছু করো না—যাতে ও কোনো ধারণা করতে পারে। লোকটা ভীষণ সেয়ানা।"

"ও সেয়ানা ধরে জল খাক। তুমি ব্যাটার কাছে মোটা মতো টাকা ধার নাও। মনে করো আমরা মিয়ামি যাচ্ছি। একবার টাকা পেলে হারাতে কতোক্ষণ?"

উইকৃষ্টিডের ব্যাংক থেকে জানলাম বার্নষ্টেইন আমার নামে সাতশো ডলার জমা করেছে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে বল্লাম চেস্ ন্যাশানাল ব্যাংকে দিয়ে দিতে। ঐ ব্যাংকটা আবার আমার হোটেলটার পাশে। আমার কাছে মোট রইলো সাতেরোশো ডলার। মনোহারি দোকান থেকে মসার ০·৬৩ পিস্তল কিনলাম। বলা বাহুল্য ভুয়ো নাম ঠিকানা দিয়ে। ভকস্ ওয়াগানের টুকিটাকি রাখবার জায়গায় পিস্তলটা রেখে দিলাম। তারপর চল্লাম অর্কাড এভিন্যুতে। ঐ অঞ্চলের অফিসে গেলাম। কেরানীকে পেলাম। জানতে চাইলাম ওখানে কোনো বাড়ীতে সবেতন অতিথি থাকা যায় কী না। কিছুক্ষণ হলদে দাঁত খুঁচিয়ে বল্লে সে,—হ্যা শ্রীমতী ব্রডীর ওখানে খোঁজ করতে পারেন।"

ম্যাপটা বার করতে বল্লাম। ম্যাপে ব্রডীর বাড়ীটা ও দেখিয়ে দিলো। ম্যাপ থেকেই দেখলাম ব্রডীর বাড়ীর পেছনেই "আপেল গাছ" বাড়ীটা। সংগে সংগে চলে গেলাম শ্রীমতী ব্রডীর বাড়ীতে। সেই মোটা মানুষ, মুখে সিগারেট। চিনতে পেরে মুখটা উজ্জল হয়ে উঠলো। "হ্যা আপনি ঠিকই বলেছেন "আপেল

গাছ" ভাড়া পাওয়া যাবে না। তবে কেরানীবাবু বল্লেন এখানে মাঝে মাঝে বাড়ী বিক্রী হয়। তবে অপেক্ষা করতে হবে। তাই বলছিলাম যদি আপনি দয়া করে আমাকে সবেতন অতিথি রাখেন!" রাজী হলেন ভদ্রমহিলা।

সাড়ে চার দিন "আপেল গাছ" বাড়টায় রাত দিন চোখ রেখে বুঝে নিলাম ওরা কীভাবে জীবন কাটায়। সকাল দশটায় রস গাড়ী করে বেরিয়ে যায়। এগোরাটার কিছু পরে বেথ বাজারের থলি কঁাধে ঝুলিয়ে স্কুটারে বেরিয়ে পড়ে। বেথ ফেরে পৌনে একটা নাগাদ কিন্তু রস্ ফেরে বিকেল ছ'টায়। বিকেলে কিন্তু ওরা কোথায় না বেরিয়ে পড়ে পড়ে টি, ভি, দেখে।

পরের দু'দিন আবার নজর রাখলাম। দেখলাম দুপুর একটা থেকে বিকেল ছ'টা পর্যন্ত বেথ একদম একলা থাকে বাড়ীটায়। ঠিক সপ্তম দিনে দুপুর দুটোর সময় আমার ভকস্ওয়াগান থেকে মসার পিস্তল নিয়ে "আপেল গাছ"—এ, মানে বেথদের ডেরায় ঢুকলাম। বাগানে কাজ করছিলো বেথ। আমার লম্বা ছায়া দেখে থমকে গেলো তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো একসময়। অবাক হলাম কী দেখে মেয়েটার জন্য পাগল হয়েছিলাম। বমি এলো এখন। বল্লাম দাঁত বার করে, "আরে বেথ যে! কী বিয়াপা'র? মনে পড়ে আমাকে?" প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলো মেয়েটি। এখন ঘুরে দাঁড়ালো আমার দিকে। কিন্তু মনের ভাব বুঝতে দিলো না আমাকে। "কী চাও তুমি" ঠাণ্ডা অথচ শক্ত গলায় প্রশ্ন রাখলো সে। "চলো ভেতরে গিয়ে কথাবার্তা বলি আমরা।" বল্লাম, "বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে!" মুখে থুথু ছিটিয়ে বল্লে যেন সে।

"একটা কথা শুধু। এতে তোমার আর রস দু'জনেরই ভালো হবে"

"কোনো কথা শুনতে চাই না আমি। বেরোয় এখান থেকে।" সোজা চল্লাম ওদের বাড়ীর দিকে। কিছুটা ইতঃস্তত করে ও পিছু পিছু এলো। সুন্দর সাজানো ঘর। বেথ ঘরে ঢুকতেই দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, "ফ্রাংকের টাকার আধো হিসসা ছাড়ো।" হাত মুঠো করে বললে সে, "নিয়ে নাও।" এবার মসার পিস্তল বার করলাম। পেছিয়ে গেলো ও একপা, "আহা ভয় পেয়ো না। দশটা গুলিই রসের জন্য যদি না তুমি পাঁচ লক্ষ ডলার উপুর হস্ত করো।"

"বাজারে জোচ্চর! তবু তুমি কিছুই পাচ্ছো না।"

"না, মোটেই ধাপ্পা দিচ্ছি না। এ মাসের মধ্যে যদি না আমার প্রাপ্য পাই—দশটা গুলিই রসের বুকে বিধবে। একটা যে খুন করেছে দুটো খুন তার

কাছে কিছুই না।" ওকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে এলাম ঘর-বাগান ছেড়ে সোজা শ্রীমতী ব্রডির আস্তানায়।

ঘুমিয়ে পড়লাম নিজের বিছানায়। জানি ছটায় রস না ফিরলে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। উপরন্তু আমাকে বোধহয় সারারাত জাগতে হতে পারে। সাতটার পর শ্রীমতী ব্রডী রাতের খাবার নিয়ে এলে উঠে পরলাম। ভদ্রমহিলা বাজে বেরিয়ে যাচ্ছেন বলে চলে গেলেন।

টেলিফোন বই থেকে বেথের ফোন নম্বার আগেই পেয়েছিলাম। ফোন করলাম বেথকে। অনেকক্ষণ পর সাড়া দিলো, "কে কথা বলছেন?"

"আমি তোমাদের রাস্তায় নজর রাখছি। শুভরাত্রি।" ফোন ছেড়ে দিলাম।

পরের দিন সকালেই ওদের জীবন যাত্রার ছক পাল্টে গেলো। রোজকার মতো সকাল দশটায় রস আর বেরুলো না। আচ্ছা, তাহলে বেথ ওকে বলেছে। বেথ নিজেও বাজার করতে গেলো না। জানলার পর্দাগুলি ভালো করেই টেনে দেওয়া। খবরের কাগজ দেওয়া ছেলেটা বারান্দায় কাগজ ছুরে দিয়ে গেলো অথচ কেউ সেটা নিতে এলো না ওরা কী ভয় পেলো? হলেও হতে পারে..... তাহলে প্রথম ক্ষেপে আমিই জিতলাম।

ঐ দিনই রাত একটার সময় যখন নিশ্চিত হলাম শ্রীমতী ব্রডী ঘুমে আচ্ছন্ন, আমি চললাম "আপেল গাছ" বাড়ীটার দিকে। সমস্ত বাড়ীটা অন্ধকারে ঢাকা। তবুও খুব আস্তে আস্তে আমি বাড়ীটার দিকে গেলাম। চুপিচুপি গ্যারেজে ঢুকলাম। গাড়ীর দরজা খোলা। হুড খুলে কারব্রুেটরটা তুলে নিলাম। সোজা পকেটে। তারপর একই ভাবে বাড়ী ফিরে এলাম।

পরের দিন রস বাড়ীতেই রয়ে গেলো কিন্তু বেথ স্কুটারে করে বাইরে চললো। জানলার পর্দা ভালো করে টানা। নিশ্চিত হলাম এবার ওরা ভয় পেয়েছে। কিন্তু কোনো ঝুঁকি নয়। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই বেথ ফিরে এলো। শ্রীমতী ব্রডি এক সময় তাঁর অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে গেলে, দরজা বন্ধ করে আমি আবার ফোন করলাম, "তোমার নাগরের যদি বুকে গুলি খেতে ইচ্ছা করে তবে কালগালের শেষে তাকে রাতে আসতে বলো।" কথাটা শেষ হতেই ফোন ছেড়ে দিলাম।

স্নায়ু যুদ্ধে বিশ্বাসী আমি। রাতের খাওয়ার শেষে চিরকুট লিখলাম একটা, "আর দু'দিন আছে। তোমার ওপর সব নির্ভর করছে।"

শ্রীমতী ব্রডী ঘুমিয়ে পড়লে মাঝ-রাতে চললাম "আপেল গাছ" বাড়ীটার

বাগানের পথে। পেলাম ভারী পাথর একটা। চিরকুটটা পাথরে জড়িয়ে নিয়ে বসবার ঘরে পর্দা ভেদ করে ঘরে পুরে দিলাম। 'ঠকাস'-করে পাথরটা মেঝেয় গিয়ে পড়লো। না, ঘরের ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ এলো না।

(৯)

সকালবেলার খাবার আনতে শ্রীমতী ব্রডী চলে গেলে ভাবলাম আর মাত্র একটা দিন। জানলার পাশে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বেথ স্কুটারে বেরুলো একসময়। তাহলে এটাই দাঁড়ালো—রসের বাইরে বেরোবার মুরোদ নেই।

শ্রীমতী ব্রডি বেরোবার জন্য তৈরী হয়েছিলেন। এসময়ই ফোনটা এলো। হঠাৎ আমার ঘরে এলেন, "তোমাকে একজন ভদ্রলোক ডাকছেন। কথা বলো। আমার বিশেষ তাড়া।" বেরিয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা।

কাঁপা-কাঁপা গলায় বললে রস, "তুমি কী ডেভারি কথা বলছো?" বললাম, "মামনা তোমার সংগে নয় রস্, বেথের সংগে। আমি বেথের সংগে কথা বলবো।"

"কথা শোনো। বেথ এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরছে না। আমি তোমার সংগে দেখা করতে চাই।" শেষমেষ বললাম আমি, "ঠিক আছে চলে এসো। কিন্তু কোনো চালাকি নয়।" মনে মনে তারিফ করলাম। পুলিশী-বুদ্ধি দিয়ে রস্ ঠিক আমাকে বার করেছে।

দু-মিনিট পরে রস্ এলো। ভিজে একটা সার্ট আর সুতির প্যাণ্ট পরে। ওকে দেখে মনে হলো আমার সংগে স্নায়ুর যুদ্ধে ও একদম ছোবড়া মেরে গেছে। "আমি চলে যাচ্ছি ডেভারি এ-জায়গা ছেড়ে। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।" বললে সে।

"বসে পড়ো।" বললাম আমি।

"বেথ পাগল হয়ে গেছে!" হঠাৎ বললে সে, "আমি আর ওকে সহ্য-করতে পারছি না। ওঃ কতোদিন ধরে ওর সংগে আমি বন্দী জীবন-যাপন করছি। পাগলী বন্দুক কিনতে গেছে। ও চায় আমি তোমাকে এখানে এসে খুন করে যাই।"

এবার আমি বললাম, "তুমি কী আমাকে খুন করতে চাও না? ভাবো তো আমি মরলে তুমি কতোগুলি টাকা একসংগে পাবে।"

"টাকা।" তার গলার স্বর যেন চিৎকার করে বলতে চাইলো, "ওর টাকায়

আমি কাণা পয়সারও মূল্য দিনা। বেরিয়ে যেতে চাই আমি। ভালো করে শোনো। আমি শপথ করে বলছি—ও যে ওর বরকে খুন করার মতলবে আছে সেটা জানতাম না। ভগবানের দোহাই! জানি ও আমার জন্য পাগল। কিন্তু বেথ আমার কাছে সংগী ছাড়া কিছুই না। আমি কিছুই চাই না। ওকেও নয়, ওর টাকা-পয়সাও না। আমি শুধু চাই এখান থেকে বেরিয়ে যেতে!"

ওর বকবকানি থামাবার জন্য বললাম, "এসব কথা তোমার আগে ভাবা উচিৎ ছিলো। তুমি কী চিরকুটটা দেখোনি। তুমি হচ্ছো জামিন। তোমাকে ছাড়া টাকা পাওয়া যাবে না। যাও, এখন বেরোও।"

পরের দিন সকালে জলখাবার দেবার সংগে শ্রীমতীজী জানালেন যে তিনি বাড়ী থাকতে পারছেন না, যেহেতু তাঁর অসুস্থ বন্ধুর রোগটা বেড়েছে। সকাল নটার মধ্যে আমার খাবার আয়োজন করে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

সকাল দশটায় বেথকে ফোন করলাম। ও ফোন ধরলে বললাম, "আজকেই নির্দিষ্ট দিন বেথ। বলো তোমার উত্তর কী? হ্যাঁ-না, না?" কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর বেথ তার স্বভাবসিদ্ধ ঠাণ্ডা ভরাট গলায় বল্লো, "আমি কথা বলতে চাই তোমার সংগে। হ্যা, এখুনি যাচ্ছি।"

কিছু সময় পরেই বেথের পায়ের আওয়াজ পেলাম দরজায়। ঘরে ঢোকার সংগে-সংগেই দরজা বন্ধ করে দিলাম, বললাম, "ঢং রেখে স্পষ্ট জানাও টাকা দেবে কী-না?"

"আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার আকুণ্ঠ ধন্যবাদ। কারণ তুমি আমার যে উপকার করেছো—এতোবড় উপকার কেউ কোনোদিন আমার করে'নি।"

অবাক হলাম, "উপকার?" কিছুটা বা ভয় পেয়ে শক্ত হয়ে গেলাম।

"কী বলতে চাও তুমি?"

"বলছি। এতোদিন ধরে যৌন-লিপ্সা আর পুরুষ—এই শুধু জানতাম। পুরুষের সংগে আমার খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ। তারপর রস যেদিন জীবনে এলো ভালোবাসায় পড়লাম আমি।"

বিরক্ত হলাম। অস্থির ভাবে বললাম, "বসে বসে আমি কী তোমার পাগলামী শুনবো?"

"শুনলেই ভালো করবে। যাও, খুন করে এসো গিয়ে। আমি আর ওকে ভালোবাসিনা। ওকে দেখলেই ঘৃণায় সমস্ত দেহ রি-রি করে ওঠে।"

"বা! বা! তুমি আমাকে আর বোকা-বানাতে পারবে না বেথ।" চিৎকার করে উঠলাম আমি।

উঠে পড়লো বেথ। দরজার হেঁটে চললো। বললাম, "দাঁড়াও বেথ। থামলো সে। মুখে বংকিম হাসি। হাসিটা যেন গায়ে ছুরির মতো বিঁধলো, "টাকা আমার চাই নচেৎ রস্ গুলি খাবে।"

"আমিও সেটা চাই। উপকার করো একটা—খুন করে ফেলো।"

চলে গেলো বেথ।

মশার পিস্তলটা নিয়ে ভাবতে বসলাম। মার্শালকে খুন করে পার পেয়েছি। কিন্তু রস্‌কে খুন করে পার পাবো না। রস্ খুন হলেই বেথ পুলিশকে ফোন করবে। বলবে আমি ওকে ব্লাক্‌মেল করতাম। রস্ বেথকে বাঁচাতে গিয়ে আমার হতে খুন হয়েছে। বার্নষ্টেইনের মতো উকিল আর হাতে টাকা মজুত থাকতে সে অবশ্যই পার পাবে।

উঠে পড়লাম। না আমার বরাতে খুব একটা টাকা জুটবেনা। না হোক, উইকষ্টীডে কাজের মাধ্যমে তো বড় হতে পারি।

নিজের জিনিষপত্র স্যুটকেশে গুছিয়ে নিলাম। দশ মিনিটের মধ্যেই চলে যেতে পারবো। দ্রুত শ্রীমতী ব্রডীকে চিঠি লিখলাম একটা সংগে দু সপ্তাহের খরচ। লিখলাম স্ত্রী ভালো হলেই ফিরবো আমি।

হঠাৎই নিজেকে মহানুভব মনে হলো। যাবার আগে বেথকে শুভেচ্ছা জানাই তার টাকা-পয়সা আর মরদটার জন্য। ফোন তুললাম। রসই বললে, "কে কথা বললেন?"

"ডেভারি বলছি। বেথকে দাও"

অনেকক্ষণ চুপচাপ। রস বললো আবার, "খুব দেরী করে ফেলেছো। তোমাকে আর বেথকে আমি গেঁথে ফেলেছি।" এর পরই ফোনে ভেসে এলো পাগলের হাসি। আমার শিরঃদাঁড়ায় যেন একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেলো, "তোমরাই আমাকে কাজটি করালে। বেরিয়ে আসতে চাইলাম আমি পুলিশকে ডেকে। কিন্তু বেথ দেবে না। বেথ তোমার কিছুই করতে পারলো না কিন্তু আমি বেথর বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছি। পুলিশ আসছে। পুলিশই আমাকে তোমার খপ্পর থেকে বাঁচাবে।"

"কী বলছো তুমি পাগল!"

"আমি পুলিশকে ডাকতে চাইলাম। বেথ ফোন করতে দেবে না। তাই

শেষমেষ কুড়োল দিয়ে ওর মাথায় মারলাম। দেখে যাও সমস্ত ঘরটায় কেমন ওর মাথার ঘিলুতে ভরে আছে।"

কান্নায় হঠাৎ রস্ ভেংগে পড়লো।

আর সময় নেই। পালাতে হবে। গাড়ীতে উঠে পড়লাম। ভকস্‌হল্যাগানে। হাতের কাছেই রইলো মসার পিস্তলটা।···

নরকে এক রাজা

এডগার এলেন পো

একদম সত্যি! আমি বড্ড বেশী ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। আসল কথা আমি এখনো ভীষণভাবে চঞ্চল। কিন্তু তাই বলে কী তোমরা আমাকে পাগল বলতে পারো? রোগ আমার স্নায়ুকে সচেতন করেছে, ধ্বংস কিংবা পংগু করেনি। সবচেয়ে বড় কথা আমার শ্রবণ-যন্ত্রকে অত্যন্ত সচেতন করে তুলেছে। আমি এখন সবকিছু শুনতে পাই। পৃথিবীর বলো, কী স্বর্গেরই বলো। নরকেরও আমি অনেক কিছু শুনতে পাই। তাহলে আমি কী করে পাগল হলাম? মনোযোগ দিয়ে শোনো কী সুষ্ঠু আর শান্তভাবে আমি সমস্ত গল্পটা বলি।

কী করে আমার মাথায় চিন্তাটা ঢুকলো আজ তা বলা অসম্ভব। কিন্তু একবার যখন ঢুকলো তখন দিন আর রাত সেটা আমাকে কুরে কুরে খেতে লাগলো। না ছিলো কোনো উদ্দেশ্য না তাড়না। বুড়ো লোকটাকে আমি ভালোবাসতাম। সে আমার কোনো অন্যায় করেনি। কোনো অপমানও নয়। তার সোনা-দানার ওপর কোনো লোভ ছিলো না আমার। মনে হয় তার চোখ—হ্যা চোখই বটে। তার চোখ ছিলো শকুনের মতো। হাল্কা নীলচে চোখ—তার ওপর ছিলো একটা স্বচ্ছ জলের পর্দার মতো। যখনই সেই দৃষ্টি আমার ওপর পড়তো রক্ত আমার ঠাণ্ডা-মেরে যেতো। তাই ধীরে ধীরে—খুবই আস্তে আস্তে আমি ঠিক করলাম বুড়োটার প্রাণ আমি নেবো। আর এই ভাবেই ওই চোখের দৃষ্টি থেকে নিষ্কৃতি পাবো একদিন।

এবার আসল কথায় আসা যাক। তোমরা আমাকে পাগল মনে করছো। পাগল কিছুই জানে না। কিন্তু আমাকে পরীক্ষা করে নাও। তোমাদের

বুদ্ধিমানের মতো আমাকে যাচাই করে নেওয়া উচিৎ—কী রকম বুদ্ধির সংগে কী রকম সাবধানতার সংগে -কী রকম দূর-দৃষ্টির সংগে—আর মিলিয়ে মিশিয়ে কাজ শেষ করেছিলাম। বুড়ো লোকটার ওপর আমার কোনো দয়া ছিলো না। ওকে খুন করবার আগের সপ্তাহে আমি বিন্দুমাত্র ক্ষমা দেখাইনি। এবং প্রত্যেক দিন মাঝরাতে তার দরজার হুড়কো খুলে তার দরজাটা খুলতাম। কী সন্তর্পণে! খুব যত্নের সংগে দরজাটা খুলে—যাতে কেবলমাত্র আমার মাথাটা গলে। আমি একটা ভুষোকালি-মাখা লণ্ঠন রাখতাম। সেটা আবার চারদিক ঢাকা। সাবধান হতাম যাতে কোনো আলো ঘরে না ঠিকরে গিয়ে পড়ে।

এর পরেই আমি আমার মাথাটা ঘরের মধ্যে সেধিয়ে দি। তুমি যদি দেখতে কী রকম চতুরতার সংগে আমি আমার মাথাটা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতাম,—তুমি অবশ্যই হেসে উঠতে। আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে আমি মাথাটা ঘরের মধ্যে স্রেফ গলিয়ে দি। খুবই সতর্ক ছিলাম যাতে বুড়োর ঘুম ভেংগে না যায়। প্রায় একঘণ্টা লাগলো দরজার ফাঁকের মধ্যে আমার মাথাটা ঢোকাতে তখনই কেবল আমি দেখলাম যে বিছানার ওপর শুয়ে আছে। হা, হা.! একজন উন্মাদ কী এতো বিচক্ষণতার সংগে কাজটা শেষ করতে পারতো। তারপর ঘরে মাথাটা যেইমাত্র ঢুকলো, আমি-ও লণ্ঠনের পালতেটা বাড়িয়ে দি খুবই সতর্কতার সংগে। এতো সতর্কতার সংগে যেন পলতের দাঁতে কোনো শব্দ না বেরোয়। পলতে বাড়ানোর মাত্রা শেষ করলাম—একটা সরু রশ্মি যখন সবে শকুনের চোখে গিয়ে পড়লো। এই একই কাজ আমি করলাম সাতদিন সাত-রাতে—ঠিক মাঝরাতে। কিন্তু প্রতিদিনই দেখলাম। তার চোখ-টা বন্ধ। তাই তাকে খতম করা ছিলো অসম্ভব। বুড়ো মানুষ-টা কিন্তু আমাকে বিরক্ত করেনি, বিরক্ত করেছিলো তার অশুভ চোখ! আর প্রত্যেকদিন সকালবেলা বীরের মতো আমি তার ঘরে ঢুকে সাহসের সংগে কথাবার্তা বলতাম, সহৃদয়তার সংগে তার নাম ধরে জিজ্ঞাসা করতাম,—গতরাত কী ভাবে সে কাটালো। সুতরাং তোমরা দেখতে পারছো সে বেশ ভারী ভালো বুড়ো মানুষ ছিলো, কে সন্দেহ করবে যে প্রতিদিন, ঠিক রাত বারোটায়, সে যখন ঘুমে কাদা আমি তখন তাকে লক্ষ্য করতাম।

আটদিনের দিন, আমি অন্যান্য দিনের থেকে বেশী সতর্কতার সংগে দরজা খুল্লাম! ঘড়ির কাঁটা বোধহয় আমার দরজা খোলায় তাদের চেয়ে বেশী

জোরে ঘোরে। ওই রাতের আগের কোনো রাতে আমি আমার ক্ষমতা জানতে পারিনি—

জয়ের অনুভূতি খুব কষ্টের সংগে চাপলাম। ধীরে ধীরে দরজা খুলে যাচ্ছে আমার মাথাটাও ঢুকছে, অথচ ঘুমন্ত মানুষটা জানতেও পারছে না আমার কাজ বা চিন্তা সম্পর্কে! প্রায় হেসেই উঠেছিলাম। হয়তো লোকটা শুনতেও পেয়েছিলো। হঠাৎ-ই সে বিছানার মধ্যে নড়ে উঠলো—যেন ভয় পেয়েছে! তোমরা হয়তো ভাবছো—আমি পিছিয়ে এলাম? কখনোই না—। তার ঘরটা ছিলো আলকাতরার মতো কালো অন্ধকারে ভরা (চোরের ভয়ে তার দরজা-জানলা সারাক্ষণই বন্ধ থাকতো)। তাই খোলা দরজার আন্দাজ পাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব ছিলো। আস্তে, খুবই আস্তে আমি তার ঘরের দরজা খুলে চল্লাম

মাথা দরজার মধ্যে ঢুকে গেছে, লণ্ঠনের পলতেটা বাড়াতে যাবো, হঠাৎ-ই ধরবার চাকতিতে বুড়ো আংগুল পিছলে গেলো,—বুড়ো লোকটা বিছানার ওপর চিৎকার করে উঠে বসলো,– "কে ওখানে?"

চুপ করে রইলাম। কোনো কথা বল্লাম না। পুরো একটি ঘণ্টা আমি একটিও মাংসপেশী নাড়ালাম না, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে বুড়োকেও বিছানায় শুয়ে পড়তে শুনলাম না। সে তখনো বিছানার ওপর বসে একমনে কান খাড়া করে রেখেছে। ঠিক আমি যা করেছি রাতের পর রাত ধরে।

এইমাত্র আমি একটা দীর্ঘশ্বাস শুনলাম—মরণশীল মানুষের ভয়ের দীর্ঘশ্বাস এটা। ব্যথা বা দুঃখের দীর্ঘশ্বাস এটা নয়,—একেবারেই না! এটা হচ্ছে ছোট চাপা দীর্ঘশ্বাস– যেটা অতিরিক্ত ভয় পেলো অন্তরের অন্তস্থল থেকে উঠে আসে। এ ধরণের শব্দ আমি ভালো করেই জানি। অনেকদিন রাতে—ঠিক দুপুর রাতে, যখন বিশ্বচরাচর ঘুমিয়ে থাকে। এ শব্দ আমার বুক থেকেও বেরিয়ে আসে। গভীর থেকে গভীরতর হয় প্রতিধ্বনিতে।

আমি ভালো করেই জানি। বুড়ো লোকটা কী অনুভব করছে। আমি ভালোই বুঝতে পারছি যদিও মনে মনে আমি হাসছি। আমি জানি লোকটা জেগে বসে আছে প্রথম শব্দটা শোনার আর পাশ ফিরে শোবার সংগে সংগে। তখন থেকেই ভয় তাকে গ্রাস করেছে। বুড়ো নিজেই নিজে শোনালো,—এটা নিশ্চয়ই ঝিঁঝিঁ পোকা যে প্রথমবার ডেকে উঠেছে। ঠিক এই ধরনের সান্তবনা দিয়ে সে নিজেকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সবই বৃথা! হা পুরোটাই মিথ্যা! কারণ মৃত্যু তার কালো ছায়া বুড়োকে খতম করার

আগে তার ওপর বিছিয়ে দিয়েছে। অদেখা ছায়ার দুষ্ট প্রভাব তাকে অনুভব করতে বাধ্য করেছে—যদিও সে কিছু দেখছেও না শুনছেও না। আমার মাথা যে তার ঘরের মধ্যে ঢুকে গেছে সেটা দেখা তো দূরের কথা। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর খুব ধৈর্যের সংগে, তাকে শুয়ে পড়তে না শুনে—ঠিক করলাম আলোটা একটু তুলবো, খুব অল্প একেবারেই অল্প যাতে সামান্য মাত্র উজ্জ্বল হয়। তাই করলাম। তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না কী আস্তে আস্তে সেটা করলাম। যতোক্ষণ একটা মরা আলোর রশ্মি,—ঠিক যেন মাকড়শার জালের একটা সুতো, লণ্ঠন থেকে বেরিয়ে এলো এবং সেটা শকুন চোখেই ঠিক ঠিকরে পড়লো।

চোখটা খোলা,—হা করে চোখটা যেন মেলে ধরেছে সবকিছু। যতো দেখলাম সেটা ততোই আমি রেগে উঠতে লাগলাম। আমি চোখটা সব কিছুর সংগে খুঁটিয়ে দেখাম। দেখলাম একটা মরা নীল চোখ যার ওপরটায় রয়েছে নক্কারজনক এক স্বচ্ছ পর্দা। ওটা দেখেই আমার হাড়ের মজ্জা যেন ঠাণ্ডা মেরে গেলো। আমি কিন্তু বুড়োটার মুখের বা দেহের অন্য কোনো অংশ দেখতে পেলাম না, যেহেতু আমি আলোর রশ্মিটা আমার সহজাত অনুভূতিতে ঠিক তার ঘৃণিত চোখের ওপর ফেলেছিলাম।

আমি কী তোমাদের আগেই বলিনি যে তোমরা যেটাকে পাগলামো বলছো সেটা আমার প্রবণতা। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বহিঃ প্রকাশ? এর পরই আমার কানে পৌঁছালো একটা নীচু ভ্যাদভেদে অথচ খুব তাড়াতাড়ি চলার শব্দ। যেটার মিল পাওয়া যাবে কোনো ঘড়িকে তুলোয় মুড়ে তার শব্দ শুনলে। আমিও ঐ শব্দটা খুব ভালো জানি। ওটা হচ্ছে বুড়োটার চলমান হৃদপিণ্ডের ধুকপুকানি। ঐ শব্দ আমার রাগ বাড়িয়ে দিলো যেমন ড্রামের শব্দ সৈনিকের সাহস বাড়িয়ে দেয়।

তবু-ও আমি নিজেকে নিবৃত্ত করে চুপ করে রইলাম। প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করেই ছিলাম। লণ্ঠন-টা একদম নড়ালাম না। খুব কষ্ট করে আলোর রশ্মি-টা আমি তার চোখের ওপর ধরে রাখলাম। ইতিমধ্যে কিন্তু তার হৃদপিণ্ডের ধুকপুকানি বেড়েই চল্লো! এটা ক্ষণে ক্ষণে দ্রুত থেকে দ্রুততর এবং গম গম করতে আরম্ভ করলো। নিশ্চয়ই বুড়ো মানুষটার ভয় চরমে পৌঁছছে। আমি বলেছি তার বুকে ধুকপুকানি ক্রমে ক্রমে বেড়েই চল্লো! আমার কথাটা ভালো করে খেয়াল রাখুন। আমি বলছি আমি ঘাবড়ে গিয়েছি। সত্যি তাই। এই গভীর রাতে, পুরণো বাড়ীটার গভীর নিস্তব্ধতায় এই অদ্ভুৎ শব্দ

আমার ধৈর্যের শেষ সীমায় নিয়ে গেলো। তবুও কয়েকটা মিনিট আমি কিছুই করলাম না। চুপ করে রইলাম। কিন্তু ধুকপুকানি যে বেড়েই চল্লো। মনে করলাম হৃদপিণ্ডটা বুঝি ফেটেই যাবে। এখন আবার একটা নূতুন চিন্তা উদয় হলো। পাড়া-প্রতিবেশীরা শব্দ-টা শুনে ফেলবে! বুড়োর শেষ সময় এসে গেছে! লণ্ঠন টা দূরে ছুঁরে ফেলে আমি ঘরে মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠলাম। কেঁপে উঠলো সে একবার একবারই মাত্র। এক মুহূর্তে আমি তাকে বিছানা থেকে মেঝেতে নামিয়ে ফেল্লাম তারপর বিছানাটা তার ওপর চাপিয়ে দিলাম। কাজটা উৎরে যেতে আমি আনন্দে হেসে উঠলাম। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে তার বুকের ধুক পুকানি বেজেই চল্লো। শব্দটা মনে হলো কোনো ঢাকা জিনিষের ভেতর থেকে আসছিলে। কিন্তু এখন আর শব্দটা বিরক্ত করলো না আমায়। বুড়ো লোকট মারা গেছে। বিছানাটা সরিয়ে মৃতদেহটা পরীক্ষা করলাম। পাথর একটা পাথরের মতোই মৃতদেহটা শক্ত হয়ে গেছে। আমার হাতটা মৃত হৃদপিণ্ডের ওপর অনেকক্ষণ রাখলাম। ধুকপুকানি বন্ধ। একটা পাথরের মতোই দেহটা তার শক্ত। তার চোখটা আমাকে আর বিরক্ত করবে না।

এখন পর্যন্ত যদি তোমরা আমাকে পাগল মনে করে থাকো, তাহলে এবার কী ভাবে মৃতদেহ গুম করলাম গুনলে আর আমাকে পাগল মনে করবে না। রাত্রি শেষ হয়ে আসতে লাগলো, আমি-ও তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে লাগলাম। কিন্তু একটুও শব্দ না করে। প্রথমেই দেহটা খণ্ড খণ্ড করলাম। মাথা, হাত-দুটো আর পা আলাদা আলাদা কাটলাম।

ঘরের মেঝো থেকে তিনটা তক্তা সরিয়ে দিলাম আর মৃতের খণ্ড খণ্ড অংগগুলি তক্তার ফাঁকা গর্তে গুঁজে দিলাম। তারপর তক্তাগুলি আগের জায়গায় এমন চতুরতা আর ধূর্ততায় চাপিয়ে দিলায় যে কোনো মানব চক্ষু এমন কী বুড়োর চোখ-ও কোনো খুঁত বার করতে পারবে না। ধুয়ে ফেলবার পর কিছুই নেই। রক্তের নেই কোথাও ছিটে ফোটা। হা, হা! আমি তার জন্য খুবই চতুর। এক নাদা জলে সব ধুয়ে সাফ্!

সব পরিশ্রম শেষ হতে চারটে বেজে গেলো। কিন্তু তখনো মাঝ রাতের মতো অন্ধকার। ঘড়ির কাঁটায় ঘণ্টা বাজ শেষ হতেই বাইরের সদর দরজায় ঘণ্টি বেজে উঠলো। ভার মুক্ত হৃদয়ে আমি দরজা খুলতে উল্লাস। কারণ এখন আর আমার ভয় করবার আছে টা কী? তিনজন লোক ঘরে ঢুকলো। খুব বিনয়ের সংগে তারা পুলিশের লোক বলে পরিচয় দিলো। গভীর রাতে

কোনো প্রতিবেশী ভয়ার্ত চিৎকার শুনেছিলো। বোধহয় কোথায় গর্হিত কাজ কিছু হয়েছে এমন সন্দেহ হলো তাই। পুলিশেও খবর গেলো। আর সদর দপ্তর থেকে এই ব্যাপারেই তাদের তদন্ত করতে পাঠানো হলো।

মনে মনে হাসলাম। আমার আর ভয় করার কী আছে? ভদ্রলোকদের স্বাগতম জানালাম। চিৎকারের ব্যাপারটা তাদের বললাম—আমিই স্বপ্নের ঘোরে চিৎকার করে উঠেছিলাম। বুড়ো লোকটার কথা বললাম,—উনি তো এখন এদেশে আর নেই। সমস্ত বাড়ীটা পুলিশদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালাম। তাদের ভালো ভাবে অনুসন্ধান করতে মিনতি করলাম। অবশেষে আমি তাদের বুড়োর ঘরে নিয়ে গেলাম। বুড়োর ধন-দৌলত তাদের দেখলাম। সেগুলি কেমন নিশ্চিতভাবে ঠিক ঠিক আছে। আমায় আস্থার উৎসাহে পেয়ে বসলো। ঘরের মধ্যে চেয়ার নিয়ে এলাম। তাদের বসতে অনুরোধ জানালাম। খাটুনির থেকে বিশ্রাম পেতে। বন্য ঝুঁকি নিয়ে আমি নিজে বসলাম মেঝের ঠিক সেই জায়গায় যেখানে বুড়োর দেহের খণ্ড খণ্ড অংগগুলি রয়েছে।

পুলিশ তিনজন সন্তুষ্ট হলো। আমার ব্যবহার তাদের নিশ্চিত করেছে। পরিচিত বিষয় নিয়ে তারা গল্প জুড়ে দিলো একসময়। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম এবং চাইলাম তারা যাতে চলে যায়। মাথা ব্যথা আর কানে ঝমঝম নির শব্দ হতে লাগলো আস্তে আস্তে। কিন্তু তবুও তারা বসে বসে গল্প জমাতে লাগলো। কানের শব্দটা আরো স্পষ্ট হলো—শব্দটা বেজেই চললো আরো উঁচু তালে। আমি জোরে আর নির্ভয়ে তাদের সংগে গল্প জুড়লাম যাতে ঐ শব্দের অনুভূতি থেকে মুক্তি পাই! অবিরাম ভাবে শব্দটা বেজে চললো—যতক্ষণ না সেটা একটা স্পষ্ট আওয়াজের রূপ নিলো। কিছুক্ষণ পরে আমি বুঝতে পারলাম শব্দটা আর আমার কাছে একা নেই।

নিঃসন্দেহে আমি আরো বেশী বিবর্ণ হয়ে গেলাম,—কিন্তু তবু আমি একাই যেন কথাবার্তায় আসর মাত করতে চাইলাম। বেশ জোরের সংগে বাতাস মেরে। কিন্তু তবুও আওয়াজটা বেড়েই চল্লো। আমি কী-ই বা করতে পারি আর। আওয়াজটা হলো নীচু তালের ভেদভেদে অথচ খুব তাড়াতাড়ি চলা শব্দ। একটা ঘড়িকে তুলোয় জড়িয়ে রাখলে তার মধ্যে থেকে যেরকম শব্দ বেরোয়—ঐ শব্দটাও ঠিক তাই। নিঃশ্বাস নেবার জন্য আমি হাঁ করলাম কিন্তু তবুও পুলিশ অফিসারগুলি শব্দটার কিছুই বুঝতে পারলো না। আমি আরও বেশী ঘৃণার সংগে আজেবাজে বকতে আরম্ভ করলাম—কিন্তু ঐ শব্দটা তবুও

বেড়েই চল্লো। লোকগুলি কেন যাচ্ছে না? লম্বা লম্বা পা ফেলে আমি সারা ঘর দাপিয়ে বেড়াতে লাগলাম। ভাবটা দেখাতে লাগলাম যেন তাদের দেখে আমি চটে গেছি।—কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! শব্দটা আগের মতো বেড়েই চল্লো। হায় ভগবান, আমার কী নিস্কৃতি নেই? আমি রেগে উঠে পাগলের মতো বকতে লাগলাম। তারপর দিলাম অভিশাপ। মেঝের যে জায়গায় বসেছিলাম আমি সেখানেই চেয়ারটা ঘুরিয়ে দিলাম কাঠের পাটাতনের ওপর চেয়ার ঘষতে লাগলাম যাতে নীচে থেকে ওঠা শব্দটা আর না শোনা যায়। কিন্তু কোথায় কী—শব্দটা ঠিকই শোনা যেতে লাগলো, বরঞ্চ আগের চেয়ে তার তাল বেড়েই চল্লো। আরো—আরো—আরো জোরে। তখনো পর্যন্ত পুলিশ-গুলি হাসছে, গুলতানি চালাচ্ছে। এটা কী সম্ভব তারা কোনো শব্দই শুনতে পাচ্ছে না? হে সর্বশক্তিমান ভগবান! না, না! তারা শুনেছে নিশ্চয়ই কিছু সন্দেহ করেছে! তারা নিশ্চয়ই জানে! তারা আমার ভয় নিয়ে ঠাট্টা মারছে। তাই।—এটা আগেও যেমন ভেবেছি এখনও তাই ভাবছি। কিন্তু এই যন্ত্রণা অসহ্য। এই জ্বালা যন্ত্রণা থেকে যে কোনো জিনিষ ভালো। ওদের ভণ্ডামির হাসি আমি আর সহ্য করতে পারছি না। স্পষ্ট বুঝলাম আমাকে চেঁচিয়ে উঠতে হবে,—অথবা আমি মরবো। আবার—আবার ঐ শব্দ!—জোরে, জোরে, আরো জোরে।

"শয়তানের দল!" আমি কেঁপে উঠলাম, "ন্যাকামির দরকার নেই, স্বীকার করছি আমিই কাজটা করেছি। মেঝের কাঠ উঠিয়ে ফেলুন, হ্যা, এখানে ঠিক এখানে ওর ঘৃণ্য হৃদপিণ্ডটা রয়েছে!"

নেই তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথায় খেতে ?

—মার্ক টোয়েন "হাকলেবেরী ফিন্" (১৮৫৭)

—"ভেতরে এসো।" ভদ্রমহিলা বল্লেন। আমিও ভেতরে সেঁধিয়ে গেলাম। "চেয়ারে বসো।" চেয়ারে বসতে উনি তাঁর জলজ্বলে ক্ষুদে চোখ দিয়ে আমাকে জরিপ করে চল্লেন। মাপা শেষ করে বল্লেন এক সময়,—তোমার নামটা কী বটে ?"

—"সারা উইলিয়ামস্।"

—"থাকা হয় কোথায় ? কাছে ভিটে ?"

—"না। এখান থেকে সাত মাইল উজানে উইকারভিলে। সাত মাইল হেঁটে এয়েছি। খুবই ক্লান্ত।"

—"ক্ষিধেও পেয়েছে বোধকবি। দেখি তোমার জন্য কী জোগাড় করতে পারি "

—"না, না, আমার মোটেই ক্ষিধে পায়নি। পথে মাইল দু আগে এক খামার বাড়িতে থেমেছিলাম। সেখানেই কিছু জুটেছিল। ক্ষিধে নেই। বুঝতে কী এর জন্যই তো দেরী হয়ে গেলো। মার বড় অসুখ। ঘরে টাকা-পয়সা বলতে কিছু নেই! জিনিসপত্রেরও টানাটানি। তাই তো খুড়ো আবনার মুর-কে সংবাদ দিতে ছুটে এনু। খুড়ো এ-অঞ্চলের শেষ প্রান্তে থাকেন।"

ভদ্রমহিলা বল্লেন, "আমরা এখানে খুব বেশী দিন আসিনি।"

—"আপনি কী তাকে চেনেন ?"

—"না, সকলের সংগে এখনো পরিচয় হয়নি। দু-সপ্তাহও হয়নি আমরা এখানে এসেছি। নগরের শেষ অঞ্চল এখান থেকে বেশ দূর। রাত্রিটা এখানে কাটিয়ে যাও। ভালো কথা, তোমার মাথার ওড়নাটা সরাও দেখি।"

—"মাপ করবেন। কিছু সময় এখানে থাকতে পারি হয়তো। আমাকে যেতেই হবে। অন্ধকারে আমার ডর নেই।"

উত্তরে ভদ্রমহিলা বল্লেন আমাকে নিজে নিজে উনি কিছুতেই যেতে দেবেন না। ওনার স্বামীকে সংগে পাঠাবেন। এক ঘণ্টা কী আধঘণ্টার মধ্যে ওনার

স্বামী এসে পড়তে পারেন। এরপর ভদ্রমহিলা তার স্বামীর কথা পারলেন। তারপর এলো তার নদীর দু-পারের আত্মীয়-স্বজনের কথা, তারা আগে কতো বড়লোক ছিলেন, কী ভুল করেছেন, সাত-সতেরো ··· ···এক সময় কথায় কথায় ভদ্রমহিলা বাবা এবং খুনের কথা পারলেন। মনে করলাম চলুক না ওনার বক্‌বকানি। কীভাবে টম সওয়ার এবং আমি দু হাজার ডলার (আসলে মোট দশ) পেয়েছিলাম। বাবার কথাও বললেন। কী নিষ্ঠুর পরান লোকটার। আমিও কী বদমাশ ছিলাম একসময়। শেষমেশ তিনি আবার আমার খুনের কথা পারলেন।

—"খুনটা করলো কে? আমরা, হুকারভিলের লোকেরা অনেক গল্প-গুজব শুনছি। কিন্তু হাক্ ফিন্-কে সত্যি সত্যি কে খুন করলো সেটা জানতে পারিনি।"

—"ভালো কথা বলেছো। যদি এখানকার লোকেদের হত্যাকারীকে জানবার সুযোগ হতো! কেউ কেউ অবশ্য বলছে বুড়ো ফিন্ নিজেই কাজটা সেরেছে।"

—"অসম্ভব! তা কী করে হয়?"

—"প্রথমে অবশ্য সকলে এটাই ভেবেছিলো। নিজেও জানতো না কীভাবে সে চাঁদা-তোলা মারের মুখোমুখি হয়েছিলো। কিন্তু রাত শেষ হবার আগেই মানুষের বুদ্ধি পাল্টালো। তারা বুঝালো খুনটা করেছে জিমে নামে পালিয়ে যাওয়া এক নিগ্রো।"

"কিন্তু সে—।" চেপে গেলাম। চুপ মেরে থাকাই ভালো। ভদ্রমহিলার রেকর্ড বাজানো চল্লো। তিনি লক্ষ্যও করলেন না, আমি কিছু একটা বলতে চাইছিলাম।

"যে রাতে হাক্ ফিন্ খুন হয় সে রাতেই নিগ্রোটা পালিয়েছিলো। তার গ্রেপ্তারের জন্য পুরস্কার তিনশো ডলার। বুড়ো ফিনের জন্য দুশো। ব্যাপারটা হলো—বুড়ো ফিন্ খুনের পরের দিন সকালে নগরে এসেছিলো। লোকদের সব জানালো। নৌকো করে যখন তল্লাশি চলছিলো তখনো ছিলো। কিন্তু তারপরেই একসময় কেটে উঠলো। রাতের আগেই তাকে পাইকারি ধোলাইয়ের ব্যবস্থা হয়েছিলো। কিন্তু সে তো কেটে পড়েছে। পরের দিন ওরা দেখলো নিগ্রোটাও বেপাত্তা। মানুষ চিন্তা করলো খুনের রাতে দশটার পর থেকে কেলেটা নিখোঁজ। বোঝো ঠেলটা,—সব দোষ গিয়ে বর্তালো কেলেটার ওপর। দোষ নিগ্রোটার ঘাড়ে চাপবার পরের দিন সকালে আবার

বুড়ো ফিনের উদয়। সে আবার নগরপাল থাচারকে কাকুতি মিনতি করতে লাগলো টাকার জন্য। যে টাকা নিয়ে সে গোটা ইনিনিয়স্-টা কেলেটার খোঁজে চষে বেড়াবে। নগরপাল কিছু উপরহস্ত করলেন। আর ফিন্ সেই সন্ধ্যায় মালে টান হয়ে কতকগুলি বদখৎ লোক নিয়ে রোয়াবি করে একসময় খসে পড়লো। মজা হচ্ছে তারপর থেকে ফিন্ আর ফিরে আসেনি ...... এখন মানুষের আবার বুদ্ধি গজালো। বুড়ো ফিন-ই ছেলেকে খতম করেছে আর মানুষকে ধোঁকা দেবার জন্য দোষটা ডাকাতদের ঘাড়ে চাপিয়েছে। কারণ হাক্ ফিনের টাকা আইন মাফিক হাতানোর এটাই হচ্ছে সহজ পথ। কে আর আইনের দীর্ঘ-সূত্রতার জন্য অপেক্ষা করে। কেউ কেউ অবশ্য বলে বুড়ো ফিনের কর্ম্ম এ নয়। তবে বুড়ো খুব সেয়ানা। এক বছরের মধ্যে সে ফিরে না এলে বেঁচে গেলা। তুমি তার বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করতে পারছো না। ততোদিনে মানুষ সবই ভুলে যাবে। এবং সহজেই সে হাক্‌ফিনের টাকা পয়সা বগলদাবা করবে।"

—"হ্যা, আমারও তাই মনে হয়। এ ব্যাপারে আর কিছুই করা যাবে না। আচ্ছা মানুষ কী করে চেপে গেলো যে নিগ্রাটা একাজ করে নি?"

"না, না সকলে না। অনেকেই ভাবছে সে এটা করেছে। ওরা শিগ্গী কেলেটাকে টেনে বার করবে। তারপর হয়তো সত্যি ব্যাপারটা তার পেট উল্টে খোঁজ করবে।"

"ওকে কী এখনও ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে?"

—তুমি দেখছি কিছুই বোঝো না! প্রত্যেক দিনই কী তিনশো ডলার তুলে নেবার অপেক্ষায় পথে পড়ে থাকে! কেউ কেউ ভাবছে কেলেটা এখান থেকে খুব একটা দূরে সরতে পারেনি। আমি নিজেও তাই ভাবি। অবশ্য এখনো আমি মুখ খুলিনি। কিছুদিন আগে আমি কাছের কাঠের বাড়িটার লোকদের সংগে কথা বলছিলাম। ওরা বল্লো ঐ দূরের জ্যাকসন দ্বীপে প্রায় কোনো লোকই যায় না। কেউ কী ওখানে বাস করে না? আমি বল্লাম। ওরা একযোগে বল্লো—না, ওখানে কোনো লোকই থাকে না। আমি ওদের সংগে কথা বাড়ালাম না। ওপারে ধুঁয়ো দেখেছিলাম। ব্যাপারটা ঘটেছিলো দু-তিন দিন আগে। আচ্ছা, ঐ কেলেটা তো ওখানে ঘাপটি মেরে নেই। এখনই ওখানে খুঁজে মরা বাতুলতা মাত্র। তারপরে কিন্তু আর ধোঁয়া দেখিনি। ভাবছি ব্যাটা বোধহয় ওখান থেকে সটকেছে। আমার মরদ আর একজন মিনসেকে নিয়ে ওখানে গিয়ে খোঁজ নেবে।......

খুব ঘাবড়ে গেলাম! চুপ করে আর বসে থাকতে পারলাম না। হাত নিস্‌পিস্‌ করতে লাগলো। তাই টেবিল থেকে সূঁচ নিয়ে সুতো পরাতে লাগলাম। হাত কেঁপে গেলো। যা তা করতে লাগলাম। ভদ্রমহিলা কথা বন্ধ করতেই আমি চোখ তুল্লাম। কিছুটা অবাক হয়ে তিনি তাকিয়ে আছেন। মুখে ছোট্ট করে হাসলেন সূঁচ-সুতো টেবিলে রেখে শোনবার আগ্রহ দেখালাম —তিনশো ডলারের অনেক ক্ষমতা। আঃ, মা যদি টাকা-টা পেতো! তাহলে আপনার স্বামী আজকে ঐ দ্বীপ যাচ্ছেন?

—ওঃ হ্যা। যে লোকটার কথা বলেছিলাম সে আর উনি শহরে গেছেন নৌকো আর একটা বন্দুকের জন্য। মাঝরাতের পর ওরা ওখানে যাবে।

—কাল সকাল পর্যন্ত কী অপেক্ষা করা যায় না?

—হ্যা। কেলে-টা-ও তো সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে? মাঝরাতের পর ব্যাটার ঘুমিয়ে পরার সম্ভবনা। ওরা ও ঐ ফাঁকে বনে ঢুকে পড়ে ওর আগুন জ্বালাবার উৎস টা খুঁজে দেখবে। যদি সে সত্যি ওখানে থাকে।"

"আমার মনে হয় না"। কিছুটা কৌতূহল নিয়ে উনি আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমায় একটুও ভালো লাগলো না। কিছুক্ষণ পরে বল্লেন —সোনা, তোমার নামটা যেন কী বলেছিলে?

"মে-মেরী ইউলিয়ামস্"

যে কোনো কারণেই মনে হলো আমি আগে আমার নাম মেরী বলিনি। চোখ তুলতে সাহস হলো না। মনে হলো বোধহয় নামটা সারা বলেছিলাম।··· উনি বল্লেন, সোনা, মনে হচ্ছে এখানে আসার পর তুমি নামটা সারা বলেছিলে।"

"হ্যা। পুরো নাম-টা হলো সারা মেরী ইউলিয়ামস্। নামের প্রথমটা হলো সারা। কেউ বলে সারা। আবার কেউ মেরী।"

"ওঃ এই ব্যাপার?"

"হু, তাই"। কিছুটা ভালো বোধ করলাম। মানে মানে সরে পড়তে পারলে বাঁচি। তবুও ওপরে চোখ তুলতে সাহস পেলাম না।

ভদ্রমহিলা আবার কথার তুবড়ি ছোটালেন। দিন কাল কেমন খারাপ পড়েছে। দিন গুজরানো কী রকম কষ্টকর। ইঁদুরের কী উৎপাত। এ-বাড়ীটা যেন ওদেরই রাজত্ব। বুড়ীর কথার তোড়ে আমি-ও সহজ হয়ে এলাম। ইঁদুরের ব্যাপারটা কিন্তু সত্যি বলেছেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে দেখছি পর পর কোনো না কোনো ইঁদুর গর্তের ওপর নাক বার করছে। উনি বল্লেন একা থাকলেই উনি হাতের কাছে কোনো না কোনো জিনিষ রাখেন। ওদের দিকে

ছুঁড়ে মারতে হবে তো। ওটা না করলে আর নিষ্কৃতি নেই। দলানো মোচরানো এক তাল সীসে তিনি আমাকে দেখালেন। ঐ দিয়ে মারতে তিনি খুবই ওস্তাদ। কিন্তু কিছু দিন আগে হাত মোচড়ানোর জন্য তিনি ব তে পারছেন ছোঁড়া-টা ঠিক হবে কী না। কিছু সময় লক্ষ্য করে তিনি ছুঁড়ে মারলেন সীসের ডেলা-টা। ডেলা অনেক দূরে গিয়ে পড়লো। সংগে সংগে তিনি উফঃ করে উঠলেন। হাতে বেশ জোরেই লেগেছে। এবার তিনি আমাকে বল্লেন একবার চেষ্টা করতে। ওর স্বামী আসবার আগেই আমি কেটে উঠতে চাইছিলাম। অবশ্য সেটা বুঝতে দিতে চাইলাম না। ডেলাটা নিলাম। যেই একটা ইঁদুর নাক দেখালো—ছুঁড়ে মারলাম। বাটা যদি ওখানে থাকতো দেখতে হতো না। তিনি বল্লেন ছোড়াটা সুন্দর হয়েছে। আর পরের ইঁদুরটা আমি নিশ্চয়ই মারবো। তিনি উঠে গিয়ে সীসের ডেলাটা নিয়ে এলেন। সংগে আনলেন সূঁচ পরাবার কিছু সুতো।···আমি দুটো হাত তুলে ধরলাম। তিনি ঐ হাতের ওপর সুতো ছাড়লেন। আবার তিনি গল্প ঝুলি খুলে বসলেন। তার নিজের কথা আর স্বামী দেবতার সব ব্যাপার-স্যাপার। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ বল্লেন—" ইঁদুরের দিকে চোখ রাখো। বরংচ তুমি ডেলা টা তোমার কোলের ওপর নাও।" বলেই তিনি ওটা ছুঁড়ে দিলেন আমি-ও হাঁটু জোড়া করে লুফে নিলাম। তিনি গল্প বলে চল্লেন। কেবলমাত্র এক মিনিট। সুতো-টা তুলে নিয়ে সোজা চোখের দিকে তাকিয়ে নরম গলায় ঠাণ্ডা চোখে জিজ্ঞেস করলেন।—"এবার বলো তো বাছা—তোমার ঠিক নাম-টা কী?

"—কেন কেন—"

—"ঠিক তোমার নামটা বলে ফেলো তো? বিল, টম,—না অন্য কিছু?" আমি পাতার মতো কাঁপতে লাগলাম। কী করবো ভেবে পেলাম না। কিন্তু মুখে বাকফাটটাই চালালাম, "দয়া করে একটা অসহায় মেয়েকে নিয়ে এমন রংগ-তামাস করবেন না। যদি আপনার অসুবিধা হয় তো—"

না, না, উঠতে হবে না। যেখানে আছো ওখানেই ঠাণ্ডা মেরে থাকো। তোমাকে দুঃখ দিতেও চাই না তোমার দুর্দশায় রং-ও চড়াবো না। আমাকে বিশ্বাস করে তোমার ব্যাপারটা শুধু খুলে বলো। কাউকে তো বলবই না উপরন্তু তোমাকে সাহায্য করবো। যদি চাও তো আমার বুড়ো-ও তোমাকে সাহায্য করবে। যতোটা বুঝি তুমি হচ্ছো একটা বাড়ী পালানো শিক্ষা-নবিশ। এতে লজ্জার কিছু নেই। তোমার ওপর জুলুম করা হয়েছে আর

কেটে পরার তাল করেছো। ভগবান রক্ষে করুন, আমি কিছু বলতে চাই না। সব ব্যাপারটা খুলে বলো—হ্যা, হ্যা এই তো ভালো ছেলের মতো ব্যাভার।"

আমিও বুঝলাম তার ওপর ওপর-চালাকিতে কোনো লাভ নেই। সব কিছুই বলবো। কিন্তু তাঁকে তার প্রতিজ্ঞা রাখতে হবে। বল্লাম আমার বাপ মা দুজনেই মারা গেছে। নদী থেকে ত্রিশ মাইল দূরে সাত ঘাটের মড়া ধেড়ে চাষীর সংগে আইন আমাকে জুড়ে দিয়েছে। লোকটার অন্যায় জুলুম আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। লোকটা কয়েকদিনের কাজে স্থানান্তর হতে আমি ঐ বদমাশটার মেয়ের কতোগুলি পুরনো পোষাক চুরি করলাম। ওখান থেকে কেটে উঠে তিন দিন ধরে ত্রিশ মাইল পথ হেঁটে আসছি। রাতে পথ চলি, দিনে সুবিধা মতো লুকানো জায়গায় ঘুমাই। এক ঝুরি রুটি আর মাংস যেটা নিয়ে এসেছিলাম এই তিনদিন খেয়েছি। খুড়ো আবনার মুর নিশ্চয়ই আমার যত্ন নেবে। সত্যি কথা বলতে গোসেন্ জায়গাটা এর জন্যই বেছে নিয়েছি।

"কী বল্লে বাছা গোসেন্? এটা গোসেন নয়। এ জায়গাটার নাম সেণ্ট্ পিটার্সবার্গ। নদীর উজান বেয়ে দশ মাইল গেলে গোসেন। এটা যে গোসেন্ এই সংবাদটা তোমায় দিলো কে?"

"কেন, সকালে নিত্যিকার মতো আমি যখন ঘুমাবার চেষ্টায় বনে শুয়েছিলাম তখন একটা লোককে জিজ্ঞেস করতে সেই আমাকে বল্লো। সেই-ই আমাকে বল্লে—যেখানে রাস্তা দু-ভাগে চিড়ে গেছে, সেখানে ডান-হাতি রাস্তাটা পাঁচ মাইলের পর আমাকে গোসেনে নিয়ে যাবে।"

"মাতাল, লোকটা একদম মাতাল। সে তোমাকে একেবারে উল্টো কথাটা বলেছে।"

"মাতাল বলে আমার-ও কেমন সন্দেহ হচ্ছিলো। কিন্তু এখন আর কেঁদে কী হবে? আমাকে যেতেই হবে। দিনমানের আগেই জায়গাতে পৌঁছে যাবো।

"দাঁড়াও, এক মিনিট। তোমাকে খাবার জন্য কিছু বেঁধে দেবে। তোমার সেটা দরকার হতে পারে।"

খাবার প্যাকেট-টা দিয়ে তিনি বল্লেন,—বলো দেখি বাছা একটা শাওয়া গরুর ওঠার সময় তার দেহের কোন্ জায়গাটা আগে ওঠে? ঝটপট উত্তর দাও, ভাববার সময় পাবে না।

"পেছনের দিকটা আগে ওঠে"

ঘোড়ার বেলায় ?

"সামনের দিকটা।"

"গাছের কোন জায়গা সাধারণতঃ শেওলা জমে।"

উত্তরের দিকে "

"পাহাড়ের ধারে মনে করো পনেরোটা গরু চড়ে বেড়াচ্ছে। কতোগুলি গরু একই দিকে মুখ করে খাবে।"

"পনেরো-টাই এক দিকে মুখ করে খাবে।"

"মালুম হচ্ছে তুমি গ্রামেই বাস করো। ভাবলাম আবার বুঝি আমাকে ঠকাবার চেষ্টা করছো। এবার মানিক বলো তো তোমার সত্যিকারের নাম-টা কী ?

"হ্যা, মনে রেখো নামটা হলো তোমার জর্জই। যাবার আগের মুহূর্তেই আবার বলে বসো না যে তোমার নাম-টা কী বলে গিয়ে চলো আলেকজাণ্ডার।... ঐ পুরনো স্মৃতির পোষাক পরে মেয়েছেলেদের সামনে যেও না। মেয়েদের অভিনয়ে তুমি একদম অচল। পুরুষগুলো বোকা বনতে পারে। ভগবান রক্ষে করুক, সূঁচে সুতো পরাবার সময় সুতোটা নিশ্চল ধরে রেখো না। উল্টো টাই করবে। সূঁচ-টা নিশ্চল রাখবে আর সুতো-টা সূঁচের ফুটোর মধ্যে ঢোকাবে। মেয়েরা সাধারণতঃ এভাবেই সুতো পরায়। ছেলেরা আবার ঠিক এর উল্টো-টা করে। ইঁদুরকে যখন কিছু ছুঁড়ে মারবে—পায়ের পাতার ওপর হেঁটে গিয়ে ঢেলাটা অনেক দূরে ফেলবে। অস্ত্র মারার সময় বিতিকিচ্ছিরি-ভাব দেখাবে। আর ঢেলাটা গিয়ে পড়বে ছ-সাত ফুট দূরে। হাতটা শক্ত রাখবে। মনে হবে হাত আর কাঁধের সন্ধিস্থলে একটা পীন রয়েছে। কীলক টাই হাত-টা নাড়ালো। মেয়েদের এটা অভ্যেশ।... মনে রেখো মেয়েরা যখন কোচরে কিছু ধরতে যায় তখন কোচরে নেবার জন্য হাঁটু দু-টো ফাঁক করে দেয়। ছেলেরা আবার হাঁটু-দুটো জড়ো করে জিনিষটা ধরার চেষ্টা করে। যেটা তুমি সীসের ডেলাটা ধরার সময় করেছিলে। সূঁচে সুতো পরাবার সময়ই তুমি ধরা পড়ে গিয়েছিলে যে তুমি ছেলে। আর সেটা নিশ্চিত হলাম যখন অন্য ব্যাপারগুলি ধরা পড়লো। এখন তোমার খুড়োর কাছে কেটে পড়ো। হ্যা, তুমি সারা মেরী ইউলিয়ামস্ জর্জ আলেকজাণ্ডার পিটার্স। যদি বিপদে পরো, শ্রীমতী জুডিথ লোফটাস্-কে খবর পাঠিও। বুঝতে পেরেছো নিশ্চয়ই আমিই জুডিথ লোফটাস্। আমার যতোদূর সাহায্য করবো। নদীর পথ ধরো। পরের বার

পথে বেরুলে পায়ে মোজা আর জুতো দিয়ো। নদীর পথ টা পাথুরে। আহা, যখন গোসেনে পৌছাবে তোমার সে পায়ের যা অবস্থা হবে!…

সে

ন্যাথানিয়েল হথর্ণ

আমাদের বাড়ী থেকে একশো মাইলেরও বেশী দূরের এক গ্রামে আমি আমার পনেরো বছর বয়সে কিছুদিন ছিলাম। পৌঁছানোর পরের দিন সকালবেলা। সেটা ছিলো সেপ্টেম্বরের এক গরমের সকাল। আমি ঢুকে পড়লাম একটা বনের মধ্যে। ওক আর ওয়ালনাট গাছের জটলা মাথার ওপর একটা ঘন আবরণের সৃষ্টি করেছিলো। নীচে অসমতল পাথুরে জমি, এখানে সেখানে ঝোপ ঝাড় এবং চারাগাছ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মাঝে মাঝে কেবল গবাদির চলার পথ। ভাগ্যক্রমে আমি যে পথ দিয়ে চলছিলাম সেটা একটা কাঁচের মতো স্বচ্ছ ঝরণার কাছে নিয়ে গেলো। ঝরণাটার চারপাশের ঘাসগুলি মে মাসের সকালের ঘাসের মতো সতেজ-সবুজ। এবং পারের একটা ওক গাছের ডাল ঝরণাটার ওপর পড়ে জলাশয়টাকে আরো ছায়াচ্ছন্ন করে তোলে। কেবলমাত্র একটা সূর্যরশ্মি ডালপালা ভেদ করে ঢুকে জলের ওপর সোনালী মাছের মতো খেলা করে বেড়াচ্ছিলো।

ছোটোবেলা থেকেই ঝরণার ধারে চুপ করে বসে থাকতে ভালোবাসি। জল একটা গোলাকার জায়গায় এসে পড়ছে। ছোটো কিন্তু গভীর পারটা পাথর দিয় ঢাকা। কোনো কোনো পাথর বা পাতলা একটা শেওলার আস্তর দেওয়া, কোনোগুলি বা এবড়ো-খেবড়ো। রং-ও তাদের বিভিন্ন—লালচে, সাদা, বাদামী। ঝরণার তলায় মোটা বালির স্তর। ঐ বালির স্তর একটি মাত্র সূর্যরশ্মিতে ঝিক্‌মিক্ করছে। মনে হচ্ছে ঐ আলোয় সমস্ত ঝরণাটা আলোকিত। একটা জায়গায় স্রোত তলার বালির স্তরকে ভীষণভাবে আলোড়িত করেছে, কিন্তু তাতে ঝরণায় নেই কোনো আলোড়ন বা ওপরের স্তরের ঝিক্‌মিক্ ভাবটাও কমে যায়নি। মনে হচ্ছে,—ঐ আলোড়ন দেখে মনে হচ্ছে জলের ওপর যেন জলপরী এক্ষুণি উঠে আসবে—যাকে জড়িয়ে থাকবে একটা পাতলা শেওলার পোষাক, কোমরে জড়ানো রামধনু। আর ঐ জলপরীর মুখটা—ঠাণ্ডা, পবিত্র

আর নৈব্যক্তিক। আর দর্শকটা কী ভাবে কাঁপবে ভয় মেশানো আনন্দে যখন জলপরী তার হাতির দাঁতের প দিয়ে জলে আলোড়ন জাগাবে আর মাঝে মাঝে জল আকাশে দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সাদা রংয়ের ফুল ঝুরি ছড়াবে। যেখানেই তার হাতের স্পর্শ পড়বে—কী ফুল কী ঘাসে, মনে হবে ঐ ফুল আর ঘাস যেন শিশির ভেজা। আর তখনই সে চতুর গৃহিনীর মতো কাজ শুরু করে দেবে। ঝরণার ওপর থেকে ঝরা-পাতা, হাল্কা কাঠের টুকরো ওপরের ওক গাছের শুকনো ফল, গবাদি পশুর জল খাবার সময় তাদের মুখ থেকে পড়া শস্য-কণা সব সে পরিষ্কার করে দেবে। একাজ চলবে যতোক্ষণ না নীচের বালি-গুলি মনে হলো স্তূপাকার হীরে।......

জলের কিনারে যেখানে শিশির দেবতার থাকার কথা আমি সেখানে ঝুঁকে জলের ওপর তাকালাম—আর ঠিক তখন জলের আয়নায় আমার চোখের সংগে আরেক-জোড়া চোখের মিলন ঘটলো। আবার তাকালাম কী আশ্চর্য! আরেকটি মুখ ঝরণার গভীরে আমার ছায়ার চেয়ে পরিষ্কার অথচ কিন্তু চিন্তার মতোই দূরাগত, ভেসে উঠলো। সে ছিলো সুন্দরী যুবতী মেয়ে। মাথায় তার ফিকে সোনালী বিনুনি। চোখে তার দুষ্টুমির হাসি, গালে টোপ,...। গালের ফিকে গোলাপী আভার মধ্যে দিয়ে বাদামী পাতা, শুকনো ডাল, ওক ফল, ঝক্‌মকে বালি আমি সবকিছু দেখতে পাচ্ছিলাম। আগের একমেবম্ সূর্যরশ্মিটা তার সোনালী চুলের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলো—পরে সেটা হলো মৃদু উজ্জ্বল। সেই মৃদু উজ্জ্বলতা তার অনিন্দ্য মুখের সৌন্দর্য আরো অনেক বাড়িয়ে দিলো এক সময়।

কী তাড়াতাড়ি ঝরণাটা আমার আয়ত্তে এলো আর গেলো সেটা বর্ণনা করা অসম্ভব। আমি নিশ্বাস ছাড়লাম—জলের ওপর মুখচ্ছবি ভাসছে। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করলাম—হায় রাম! মুখটা আর নেই। সে কী হারিয়ে গেলো না, মুক্ত প্রকৃতির মাঝে মিলিয়ে গেলো? আমার সন্দেহ হচ্ছে মুখটা আদৌ সেখানে ছিলো কী না।

শোনন পাঠক, কী সুন্দর স্বপ্নালু সময়টা কাটালাম যেখানে সে এলো আর গেলো। অনেকক্ষণ আমি একই জায়গায় চুপ করে বসে রইলাম—যদি সে আসে। ভয় হতে লাগলো আমার সামান্যতম নড়াচড়া বা নিঃশ্বাসের শব্দে সে বুঝি পালিয়ে যাবে।......

আমিই কী তাকে সৃষ্টি করেছি। সে কী আমার কল্পনার মানস কন্যা? একটা শিশুর কল্পনায় যে ভাবের মিছিল আসে—তারই পরিপূর্ণ একটি রূপ?

তবে কী সে জলপরী না কী শুধুমাত্র পরী? না কী আমার ঘাড়ের ও'র ঝুঁকে দেখছে এমন কোনো বনদেবী? আবার এটাও হতে পারে—সে হচ্ছে ভুলে যাওয়া কোনো কুমারীর ভূত যে নাকী ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় ঝরণায় ডুবে মরেছিলো? সুন্দর একটা কল্পনাও খাড়া করা যায়—সে হচ্ছে কোনো সুন্দরী মেয়ে—উচ্ছ্বলতায় যার হৃদয় টগবগ করছে। কী সুন্দর তার ঠোঁট-জোড়া। সেই—মেয়েই চুপি চুপি আমার পেছনে এসে ঝরণায় তার ছায়া বিছিয়ে দিয়েছে?

শুধু বসেই রইলাম কিন্তু সে আর এলো না। ঘরে ফিরলাম পিছু-টান নিয়ে। বিকেলবেলায়ই ফিরে এলাম—সেই ভুতুরে ঝরণার পাশটায়। ঝরণার জলের বুদ্‌বুদ্‌, বালির ঝিকমিক, একটি মাত্র সূর্যরশ্মির ঝলমলানি সব ঠিক আছে। কিন্তু সে এলো না। দেখলাম নিঃস্তব্ধ-শান্তির আবেশে মুনি ঋষির মতো একটা ব্যাং বসে রয়েছে। আমাকে দেখা মাত্রই সে তার ক্ষুদে নাক নিয়ে উধাও হলো—কেবলমাত্র একটা পাথরের আড়ালে রইলো তার চরণজোড়া। শয়তানের চরের মতোই তার চোখ-জোড়া। ঝরণার রহস্যজনক সৌন্দর্যের জাদুকর বলে তাকে নির্দেশ করতে পারতাম।

দুঃখ এবং ভারাক্রান্ত মনে আমি আমার গ্রামে ফিরে আসছিলাম। আমার সামনের গির্জার পাশেই একটা পাহাড় খাড়া। অন্যান্য গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কতোগুলি গাছ ঐ পাহাড়ের ওপর পশ্চিমের আলো নিয়ে পূবের দিকে তার ছায়া ছড়িয়ে দিয়েছে—জ্বালাময়ী সূর্যের তাপ থেকে ঐ বনাঞ্চল যেন দিন আর বিকালের মিলনকেন্দ্র। ছবিটার প্রশংসার করতে না করতেই ওক গাছের জটলা থেকে একজন যুবতী বেরিয়ে এলেন। আমার হৃদয় জানে ও-কে। ও-ই সে? কিন্তু এতো দূরে—মনে হচ্ছে বাতাসের ইথারের মধ্যে সে মিশে আছে। এই পৃথিবীর মাটি থেকে যেন অনেক দূরে সে, অপার্থিব সৌন্দর্যের মধ্যে সে মিশেছিলো ঠিক যেখানে সে দাঁড়িয়ে ছিলো—আমি যেন দুঃখের কড়াই থেকে আগুনের মধ্যে পড়লাম। আমি কী করে তাকে পাবো?

আমি তাকিয়েই দিলাম—হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি পাতার ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়লো। মুহূর্তে বাতাস আলোয় ঝলমালিয়ে উঠলো, বৃষ্টির ফোঁটা মাটিতে পড়ার মুহূর্তে কিছু আলো জড়িয়ে নিলো। মনে হলো বৃষ্টির পশলাটা যেন একটার কুয়াশার সৃষ্টি করেছে।

নায়গ্রা জলপ্রপাতের রামধনুর মতো একটা উজ্জ্বল রামধনু আকাশে কে যেন এঁকে দিলো। রামধনুর দক্ষিণের অংশ গাছপালার সংগে সুন্দরী মেয়েটাকেও

ঢেকে দিলো। মনে হলো সুন্দরীর উপযুক্ত পোষাক হলো প্রকৃতির সৌন্দর্য। রামধনু উধাও হবার সংগে সংগে সেও অদৃশ্য হলো। সে ছিলো প্রকৃতিরই অংশ। সে-কী প্রকৃতির সুন্দরতম ঘটনায় একেবারেই মিলিয়ে গেলো……?

এভাবেই সে আমাকে ছেড়ে গেলো। আমি তাকে সারাক্ষণই খুঁজে বেড়ালাম,—ঝরণার ধারে, বনে পাহাড়ে, গ্রামের এখানে-সেখানে, শিশিরাচ্ছন্ন সকালে, রৌদ্রদগ্ধ মধ্যাহ্নে, এবং বিকেলের সেই যাদুকরী মুহূর্তে যখন আমি তাকে হারিয়ে ছিলাম। সপ্তাহ গেলো, মাস গেলো কিন্তু সে এলো না। এই রহস্য আমি কারো কাছে ভাংগলাম না। কিন্তু ঘুরে বেড়ালাম এখানে-সেখানে। নির্জনে বসে থাকতাম। আমি যেন স্বর্গের ঠিকানা পেয়েছি—মাটির পৃথিবীর আর কিছুই আমাকে আকর্ষণ করে না। আমি নিজের মধ্যেই একটা জগৎ সৃষ্টি করলাম—ঠিক তাকে মানে সুন্দরী মেয়েটাকে ঘিরে যেখানে আমার স্বপ্নগুলির জন্ম আর মৃত্যু ঘটতে লাগলো। আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি রোমান্সের সৃষ্টিকর্তা এবং নায়ক হয়ে গেলাম। নিজের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি করলাম, ঘটনার সৃষ্টি করলাম, এবং সেখানে আমারও বিরুদ্ধ-বাদীদের প্রতিক্রিয়া কী হবে প্রয়োগ করলাম……।

জানুয়ারীর মাঝামাঝি আমাকে শহরের বাড়ীতে ডেকে-পাঠানো হলো। বাড়ী-ফেরার আগের দিন সেই সুন্দরীর পবিত্র বিচরণ-ভূমি শেষ দেখা দেখতে গেলাম। দেখলাম ঝরণার জল জমে বরফ আর সেই রামধনু-ওলা পাহাড়ের ওপর শীতের রোদ্দুর।……যাত্রার আয়োজন করতেই সমস্ত দিন ফুরিয়ে গেলো। যাত্রা শুরু হবে পরের দিন ভোর চারটেয়। রাতের খাওয়ার এক ঘন্টার পর আমি বসবার ঘরে নামলাম। সেখানে গির্জার পাদরী-পরিবার আমার জন্য অপেক্ষা করছিলো। আমি ঐ পাদরী-পরিবারের একজনের হয়েই বাস করতাম। ঘরের দরজায় ঢোকার মুহূর্তে হঠাৎ একটা দমকা-বাতাস বাতি দিলো নিবিয়ে।

পাদরীর অপ্রতিরোধ্য নিয়মানুসারে, সত্যি নিয়মটা চমৎকার—তারা সকলে বসবার ঘরে বসেছিলো। ঘরে কোনো আলো নেই—শুধু ঘর গরম করবার চুল্লী—যার আভা আলোর একমাত্র উৎস। বুড়ো পাদরীর সরকার-প্রাপ্ত আয় যৎসামান্য। তাই সবরকম অর্থ নৈতিক চাপে নিজেকে বেঁধে রেখে ছিলেন……। সেদিন বিকেলে সবেমাত্র নতুন কাঠ-চুল্লীতে চাপানো হয়েছিলো—আর ঐ কাঠ ছিলো তিনটি লাল ওক-গাছের ডাল। কাঠে ছিলো জল। আরো ছিলো কিছু শুকনো পাইন গাছের ডাল। সেগুলি তখনো আগুনে ধরে ওঠেনি।

ঘরে আর কোনো আলো নেই……। কিন্তু আমি জানতাম পাদরী-সাহেবের আর্ম-চেয়ার কোথায়। তার স্ত্রীই-বা কোথায় বসেন তার বুনবার জিনিষপত্র নিয়ে। আমি এও জানতাম কোথায় বসেন তার দুই মেয়ে। মেয়ে দুটোর একজন শক্ত-সামর্থ গেঁয়ো মেয়ে। অপরজন যক্ষ্মা-রুগী। অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে আমি পাদরী-সাহেবের শিক্ষিত কলেজে-পড়া ছেলের পাশে বসে পড়লাম। ছেলেটি ছুটিতে গ্রামের স্কুলে পড়াতে এসেছে। লক্ষ্য করলাম আজ কলেজের ছেলে আর আমার মধ্যের জায়গাটা কম।

অন্ধকারে চুপ মেরে যাওয়াই মানুষের স্বভাব। আমার ঘরে ঢোকার পরও বেশ কিছু সময় কোনো কথাবার্তা হলো না। কোনো কিছুতেই ঘরের শান্তির বিঘ্ন হলো না। কেবলমাত্র পাদরী গিন্নীর বুননের কাঁটার শব্দ। মাঝে-মধ্যে আগুনের একটু আভা দেখা যেতে লাগলো—তারই কিছুটা বুড়ো পাদরীর চশমা-জোড়ায় লুকোচুরি খেলছিলো। কেউ কারোর মুখ দেখতে পাচ্ছি না। আমরা কী সকলেই ভূত নই? সবটাই স্বপ্ন। অলীক কল্পনা,—মনে হয় না কী এই অন্ধকারের লোকগুলি যারা এখন পরস্পরকে ভালোবাসে মরার পরও ঠিক এইভাবে অন্য কোনো জগতে সভা বসাবে? সকলেই সকলের উপস্থিতি বুঝতে পারছি, চোখে দেখে নয় কিন্তু, এমনকী শব্দ, স্পর্শ কিছুই নেই। কেবলমাত্র আমাদের অন্তস্থলের সজাগভাব আমাদের পরস্পরের উপস্থিতি জনিয়ে দিচ্ছে। মৃত আত্মাদের মধ্যেও কী ঠিক এই জিনিষটাই ঘটে না?

ঘরের নীরবতা ভেংগে গেলো। ক্ষয়রোগী মেয়েটি একসময় বুড়োর কাউকে রাসেল নাম ধরে কোনো মন্তব্য করলো। তার শুকনো আর কাঁপা-কণ্ঠের মন্তব্য শুধুমাত্র একটি কথার জবাবে ফিরে এলো। কিন্তু কথাটা শুনেই আমি চমকে উঠলাম। এবং শব্দের উৎপত্তিস্থলে নীচু হয়ে লক্ষ্য করলাম। আমি কী ঐ মৃদু আর সুন্দর কণ্ঠস্বর আগে শুনেছি? যদি না শুনে থাকি তাহলে ঐ শব্দ শোনার সংগে সংগে স্মৃতির পাতাগুলি কেন উল্টে যাচ্ছে……? আমার হৃদয় কী কাউকে চিনতে পেরেছে? হৃদপিণ্ড এতো লাফাচ্ছে কেন? আমি তার ধীর-গতিতে চলা নিঃশ্বাস ধরবার চেষ্টা করলাম—এবং মন-প্রাণ ঢেলে অন্ধকারের মধ্যেও তার একটা অবয়ব গড়বার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুই সম্ভব হলো না।

হঠাৎ-ই শুকনো পাইন কাঠে আগুন উস্কে উঠলো লাল আভায় এবং অন্ধকারের মধ্যেই সে উদয় হলো। সেই ঝরণার সুন্দরী! রামধনুর সংগে যে উধাও হয়েছিলো আবার চুল্লীর আগুনের সংগে সে আবার অদৃশ্য হবে।

তবুও আমার স্মৃতির থেকে তার গাল আরো বেশী নরম আর সুন্দর। সে আমাকে চেনে। সেই ঝরণায় দেখা চোখর দুষ্টুমির হাসি আর গালের টোল এখন আমার চোখের সম্মুখে। মুহূর্তের জন্য আমাদের দুই দৃষ্টি মিশে একাকার হলো—পরের মুহূর্তেই ভিজে কাঠ জ্বলন্ত কাঠের ওপর পড়ে নিবিয়ে দিলো একমাত্র আলোর উৎস, এবং পরের মুহূর্তে অন্ধকার ঝাপিয়ে পড়ো আলোক-কন্যার ওপর! আবার হারিয়ে গেলো সে!

সুন্দরী পাঠিকা! আর আমার কিছু বলার নেই। এবার রহস্যোদ্ঘাটন হোক। ব্যাপারটা হলো—সে পাদরী-সাহেবেরই মেয়ে! আমি যেদিন এসে পৌঁছাই সেদিন সে তার স্কুলের বোডিংএ যায়। আবার ফিরে আসে ঠিক আমি সেদিন বাড়ী যাবো। ভালো হয় না কি যদি আমি তাকে মনেকরি দেব-পরী যা আমরা যুবক-প্রেমিকরা আকছারই করি। ওখানেই রহস্যের চাবিকাঠি। কিন্তু একটু পরিবর্তন চাই—অপ্সরা পাঠিকা, আপনারা সকলেই হচ্ছেন এক-একজন পরী!

ভীষণ তোমর

আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে

লড়িয়ে ষাঁড়ের তুলনা যদি গৃহপালিত ষাঁড়ের সংগে করা যায় তবে সেটা দাঁড়াবে কুকুরের সংগে নেকড়ে বাঘের তুলনায়? গৃহপালিত ষাঁড় কখনো-সখনো হয়তো বদমেজাজী আর মারাত্মক হয়, ঠিক যেমনটি হয় পোষা কুকুর কালেভদ্রে নীচ আর বিপজ্জনক। গৃহপালিত ষাঁড়ের গতি, মাংস-পেশীর কর্মক্ষমতা, শক্তি আর গঠণ কখনোই লড়িয়ে ষাঁড়ের মতো হবে না, যেমনটা হয়না কুকুরের শক্তি, ধূর্ততা আর চোয়ালের প্রসারতা অবিকল নেকড়েটার মতো। লড়িয়ে ষাঁড় সবসময় বুনো জাতের তারা সরাসরি বুনো-জাতের প্রজাতি থেকে আসবে। সমগ্র উপদ্বীপে এটাই নিয়ম। হাজার হাজার একর খোলা জমির স্বাধীন গোচারণ ভূমিতে পালন করা হয় এদের। যে ষাঁড় যে জায়গার মধ্যে লড়বে কালে-ভদ্রে সে মানুষের সংস্পর্শে আসে।

লড়াকু ষাঁড়ের চামড়ার বিশেষত্ব হলো মোটা আর খুব শক্ত। চামড়ার চাকন চিকন বড়ই বাড়-বাড়ন্ত। ছোটো মাথা কিন্তু চওড়া কপাল। শক্তি

আর আকার কেমন শিং-জোড়ার? শিং-জোড়া সামনে এগোনো। গলা ছোটো আর মোটা। কুঁজটা বিরাট। আর রেগে গেলে ঠেলে সিধা ওপরে ওঠে। চওড়া কাঁধ। খুব ছোটো খুর, লম্বা আর সরু লেজ। লড়াকু ষাঁড়ের গাভীগুলি ওদের মতো শক্ত-সামর্থ নয় বটে তবে মাথা তাদেরও ছোটো। ছোট আর পাতলা শিং। গলা, চোয়ালের নীচের গল-কম্বল উল্লেখযোগ্য ভাবে বড় নয়। তবে পালান নেই বল্লেই চলে। আমি এ-সমস্ত গাইদের পামপ্লানা লড়াইয়ের ঘোটে পে প্রায়ই লড়তে দেখেছি। আর শৌখিন লড়াকুদের গুঁতোতে। আগন্তুক বিদেশীরা অবধারিত ভুল করে বসে এরাই বোধহয় এঁড়ে বাছুর। কারণ তাদের দৃশ্যত থাকে না কোনো গাভীত্ব না কোনো নারীত্ব। এইসব লড়াকু ষাঁড়দের গাভীগুলি দেখলে তুমি স্পষ্ট বুঝতে পারবে বুনো আর গৃহপালিত পশুর মধ্যকার পার্থক্যটা কী।

ষাঁড়ের লড়াইয়ে একটা মতবাদ প্রায় সবসময় শোনা যায় লড়াকু গাই লড়িয়ে ষাঁড়ের চেয়ে মারাত্মক যেহেতু ষাঁড় আক্রমনের মুহূর্তে চোখ বন্ধ করে কিন্তু গাই সেটা করে না। আমি জানিনা এই ব্যাপারটা প্রথমে কে প্রচারে নেমেছিলো, কিন্তু বিন্দুমাত্র সততা নেই এতে। গাভীদের লড়াইয়ে আনলে, তারা নিঃসন্দেহে মানুষকে আক্রমণ করে বসে কোনো চিহ্নকে নয়। সোজাসুজি পেড়ে না ফেলে বাঁক খেয়ে তাকে তাড়া মারে। আবার তাদের যদি পঞ্চাশ জন লোকের মধ্যে আক্রমণের জন্য ছেড়ে দেওয়া যায় তবে তাড়া বিক্ষিপ্ত আক্রমণ না চালিয়ে একজন বাচ্চা বা বড় লোককে ঠিক করে নিয়ে তাড়া মারে। এটা কিন্তু নারীজাতির কোনো উন্নততর বুদ্ধিমত্তার জন্য নয়, তাদের যদি ষাঁড়ের লড়াইয়ের জন্য তৈরী করা হবে বলে ঠিক করা হয়, তবে ছোটো বেলা থেকেই কোনো চিহ্নের ওপর আঘাত করতে শেখানো হয়।...যদি চিহ্নের ওপর ষাঁড়কে আঘাত করতে না শেখানো যায়, তবে সরাসরি আক্রমণ চালাবে। মানুষ নিজেই তার বিপদ তৈরী করতে পারে খুব কাছাকাছি আক্রমণের সামনে থেকে এবং পরমুহূর্তে তা এড়িয়ে গিয়ে...যদি ষাঁড়টার আগের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা থেকে থাকে, তাহলে সব সময় মানুষটাকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করবে। আঘাত হানবে কাপড়ে মানুষটাকে খোঁজে নিজেই হবে বিপদের সৃষ্টিকর্তা। মানুষটা আত্মরক্ষায় সর্বদা পালিয়ে বেড়াবে। হঠাৎই পাশ কাটিয়ে যাওয়া বা লড়াইয়ের তুংগে ওঠা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

ষাঁড়ের লড়াইটার এমনই ব্যবস্থা যে লড়াকু ষাঁড় তার জীবনে প্রথম লড়াইয়ের দিন ছাড়া আগে কখনো চলমান মানুষ দেখেনি বল্লেই চলে। মানুষের

চলাফেরার প্রতিটি চাল সে অবিশ্বাস করে আর মরবার ঠিক আগের মুহূর্তে লড়াইয়ের চরমে ওঠে সে। লড়াইয়ের ব্যাপারটা সে এমন সুন্দর আয়ত্তে আনে যে—তাকে আইনানুগ হত্যা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় যদি যুদ্ধ না গদাই-লস্করী চালে চলে বা খারাপ ভাবে লড়া হয়, অথবা অতিরিক্ত দশ মিনিট যুদ্ধটা চালানো যায়। এরই জন্য ভবিষ্যতের লড়াকুরা বকনা বাছুরের সংগে লড়াইটা মকশো করে নেয়। আর ঐসব বাছুর এতো সুন্দর সব কিছু শিখে নেয় কয়েকটা লড়াইয়ের পর মনে হবে শিক্ষা দিলে ওরা হয়তো সংস্কৃত বা পালি ভাষাটাও শিখতে পারবে। এরপরই তাদের শৌখিন লড়াকুদের মাঝে ছেড়ে দেওয়া হয়। কখনো কখনো বা কিছুমাত্র শিংয়ের ধার না কমিয়ে। অথবা শিংয়ের ছুঁচালো মুখটা চামড়ার বল দিয়ে মুড়ে। একবার ছেড়ে দিলেই হরিণের চঞ্চলতার সংগে আক্রমণ করে বসে তারা শৌখীন লড়িয়েদের বা আগত দিনের লড়াকুদের। ধাক্কা মারা, গুঁতো দেওয়া, তেড়ে যাওয়া, ভয়ের মাধ্যমে উৎসাহ দেওয়া সব কিছুই তারা করে যতোক্ষণ শিক্ষার্থীরা পরিশ্রম নাচার হয়ে না পড়ে। এরপর বকনাগুলিকে বিশ্রামের জায়গায় চালান করে দেওয়া হয় ভবিষ্যতে কোনো একদিন পুনরাবির্ভাবের জন্য। লড়িয়ে গাই-গাভী—বকনাগুলি মনে হয় যেন লড়াইটা উপভোগ করে। তাদের কিন্তু কোনো সাজ সরঞ্জাম যথা ঘাড়ে লোহার হারপুন বা অন্য কিছু থাকে না। এসব গুঁতোগুঁতি, ধাক্কাতে তারা মোটেই বিরক্ত হয় না বরংচ আনন্দ পায় ঠিক যেমন লড়িয়ে মোরগ আক্রমণে পায় আনন্দ। অবশ্যই তাদের কপালে কোনো শাস্তি নেই যেটা থাকে লড়াকু ষাঁড়ের বেলায় শত বীরপনা দেখালেও।

এই সমস্ত ষাঁড়দের দলপ্রীতি অত্যন্ত প্রবল। আর এগুলি করা হয় সব সময় ছয় বা বেশী সংখ্যার গবাদির দল তৈরী করে। এখন এসব দল থেকে যদি একটা ষাঁড়কে বার করে দেওয়া যায়—তাহলে সে তৎক্ষণাৎ বার বার ধরে আক্রমণ চালাবে যে কোনো সঞ্চরণশীল বস্তুকে, ধরুন সেটা মানুষ, ঘোড়া অথবা যে কোনো জিনিষ যেটা নড়ে। সময় সময় যন্ত্রযান বা অন্য কিছু। এ আক্রমণ চলবে যতোক্ষণ পর্যন্ত না তার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন হলো এসব ষাঁড়দের ধরা হয় কেমন করে? না যেমন করে পোষা হাতি বুনো হাতিকে ধরে। একই ভাবে শিক্ষিত বকনা গাই গরুর দল দিয়ে এদের ধরা হয়। ষাঁড়ের লড়াইয়ের সমস্ত ব্যাপারটায় বকনা বাছুরদের ভূমিকা অপরিমেয়। ষাঁড়দের গাড়ীতে ওঠাতে, গাড়ী থেকে নামাতে, বিমানবন্দরে ঢোকাতে, জাহাজের খোঁয়াড় ভরতে

সব রকম ষাঁড়-সংক্রান্ত ব্যাপারে—ষাঁড় তৈরী করা ষাঁড় চলাচল ব্যাপারে বা মাল তোলা নেওয়া সব অনুষ্ঠানেই এদের ভূমিকা অপরিসীম।

আগের দিনে, ওদের রেলের খাঁচায় ভরবার আগের দিনগুলিতে এবং এখনো রাস্তা ঘাট চমৎকার হলে মোটর গাড়ী বা ট্রাকের তো কোনো কথাই নেই রাস্তায় হেটে যেতে আজো কোনো অবসাদ বা ক্লান্তি জাগে না—ষাঁড় গুলির। ষাঁড়দের রাস্তা দিয়েই চালান করা হয়ে থাকে এখনও। এসব লড়াকু ষাঁড়দের ঘিরে থাকে একনো বাছুরের দল। আর থাকে লম্বা লম্বা চাবুক হাতে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার মানুষ। ঠিক পিকাডোরদের হাতে যেমনটি থাকে। ধুলোর ঝড় উঠিয়ে এরা যখন চলতে থাকে গ্রামের মানুষরা তখন ঘরে কুলুপ এঁটে আর তালা চাবি দিয়ে জানলার পথে চেয়ে দেখে ধুলোয় ভরা চওড়া কাঁধ, উঁচু শিং, ধূর্ত চোখ আর ভিজে মুখ। বকনাদের গলার ঝুনু-ঝুনু রব, আঁট সাঁট কোট, উঁচু কানা টুপীওলা পশুপালকের দল ধীরগতিতে রাস্তা ধরে এগিয়ে চলে। ষাঁড়গুলি এখন নিশচুপ। দলে ভারী বলে আত্মপ্রত্যয় তাদের বড় বেশী, আর দলপ্রীতি তাদের নেতাকে অনুসরণে অনুপ্রাণিত করে। যেখানে রেলপথ নেই বা দলছুট করতে এই একই পদ্ধতি মেনে চলা হয়। একবার আমরা তখন স্পেনে ছিলাম। ভেলেন্সিকার বাইরে গ্রামের এক শেষ বাড়ীটায় একটা ঘটনা ঘটেছিলো। হঠাৎই ষাঁড়টা হোচট খেলো। সামনে পড়েও গেলো। উঠে যখন দাঁড়িয়েছে দল তখন বেশ এগিয়ে গেছে। প্রথমেই ষাঁড়টার চোখে পড়ে খোলা দরজার পথে একজন মানুষ। তেড়ে গিয়ে আক্রমণ করলো সে। মানুষটাকে শিং দিয়ে স্রেফ উঁচুতে তুলে নিলো, তারপর মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে দূরে ফেলে দিলো। ভেতরে ঢুকে কাউকে দেখতে পেলো না। আরো এগিয়ে গেলো, শোবার ঘরে একজন বুড়ী দোলনা চেয়ারে বসেছিলেন। গোলমালটা তার কানে যায়নি। চেয়ারটা গুঁড়িয়ে বুড়ীকে ফেঁড়ে দিলো ষাঁড়টা। দরজার যাকে প্রথম ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিলো সে ততোক্ষণে একটা শটগান নিয়ে এসেছে। সে চেয়ে ছিলো তার স্ত্রীকে রক্ষা করতে। কিন্তু ততোক্ষণে ষাঁড়টা তার বৌকে ঘরের কোণায় পেড়ে ফেলে দিয়েছে। মানুষটা ষাঁড়টার গায়ে প্রায় বন্দুক লাগিয়ে দাগলো। কেবলমাত্র কাঁধটা একটু ছড়ে গেলো। ধরে ফেল্লো মানুষটাকে আর মেরে ফেললো সংগে সংগে। তারপরই সে দেখলো একটা আয়না। এবার আক্রমণ চালালো একটা বিরাট পুরনো আলমারিতে। শেষমেষ বেরিয়ে এলো আবার রাস্তায়। রাস্তায় কিছু এগিয়ে গেলো। ঘোড়ার গাড়ী যাচ্ছিলো একটা। আক্রমণ করে মেরে ফেললো

সংগে সংগে ঘোড়াটাকে। তারপর উল্টে দিলো গাড়ীটা। গাড়োওয়ান চুপ করে কাঁপতে লাগলো গাড়ীর মধ্যে। ইতিমধ্যে পশুপালকরা ফিরে আসছিলো। ঘোড়ার টগবগানির সংগে ধূলো উঠছিলো প্রচুর। ওরা শুধু দুটো বকনা পাঠিয়ে দিলো। তারা ষাঁড়টার দুপাশে দাঁড়িয়ে গেলো। সংগে সংগে কুঁজটা নেমে গেলো তার। মাথাও নামিয়ে দিলো এক সময়। দুটো বকনার মাঝে খট্‌খট্ করে হেঁটে দলে ফিরে গেলো শেষমেষ।

স্পেনে লড়িয়ে ষাঁড়দের মোটর গাড়ী আক্রমণ করতে দেখা গেছে। এমন কী রেল লাইনে দাঁড়িয়ে ট্রেন আক্রমণ করতে দেখা গেছে তাদের। কিছুতেই নড়বে না। যদি ইঞ্জিন সিটি দিয়ে এগোয় তাহলেও অন্ধের মতো আক্রমণ করে বসবে সে। সত্যিকারের সাহসী লড়িয়ে ষাঁড় কোনো কিছুতেই ভয় পায় না। স্পেনের চাকপ্রদ আর বন্যপ্রদর্শনীতে একবার একটা ষাঁড় বার বার একটা হাতিকে গুঁতোয়। ষাঁড় সিংহ আর বাঘকে মেরেছে এমন দৃষ্টান্তও আছে। একই প্রচণ্ড আক্রমণ চালায় যেটা ওরা পিকাডোরের বেলায় করে থাকে। জাত লড়াকু ষাঁড় জগতে কাউকেই ভয় পায় না। আর আক্রমনোদ্যত থাকলে সৌন্দর্য সুন্দরতম। পঁচিশ গজের দৌড় প্রতিযোগীতায় একটা ঘোড়াকে হারিয়ে দেবে, অবশ্য যদি দৌড়টা পঞ্চাশ গজের হয় ঘোড়া ষাঁড়কে হারিয়ে দেবে। ঠিক একটা বেড়ালের মতো ষাঁড় ঘুরে দাঁড়াতে পারে। পোলো খেলার টাট্টু ঘোড়া থেকে দ্রুত সে ছুটতে ছুটতে ঘুরে আসতে পারে। চার বছরের লড়াকু ষাঁড়ের ঘাড়ের আর গলার যে মাংসপেশী আছে তাদিয়ে সে আরোহী সমেত একটা ঘোড়াকে ঘাড়ের পেছন দিক দিয়ে ছুড়ে ফেলতে পারে। অনেক সময় আমি দেখেছি এ সমস্ত ষাঁড়কে এক ইঞ্চি পুরু কাঠের তক্তাকে শিং দিয়ে হ্যা একটা শিংই বলা উচিৎ কারণ তারা সব সময় হয় বাঁয়েরটা বা ডায়েরটা দিয়ে গুতোয় ফলে তক্তাটা টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

ভ্যালেনিকা যাদুঘরে একটা ঘোড়ার ব্যবহার করা ষ্টিরাপ আছে। যেটা ডন ইষ্টাবেন থারননাডেচ গোচারণ-ভূমি থেকে আসা একটা ষাঁড় প্রায় চার ইঞ্চি ফুটো করে দিয়েছিলো। এই ষ্টিরাপটা সংরক্ষণ করা হয়েছে একটা ষাঁড় কীভাবে সেটা ফুঁটো করে দিয়েছে শুধু তা দেখাবার জন্য নয়, রাখা হয়েছে অলৌকিক ভাবে কী করে একজন পিকাডোর স্রেফ বেঁচে গিয়েছিলো শিংয়ের গুঁতো থেকে সেটা দেখাবার জন্য।

স্পেনে একটা বই আছে অবশ্য এখন সেটা ছাপা হচ্ছে না। বইটা হলো "টোরো সেলিব্রে।" নামের আদ্যাক্ষর অনুসারে সাজানো তা। অনেক

ষাঁড়ের নাম ও তাদের মৃত্যুর কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। প্রায় তিনশো বাইশজন কুরিং-কর্মা ষাঁড়ের নাম-ধাম পরিচয় রয়েছে। এলোমেলো ভাবে আপনি ওখান থেকে 'হেচিসেরো' বা 'যাদুকর' ষাঁড়ের নাম পাবেন যে কোংকা আর সিয়েরা তৃণভূমি থেকে এসেছিলো। ওখানে আছে একটা ধূসর ষাঁড়ের খবর। ১৮৪৪ সালে কার্ডিজে লড়েছিলো সে। প্রায় প্রতিটি মাতাডোরকে (ষাঁড়ের সংগে লড়িয়ে মানুষ ', প্রায় সাতজন মানুষ আর সাত-সাতটা ঘোড়াকে মেরে ফেলেছিলো একসময়। ভিবোরা বা ভাইপার ষাঁড়টা এসেছিলো ডন জস্ বুয়েনো থেকে। কালো দেখতে। লড়েছিলো ভিস্তা এলজেরাতে, ১৯০৮ সালের ২ই আগষ্ট। ঘেরাটোপে ঢোকার সংগে সংগে সে সেখানকার ছুতোর মিস্ত্রি লুই গঞ্জালেশকে গুঁতোয় আর উরুতে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। মাতাডোর ভিরোভাকে খতম করতে অপারগ হলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। ঘটনাটাই তাকে মনে রাখবার একমাত্র কারণ নয়। ভিবোরা এবং ছুঁতোর মিস্ত্রীর বইতে জায়গা দখল করার একমাত্র কারণ ষাঁড়টি কি নিখুঁত সময়ে আক্রমণটা চালিয়েছিলো সেটা দেখাবার জন্য।......একজন মাতাডোর নামটা বোধহয় তার ঠাঁই পায়নি ইতিহাসে যেহেতু সে দড়ির বেড়ায় ঢুকে ঘোষণা করেছিলো ভিবোরাকে ফেঁড়ে দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। আমি নিজে দেখেছি দুজন ছুতোর মিস্ত্রীকে শেষ করে দিয়েছে ষাঁড়ে। অথচ তারা স্থান পায়নি।

জরোগোরা নামে পরিচিত ষাঁড়টি, যে নাকি লেসিরিয়া চারণভূমিতে শিক্ষনবিনশী করে। পর্তুগালের মোয়েতিয়াতে নেবার সময় খাঁচা-ভেংগে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। ফলে বহু মানুষ তার তাড়া খেয়ে ছুটে পালাবার পথ পায়না। সে একটা ছেলেকে তাড়া করে। সে-বেচারী পালিয়ে টাউনহলে ঢুকে একতলায় উঠে যায়। ষাঁড়টাও তার পিছু পিছু একতলায় ওঠে। বইতে বলছে এবার, সে তার আক্রমণ চালিয়ে অনেক ক্ষয়-ক্ষতি করে। হ্যাঁ সেটা সম্ভব।

কমিশারো নামে একটা ষাঁড় এবার। ডন ভিক্টোরিয়ানো রিপামিশন চারণভূমিতে পালন করা হয় একে। লাল রংয়ের ষাঁড়টা। একটা চোখ ছোটো পাখীর মতো। চওড়া শিং। ১৮৯১ সালে ১৪ই এপ্রিল বার্সিলোনার লড়াইয়ে ছিলো তিন নম্বর ষাঁড়। বইতে বলছে এবার,—বেড়া টপকে চলে যায় সে মঞ্চের ওপর। দর্শকের মধ্যে দৌড়িয়ে সে কল্পনায় আনা যায় এমনই ধ্বংস আর আতংকের সৃষ্টি করে। নগর রক্ষকদের একজন ইসিড্রো সিলভা

দেহে তরোয়ালের খোঁচা মারে আর একজন সৈনিক উবালদো ভিগের গুলি চালায়। গুলিটা তার গলার মাংসপেশী ভেদ করে বেরিয়ে অনুষ্ঠানের খিদ-মৎগার জুয়ান রিকাসিথাসের বাঁদিকের বুকে ঢুকে যায়। ঘটনাস্থলেই মারা যায় সৈনিকটা। শেষমেষ ফাঁস দিয়ে আটকানো হয় জন্তুটাকে। এবং বার বার ছুরির আঘাতে শেষ করে দেওয়া হয় তাকে।

জাত ষাঁড়ের লড়াইয়ে প্রথম ঘটনাটি ছাড়া আর কোনো ঘটনাই স্থান পেতে পারে না। এমনকী ছুরণের নামে ষাঁড়ের ব্যাপারটাও নয়। ডন এন্টিনিও লোপেজ প্লাটা চারণভূমিতে শিক্ষনবিশী তার। ১৯০৪ সালে ২৪শে জুলাই বাংলার একটা বাঘের সংগে সান সাবোষ্টিয়ানের প্লাজা রংগভূমিতে লড়েছিলো সে। ইস্পাতের একটা খাঁচায় লড়েছিলো তারা। হঠাৎ ষাঁড়ের গুঁতোয় খাঁচা ভেংগে গেলে বাইরে বেরিয়ে আসে দুজন। একেবারে সরাসরি দর্শকদের মধ্যে। মরন্মুখ বাঘটাকে একদম ঠাণ্ডা করতে আর প্রাণশক্তিতে ভরপুর ষাঁড়টাকে মারতে পুলিশকে বেশ কয়েকবার গুলি চালাতে হয়। "ফলে অনেক দর্শকের গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে যায়।" ষাঁড় আর অন্য জন্তুদের সংঘর্ষের নানা বিবরণ শুনে আমার মনে হয় ঘটনা থেকে দূরে থাকাই ভালো আর যদি দেখতেই হয় কোনো উঁচু ঘেরা জায়গা থেকে দেখাই উচিং।

অফিসিয়াল নামে আর এক ষাঁড়। মানুষ হয় সে এরিবাস নামে দু-ভায়ের চারণভূমিতে। ১৮৮৪ সালের ৫ই অক্টোবর কাডিজের লড়াইয়ে নামে সে। ব্যাণ্ডারিলসকে ধরলো আর গুঁতোলো। বেড়া টপকিয়ে পিকাডোর ব্যাটাকে তিন তিনবার গুঁতোয়। একজন রক্ষককে তারপর। পৌরসভা-রক্ষকদের একজনকে গুঁতিয়ে পা আর পাঁজরার তিন তিনটে হাড় ভেংগে দেয়। নগরে জনসাধারণ যখন বেআইনি কার্যকলাপে ক্ষতি আর ধ্বংসে প্রবৃত্ত হয় তখন তাকে ছেড়ে দিলে আদর্শ জন্তুর কাজ করতো হয়তো সে।—....

যে কোনো ষাঁড় পালাবার পথে অনেক মানুষ খুন করতে পারে। করতে পারে সম্পত্তির বিনাশ, বিন্দুমাত্র কোনো শাস্তি না পেয়ে। কিন্তু দর্শকদের মধ্যে থেকে একটা ষাঁড় যতো না ভয়ংকর তার থেকে বেশী ভয়ংকর হয় ঘেরার মধ্যে মাতাডোর-এর হাতে মরার মুহূর্তে।

কারণ জনতার মধ্যে ভ্যাবাচ্যাকা খেলে সে এলোপাতারি আক্রমণ করে বসে। ঠিক কোনো লক্ষ্যবস্তু থাকে না। সে ষাঁড় নিশ্চয়ই সাহসী নয় যে নাকী মানুষকে তাড়া না করে লাফিয়ে বেড়া ডিংগোয়। পলায়নী মনোবৃত্তি যে ষাঁড়ের অবশ্যই সে কাপুরুষ। সাহসী ষাঁড় লড়াইকে স্বাগত জানায়,

লড়াইয়ের প্রতিটি ইংগিতকে সে আহ্বান করে। কোণঠাস' বলেই লড়াই চালায় না সে, সত্যি সে লড়াই চায় ·· যদি না সে নিজে শান্তি পায় তবে সে মানুষকে তার ঘোড়া শুদ্ধু দূরে ছুড়ে ছায়।

মানুষের হাতের ত্রিশূলের মতো 'পিক' যন্ত্রটার বিরুদ্ধে কীরকম ব্যবহার করে—তার ওপরই নির্ভর করে ষাঁড়ের সাহসের পরিমাপ আর প্রশংসা। স্পেনীয় ষাঁড়ের লড়াইয়ের প্রথম কথাটা হচ্ছে ষাঁড়ের সাহস। সত্যিকারের সাহসী ষাঁড়ের সাহস অপার্থিব ও অবিশ্বাস্য। এই সাহসটা হলো নিষ্ঠুরতা, বদ-মেজাজ অথবা ভয়োৎপাদিত সাহস যেটা নাকী কোনঠাসা ষাঁড়ের বেলায় সাধারণত দেখা যায়। ষাঁড় হচ্ছে লড়াকুজাত, এবং যেখানে লড়াইয়ের প্রবণতা জন্মসূত্র থেকে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়—কাপুরুষতা দূর করে নিয়ে তখন লড়াই ছাড়া অন্য সময় সে হচ্ছে জন্তুদের মধ্যে সবচেয়ে শান্ত প্রাণী। খোঁয়াড়ে একবার একটা ষাঁড় দেখেছিলাম সেটা তার পালকের হাতে কতো না খোঁচা-খেতো। এমন কী পালক পিঠে উঠতো। লড়াইয়ের জায়গায় নিয়ে যেতো। তখন তার নেই বিন্দুমাত্র উত্তেজনা, গুঁতোনো, ধাক্কা। কিন্তু যেই একবার ঘেরাটোপের মধ্যে পড়লো অমনি আরম্ভ হলো তার খেল। বার বার আঘাত হানতে লাগলো পিকাডোরকে, পাঁচ-পাঁচটা ঘোড়াকে মারলো। একের পর এক চেষ্টা চালালো মাতাডোর আর বাণ্ডারেলিরোসকে খুন করতে। এই সময় সত্যি সে কেউটের মতো খল আর সিংহিনীর মতোই সাহসী।

ভয়ংকরের ভয়

নিক্ কাটার

কালো পাহাড়ের নীচে—ওটা অবশ্য দিনের বেলায় সবুজের শ্যামলিমায় ভরে ছিলো, আর এখন শুব্ধতার প্রহরীরা আছে অপেক্ষায়। রাত কৃষ্ণপক্ষ। মানুষগুলি অনেক কজন। একজনের শুধু জানবার কথা এটা সব রাতের সেরা রাত। আর এ-রাতে অপেক্ষা করা চলে। ঐ বিশেষ একজন অন্য সকলকে সচেতন করে ছায় তাদের অজ্ঞতার নৈরাশ্য সম্বন্ধে। সে জানে তাকে কী করতে হবে—তবুও চরম সাবধানতায় বাইরে বেরিয়ে আসে। মনপ্রাণ ঢেলে সেই বিশেষ একজন সমুদ্রে তীক্ষ্ণ-নজর রাখে যদি কিছু শোনা যায়, বা দেখা যায়।

যে শব্দ সে শুনতে চায় সেটা কিন্তু আর হয় না। সমুদ্রের স্তব্ধতায় অবাক মানে সে। ঢেউয়ের পর ঢেউ বেলাভূমির নুড়ি-পাথরগুলিতে আছাড় খেয়ে চলে। ঢিমেতালে চলা বাতাস। হিস্ হিস্ করতে করতে বেরিয়ে যায়। ব্যাস্ ঐ পর্যন্তই। কিন্তু ব্যাপারটা ক্রমেই বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়ালো।

পাহাড়ের নীচে নৌকার ওপর দুটো মানুষ স্নায়ুর তাৎক্ষণিক চঞ্চলতায় মাথা নাবালো...সার্চ-লাইটের তীব্র আলো তাদের মাথা ছড়িয়ে আকাশ-চিড়ে সমুদ্রের বিশালতায় ঠিক মেলাবার আগেই। তারা দুজনেই জানে সার্চ লাইটের আলো তাদের ওপর পড়বে। খুব যত্নের সংগে তাদের তীরে নামবার জায়গাটা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। হাইতি প্রজাতন্ত্র তাদের দেশে অনুপ্রবেশের সব সীমানা—স্থল, জল আর সমুদ্র-পথ বন্ধ করার উপযোগী স্বচ্ছল নয় টাকা-পয়সায়। কিন্তু আজীবন রাষ্ট্রের কর্ণধার অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট - সেই পাগল মানুষটা ঠিক তাই করতে চেয়েছিলো। কারণ সব জাতের অভিযানকারীরা—কিউবার ডোমিনিক্যান, আমেরিকান, ভেনেজুয়েলানরা আর কিছু বা হত্যাকারী এবং ছবি তুলিয়ে "লাইফ" পত্রিকার লোক অযথা ভীড় জমাতো। এ-ব্যাপারে বাইরের লোকের নাক গলানোও তাঁকে অহরহ সহ্য করতে হয়েছে। তাই প্রত্যেকটি সম্ভাব্য অনুপ্রবেশের পথে থাকে সশস্ত্র-প্রহরী আর সার্চলাইটের ব্যবস্থা। তবুও তাঁর দিকের দ্বীপটার সমস্ত জায়গাটায় তিনি অস্ত্রধারী মানুষ হাত ধরাধরি করে রাখতে পারেন নি। এবং কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের লোক আজো সেই মাইকেল পাহাড়ের চুড়োয় অবতরণের চিন্তা মাথায় আনে নি।

সার্চলাইটের তীব্র আলো একসময় বাঁকা তরোয়ালের মতো সমুদ্র থেকে জমির দিকে ঘুরে এলো। কেউই না—যারা সার্চলাইট চালায় বা যারা পাহাড়ের মাথায় বসে চারদিক নজর রাখে, ধারণা করতে পারে যে নাকের আগার মতো ছুঁচালো পাহাড়টা—যেটা আবার সমুদ্রের ঝড়ো হাওয়ায় সদাই বিধ্বস্ত, তার ওপর মানুষ উঠতে পারে। নৌকোর মানুষ দুটোও কালো। বয়সে ছোটো জন পোর্ট ও, প্রিন্সে একসময় জন্মেছিলো। বয়স্ক লোকটি গায়ে কালো-রং মেখেছিলো। কারণ ভেবেছিলো রাত্রির অভিসারে কালো-রংয়ে রাংগিয়ে নিলে মানাবে ভালো।

জাঁ পিঁয়ের তিরনিয়ে অগভীর জলে নৌকোটা বয়ে নিয়ে গেলো। কোনো আওয়াজ বেরুচ্ছে না যন্ত্রটা থেকে। কারিগরী বিদ্যার চূড়ান্ত করে ছেড়েছে

যন্ত্রবিদরা কেবলমাত্র নৌকোর ওপর দুটো মানুষের জন্য। যন্ত্রপাতির জটিলতা অনেকেই বুঝতে পারে না। এমন কি পিঁয়েরও নয়। অবশ্য তার

জন্ম ওর কিছু যায় আসে না। সে কেবল জানে—নৌকোটা আশ্চর্য ধরণের বোবা। সে তার জীবিত মানুষদের যেমন জানে এই সমুদ্রের বেলা ভূমিও ঠিক সে রকম তার মুখস্থ। আর নৌকো চালাবার যদি কোনো ব্যাপার হয়, তাহলে এ ধরনের নৌকো নিয়ে সে পাহাড়ের চুড়োতেও পৌছোতে পারে। আর তার সওয়ারী যেখানে বলবে ঠিক সেখানেই রেখে আসবে তাকে। হ্যা কাছাকাছি তো বটে—একেবারে ঠিক জায়গাটায় না হলেও।

তাদের সামনের জল থেকে উঠে যাওয়া পাহাড়টার দিকে তাকালো সে। দুশো ফুটের অপ্রতিরোধ্য বাঁধা। তেল চকচকে, মাছিও নাকী গায়ে বসতে পারে না। নিজেকেই নিজে, শোনালো সে। সংগীর দিকে তা'ালো এবার—এই মস্তানটাও কী পারবে। যতোই থাকনা তার ছন্দশীলতা ভারসাম্য আর সহ্যক্ষমতা। অবশ্য ছয় ফুট লম্বা চাবুকের শক্তি আর ইস্পাত-স্নায়ু কাজের হতে পারে। হ্যা নিশ্চয়ই। কিন্তু তাতেই কী পার পাবে? সন্দেহ হচ্ছে জ'া-পিঁয়েরের। না এই বিশ্বাসঘাতকের গা বেয়ে কেউ উঠতে পারেনি। বিগত দিনের জলদস্যুরা তাদের বন্দীদের পালানোর ব্যাপারে এই জায়গাটায় অন্তত নজর ঢিলে রাখতো। ইতিহাস বলে কোনো বন্দীই এই পাহাড়ের গা বেয়ে পালাবার চেষ্টায় সার্থকতা লাভ করেনি। বরংচ অনেক বন্দীই পিছলে নিচের পাহাড়ে পড়ে মারা গেছে।

হঠাৎই নৌকোর দ্বিতীয় মানুষটি তার দিকে তাকিয়ে অন্ধকারের মধ্যে হেসে উঠলো। অন্ধকারে শুধুমাত্র তার দাঁতগুলিই দেখা গেলো আর চোখের তারায় ঝিকিমিকির কিছুটা আভাষ বা। কিন্তু জ'া পিঁয়ের মানুষটার দাড়ি ভর্তি শক্ত মুখটা দেখলো মানসচক্ষে। সে আরও ভাবলো তাদের প্রস্তুতির ব্যাপারটা। তার পরেও আছে মানুষটার কাজ চলাকালের মারমুখী মূর্তি। হলেও হতে পারে ভাবলো সে। আবার যদি কেউ অসাধ্য সাধন করতে পারে তাহলে নিশ্চয়ই সে মানুষটা হবে এ। কিন্তু, হায় ভগবান! ব্যাপারটা কী ভীষণ হবে যদি সে পাহাড়ের গায় পিছলে একবার পড়ে! পাথরগুলি ঘন-সন্নিবদ্ধ উপরন্তু হাঙরের দাঁতের মতো ধারালো। হাঁ করা পাথর একটা ছোটো নৌকোটাকে ধাক্কা মারলো এক সময়। উঁচু পাহাড়টার তলায় ধারালো একটা পাথরের কাছে বিপজ্জনক ভাবে হেলে পড়লো সেটা। জ'া পিঁয়ের নির্দিষ্ট হাতলে টান দিলো অমনি নৌকোটা নিশ্চল হয়ে গেলো। মনে হলো নৌকোটা মোটেই নৌকো নয়, একটা জলে চলা হেলিকপ্টার। তারপর ধীরে ধীরে চরম দক্ষতার সংগে তুলনামূলক ভাবে কম ধারালো একটা পাথরের কাছে নিয়ে এলো।

আলতো ভাবে নৌকোর বোতামে হাত ছোঁয়ালো সে। দেখতে না দেখতেই একটা আঁকশি নৌকোর সামনে থেকে বেরিয়ে এসে পাথরে নৌকোটাকে ঠিক মতো আঁটকে দিলো। দুলে উঠলো নৌকো কিন্তু আঁকশি তাকে জায়গা মতো আটকে রাখলো।

জঁা পিঁয়েরের সংগী মানুষটি পাহাড়ের গায়ের দিকে তাকালো এবার। সামনের দেওয়ালটার কয়েক ফিট একদম লম্বা আর ভিজে। পথটা পিচ্ছিল। তার ওপরে পাথুরে দেওয়াল শুকনো কিন্তু মসৃণ কংক্রীটের মতো শক্ত। পাহাড়ের ওপরটায় চারপাশটা বেড় দিয়ে মালার মতো ঝোপের সারি। সবার ওপরে রয়েছে ঘন গাছের জংগল।

বুড়ো মানুষটা সন্তুষ্ট চিত্তে মাথা দোলালো। গাছের পাতার আড়ালে নিঃসাড়ে সরে যাওয়া যাবে। রাতের কালো অন্ধকারের আড়ালে সবুজ পোষাক চেনাই যাবে না। ওপরের অন্ধকারের দিকে চাইলো কিছু সময়। জঁা পিঁয়ের ঠিকই বলেছিলো—গাছের আড়ালে আবডালে পাহাড়ের পেছনের দিকে একটা পায়ে চলা রাস্তা মতো চলে গেছে। পাহাড়টার চুড়োর দিকে তাকাবার আর দরকার নেই। কিছু সময়ের মধ্যেই তো সে ওখানে পৌঁছাচ্ছে। বাঁকানো কাঁটা গুলি আঁটা আছে যে চামড়ার বাঁধনটায়—পরীক্ষা করলো। একই ভাবে কব্জির বাঁধনটাও। কারণ তার বুটের সংগে আর হাতের সংগে আঁটা আছে দাড়ার মতো বাঁকানো কাঁটা। এতো সুন্দর ব্যবস্থা মনে হবে যেন নখের সংলগ্ন মাংসপেশী থেকেই কাঁটাগুলি পাঁচটা আঙুল থেকে বেরিয়েছে।

মাথা ঝাঁকালো মানুষটা পিঁয়েরের দিকে। সেলামের ভংগীতে একটা দাঁড়ার মতো বাঁকানো হাত তুল্লো। চলে এলো এক সময় নৌকো থেকে নীচের একটা পাথরের ওপর। একবার, কেবল একবারই সে ওপরের পাহাড়টার দিকে তাকালো। এরপরই আরম্ভ হলো চড়বার পালা। হাত পায়ের দাঁড়ার মতো বাঁকানো কাঁটাগুলি পাহাড়ের গায়ে ক্রমাগত আঁচরিয়ে চল্লো ক্রমাগত খুঁজে চল্লো ছোটো ছোটো কাঁটা ঢোকাবার মতো গর্ত আর তারপরই সতর্ক কাঁকড়ার মতো উঠতে আরম্ভ করলো ওপরে।

যন্ত্রণাকাতর ধীরগতি। জঁা পিঁয়ের দেখলো কিছু সময়। পেটের ভেতরটা কেমন মোচর দিয়ে উঠলো একসময় যখন ওপর থেকে ঝুরঝুরে বালি নীচে আর পড়লো না। পাথর—খালি শক্ত মসৃন পাথরে দাঁড়ার মতো কাঁটা পাঁচটা দাঁত বসাতে চাইলো। দশ···পনেরো···কুড়ি ফুট। হায় ভগবান! কী না আস্তে চলছে ব্যাপারটা। পঁচিশ ফুট—! হৃদপিণ্ডের ধুকপুকানি কী বন্ধ হয়ে গেলো।

এই মরেছে পায়ের কাঁটা যে আর দাঁত বসাতে পারছে না। স্বাধীনভাবে পা-জোড়া যে ঝুলছে! নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো জঁা পিঁয়েরের। অসতর্ক মনে সে নৌকোর কাছেকার তীক্ষ্ণ পাথরগুলির দিকে তাকালো। একটা পাথর শব্দ করে গড়াতে আরম্ভ করলো। শেষমেষ সেটা গব করে জলে মিলিয়ে গেলো। আবার সে ওপরের দিকে তাকালো। না এবার পা-জোড়া ঠাঁই পেয়েছে। আর তারা আস্তে আস্তে খুব আস্তে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। ত্রিশ ফুট ··কয়েক ইঞ্চি। আবার কয়েক ফুট। হ্যা, এবার জঁা পিঁয়ের ফিরতে পারে। তার করার আর কিছুই নেই।

নৌকোটা সে খুলে পাহাড়ের কাছ থেকে সরিয়ে দিলো। ঠেলে আনলো খোলা সমুদ্রের কাছে। তারপর একসময় ডুবো জাহাজটায়। ঘড়ির কাঁটার নিরুত্তাপ আলো তাকে জানালো সে অবশ্যই তাড়াতাড়ি করবে। ছোট ডুবো জাহাজটায় স্পষ্ট নির্দেশ আছে নৌকোর অযথা দেরীর জন্য সে যেন অপেক্ষা না করে। ঘুরে তাকালো আরেকবার—পয়তাল্লিশ ফুট—না কী পঞ্চাশ ফুট। আর উঠছে কী ভাবে? না একটা অনিচ্ছুক শামুক বাগানের দেওয়াল বেয়ে যে ভাবে ওঠে।

উপমাটা ঠিকই। কারণ মানুষটা অবশ্যই একটা শামুক আর পাহাড়টা যেন দেওয়াল। রাতটা গরম। ঐ পাহাড়ের গা বেয়ে উঠার পরিশ্রম তার দেহের প্রতি আউন্স ইচ্ছা শক্তি আর সহ্য ক্ষমতা কেড়ে নিচ্ছে। তার হাত পা যখন যান্ত্রিকভাবে কাজ করে চলেছে তখন তার মন পড়ে থাকলো অন্য কোনো জায়গায়। চামড়ার ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম পিনের মতো খুঁচিয়ে চলেছে। আর নতুন গজানো দাড়িটাও থেকে থেকে চুলকোতে চাইছে। মানসিক ভাবে সে হিসেব করে নিলো তার কাছে কী কী আছে—ফিদেল কাস্ত্রোর মতো বেসভূষা। পোষাকে অরিরিক্ত পকেট, প্রচুর টাকা-পয়সা তাতে। টাকা পয়সা গুলি আবার বিভিন্ন মুদ্রায়, ওগুলির ব্যবহার নানা ভাবে হয়তো হবে। তার মধ্যে অবশ্যই ঘুষও আছে। পিঠে আছে একটা হ্যাভারস্যাক। সেটার মধ্যে আছে অলৌকিক কার্য সম্পন্ন একটা স্যুট। দাবী করা হয়েছে ওটা মোটেই ভাঁজ খায় না। সংগে আছে স্যুটের টুকিটাকি জিনিষ।

অপর দরকারী জিনিষ যেগুলি সে বয়ে নিয়ে বেরুচ্ছে--একটা লুগার পিস্তল। আদরের নাম তার উইলহেমিনা। হুগো নামে ইস্পাতের ছুরি আর পিয়ের বলে একটা গ্যাস বোমা।

নিক কার্টার পাহাড় বেয়ে উঠে চলো।

দাঁড়ার মতো কাঁটা চারটে পাহাড় আঁকড়ে উঠে যাচ্ছে। পাহাড়ের গায়ে ইস্পাতের ধাড়ালো কাঁটাগুলি এক ইঞ্চির কয়েক ভগ্নাংশ মতো বিঁধে তাকে ধরে রাখছে। তাড়াতাড়ি করার ব্যাপার এটা নয়, ধরবার আর কিছুই নেই। কেবলমাত্র কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো ইস্পাতের কাঁটা। ওগুলিই কার্টারকে নীচের পাহাড়ের মৃত্যুর হাত ছানি থেকে বাঁচিয়ে চলেছে।

এখনো অর্ধেকটা পথ সে অতিক্রম করতে পারেনি। শরীরের ওপর চাপ অসহ্য হয়ে উঠছে। সে এও জানে না ওপরের তার জন্য কী ওৎ পেতে আছে। অবশ্য তার কাজ চলাবার মতো একটা পরিচয় আছে। কিন্তু আর কিছুই নয়। বুড়ো বাজ তাকে যা বলেছিলো হঠাৎই সেটা মনে এলো এবার। নাম হলো লোকটার পায়ালো। আর ঐ পায়ালো মানুষটা তার জন্য চূড়া থেকে দেড় মাইল দূরে একটা পাহাড়ের গুহায় অপেক্ষা করবে।

"পায়ালো কেন ?" সে জিজ্ঞেস করছিলো এক্স-এর সর্বপ্রধান পুরুষটাকে। জ্বলে উঠেছিলো বুড়ো বাজ, "পায়ালো কেন" বলতে তুমি কী বলতে চাইছো ?"

"একজন ডোমিনিক্যান লোকের ইটালীয় নাম !"

অশান্তভাবে বুড়ো বাজ চুরুটে কামড় বসালো, "ও এই ব্যাপার ?"

ডোমিনিক্যানরা আমাদের মানে আমেরিকানদের মতো মিশ্রজাত। যাই হোক মনে হচ্ছে এটা একটা সাংকেতিক নাম। ব্যাপারটা হলো—ভিতরে যাই থাক তোমাকে এই নামের মানুষটাই খুঁজতে হবে। পায়ালোই হবে মানুষটা। টমাস্, রিকার্ডো বা এনরিকো নয়।"

"খুব ভালো সাংকেতিক নামটা তো!" আবার আওয়াজ দিলো নিক্, "আমরা কী আর কিছু জানি না ?"

নিরুত্তাপ চোখে তাকালো বুড়ো বাজ, "না, আমরা আর কিছুই জানি না। তুমি যতোটা চাইছো ঠিক ততোটা যদি আমরা জানতাম তাহলে বোধহয় আমরা তোমাকে পাঠাতাম না। সত্যি কথা বলতে কী কার্টার আমরা জানি না এটা একটা ফাঁদ কী না।"

হাঁ, ফাঁদই বটে! প্রাণে বাঘে করে দেওয়ার মতো ব্যাপার একটা। দাঁতে-দাঁত ঘষলো নিক কার্টার খাড়া পাহাটার দেওয়াল বাইতে বাইতে। মুখটা ঘামে ভর্তি। প্রতিটি মাংসপেশী আর স্নায়ু বিশ্রামের জন্য কেঁদে উঠছে। এই প্রথম তার সংশয় এলো সত্যি কী পাহাড়টার চূড়ায় সে উঠতে পারবে।

এখনো অনেকটা উঠতে। নীচে নামাটাও একই রকম আত্মঘাতী। আর কোনো পথ খোলা নেই। ডাংগায় বাঘ, জলে কুমীর।

উঠে যাও, মাণিক উপরে গুটি গুটি উঠে যাও। নিজেকেই নিজে শক্তভাবে বললো। ভালোই জানে সে এ-কাজের উপযোগী এখন আর সে নয়। শারীরিক কান্না যেন আর বাঁধ মানছে না। পাহাড়টা আঁকড়ে ধরতে পিছলালো এ-সময়। কিছু পেলো না। হ্যাঁ, পেয়েছে। কষ্টে-সৃষ্টে উঠলোও কিছুটা। না, সত্যি ব্যাপারটা হাসি পাবার মতো। এভাবে অসম্ভবের বিরুদ্ধে লড়ে যাওয়া। সুতরাং অন্যমনস্কতার সুযোগ নেবার জন্য সে আবার 'বুড়ো-বাজে'র কথাবার্তায় ফিরে গেলো। এবং কথাবার্তাটা মোটেই আরামদায়ক নয়।

"যদি এটা ফাঁদ-ই হয়," বলেছিলো সে "ফাঁদটা কী ধরণের হতে পারে মনে করেন ?"

বুড়োর উত্তরটা তার মাথা থেকে সরে গেলো যখনই পায়ের দাঁড়া স্থানচ্যুত হলো। অবিশ্বাস্য গতিতে তার দেহটা নেবে চললো। নিরেট পাথরে বৃথাই তার ইস্পাতের দাঁড়াগুলি মাথাকুটে মরলো! ঠাঁই নাই। জোঁকের মতো কুঁকড়ে দেহটা এগিয়ে দিতে চাইলো সে। যতোটা সম্ভব দেহটা পাহাড়ের গায়ে লেপ্টে রাখলো, আর মনেপ্রাণে প্রার্থনা করলে,—হে ভগবান দাঁড়াগুলি যেন কোন না কোনো আলগা পাথরের গায়ে বিঁধে যায়।

নিক একটা দৈত্যাকার বনবিড়ালের মতো পড়তে পড়তে দাড়ার সাহায্যে পাথর গাঁথবার চেষ্টা করলো। ঠিক ঐ বনবিড়ালটা এ-অবস্থায় যেভাবে তার থাবা পাতবার প্রয়াশ করে। হ্যা পেলো পাথরের গায়ে একটা ছোট্ট খুঁত। আর পেড়ে ধরলো সেটা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলো। গভীর আর দ্রুত শ্বাস টেনে চললো। চোখে ঘাম ঝরে পড়াতে চোখ পিট্‌পিট্‌ করলো কিছুসময়। সে ভালোই জানে পায়ের বাঁধন যে কোনো সময় খুলে যেতে পারে। আবার উঠতে আরম্ভ করলো সে। প্রথমে ডান-বাঁয়ে তারপর ওপরের দিকে, শরীরের শেষ শক্তিটুকু সংগ্রহ করে এগিয়ে চললো নিক কার্টার। ভালোই জানে এ-শক্তিটুকু তাকে পাহাড়ের চুড়োতে পৌছে দিতে পারবে না।

হতভম্ব হয়ে গেলো। এখনো অনেক, অনেক ওপরে উঠতে হবে তাকে।

এরপরই তার পা পেয়ে গেলো দু-ইঞ্চি মতো একটা ফাঁক

অদ্ভুৎ, এবার আরম্ভ হয়েছে পাহাডটায় একটু ঢাল-মতো। ঢালের সুবিধাটা যতোদূর সম্ভব আশ্রয়ের মতোই সে গ্রহণ করলো। গভীর আর কৃতজ্ঞতার সংগে শ্বাস টানলো সে। যতোদূর পারে এলিয়ে দিয়ে। এক-দুই করে কয়েকটি মিনিট কেটে গেলো। শ্বাস-প্রশ্বাস ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হলে এবং

খুলে গেলো মাংসপেশীর জটগুলি। সার্চলাইটের আলোর কথাটা সে-প্রায় ভুলেই গিয়েছিলো। পেছন দিক থেকে আলোটা আরম্ভ করে সামনের দিকে চলে গেলো। আলোটার সম্বন্ধে সচেতন হলো এ-সময়, যদিও আলো তাকে ঠিক চিহ্নিত করতে পারবে না। হাইতির সরকারী মহল একদম নিশ্চিত—ঐ পাহাড়ের গা বেয়ে কেউ উঠতে পারে না। হ্যা, ভগবানের দোহাই দিয়ে বলা যায় তারা কিছুটা সত্যই বলে। আর ঐ একমাত্র কারণের জন্য তারা পাহাড়টায় পাহারার কোনো ব্যবস্থা রাখেনি। সত্য-মিথ্যা যা হোক না কেন। বুড়ো-বাজের রিপোর্টের দৌড় এ-পর্যন্তই।

কাঁধ দিয়ে নিক তার মুখের ঘাম মুছে ফেললো আর হাতটা খেলিয়ে ঝিম-ভাবটা এড়াতে চাইলো। আশ্চর্য! এখন অনেকটা ভালো লাগছে। ব্যথাও মরে গেছে মনে হলো। দাঁড়ার সংগে আংগুলগুলি ওপরে উঠে গেলো আর পা-জোড়া পেলো কোনো খাঁজের আশ্রয়। একটা শক্ত ঘাসের গোড়া হাতে ঠেকলো। এই প্রথম সে ঘাসের সন্ধান পেলো। ধরি মাছ না-ছুঁই পানি গোছের ভাবে পাকড়িয়ে নিলো ঘাসের চাপড়াটা।

হ্যা, এবার বোধহয় সে পাহাড়টা উৎরোতে পারবে। এখন মনে হচ্ছে ব্যাপারটা খুব একটা শক্তগোছের কিছু না।

রাতের চারিদিকের পরিবেশ চুপচাপ। কেবলমাত্র নীচের জলের ছলাৎকার। ওপরে গাছের সারির মধ্যে শোঁ-শোঁ আওয়াজ। সে এখন নিজের ইস্পাতের কাঁটার ঘষরানো আর গেঁথে যাওয়ার আওয়াজগুলি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। ভালোই সে জানে ইঁদুরের মতো কিচির-মিচির এ আওয়াজ হাওয়ার শাসন এড়িয়ে কারোরই কাণে ঢুকবে না। অবশ্যই ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়াবে যদি কাছাকাছি থাকে কেউ।

বাইরে কালো সমুদ্রের গভীরে ডুবো-জাহাজটা আস্তে আস্তে ডুবে গেলো। সেই আশ্চর্যরকম ঠাণ্ডা নৌকো যেটা জাঁ পিঁয়ের আর নিক কার্টারকে নিয়ে এসেছিলো। ডুবো-জাহাজের নির্দিষ্ট কামরায় ফিরে গেছে। জাঁ পিঁয়ের কাণে যন্ত্র লাগিয়ে একটা মানুষের খাড়া পাহাড়ের ওপর অবিশ্বাস্যভাবে উঠে যাওয়ার শব্দ শুনছিলো। তারই তো শব্দ শুনবার কথা।

না, আরো একজন শুনলো।

পাহাড়ের চূড়া থেকে পর্যবেক্ষক মানুষটি সরে এলো। সে জানতো কেন এবং কীসের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ছায়া ছায়া মতো আগে থেকে ঠিক করা খবর চালবার জায়গাটতে ধীরে ধীরে চলে এলো সে।

নিকের চড়ার পালা এখনো শেষ হয়নি। কষ্ট হচ্ছে উঠতে ঠিকই। কিন্তু এখন আর ব্যাপারটা অসম্ভব মনে হচ্ছে না। সবচেয়ে কঠিন উঠবার জায়গাটা সে অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে। আর সমস্ত পাহাড়টার অর্ধেক পথ শেষ। ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তায় মনে মনে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো।

ধন-দৌলত! ভগবানের দোহাই, নিজেকেই নিজে শোনালো সে। বলা হয়েছে ট্রুজিল্লো কোটি কোটি টাকার মণি-মুক্তা লুকিয়ে রেখেছে। আর সেটাই আমাকে বার করতে হবে হাইতি থেকে। সমস্ত ব্যাপারটাই পাগলামীতে ভরা। দূরের ঐ অন্ধকারের মধ্যে একজন লোক নাম পায়ালো লুকিয়ে আছে। মানুষটা আবার গল্প-উপন্যাসে পড়া "ভয়ংকর কয়েকজন" নামের এক সংস্থার নেতা। ভয়ংকর কয়েকজন! দুঃখ আর হাসি-মেশানো একটা ভাব এলো নিক কার্টারের। ক্যারিবিয়ানের এরাই বোধহয় মাফিয়া। আবার ঠাঁই পাততে ডাকা হয়েছে শ্যাম চাচাকে। যতোদূর মনে হয় এই মানুষগুলি ডোমিনিক্যান্ দেশপ্রেমিক। তারা হাত বাড়াতে চাইছে তাদের কোনো একনায়কতন্ত্রের অসাধু লুঠের মাগে। আর টাকাটা তারা খাটাবে দেশেরই শুভকাজে। এটা অবশ্য তাদের কথা। তাহলেও সন্দেহ থেকে যায়— কেন তারা সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকানদের দুয়ারে যাবে। উপর মহল খবর পাঠালো বুড়ো-বাজকে। আর ফেরফিত্তি এক্স-তলব করলো কার্টারকে। আর এখন? সরকারী ঘাতক পাহাড চড়ে উঠেছে হাইতিতে। কেন-না ভয়ংকর কয়েকজনের পায়ালো গোদাটার সংগে মোলকাতের জন্য। আর দেখা হলে তার কাজটাই বা-কী হবে?

ঘাড় ঝাঁকিয়েছিলো বুড়ো-বাজ, "গতানুগতিক ব্যাপার। ওরা কারা আর কীই বা তাদের উদ্দেশ্য। যদি উপযুক্ত বিবেচনা করো—সাহায্য করবে। ঐ যে কী যেন ব্যাপার "ঝঞ্ঝাবাত্যা" না কী ওটারও খোজ নাও। কেঁচিয়ে দাও তারপর। মোটামুটি এই হলো সমস্ত ব্যাপারটা যোগাযোগটা কীভাবে করবে তাই না? তুমি জাঁ পিঁয়ের তুরনিয়ে মানুষটার সংগে কিড-ডুবো-জাহাজে যাবে। উদ্দেশ্য হবে তোমার সাধু-মাইকেলের পাহাড়ের চুড়ো। এই যে এখানে ম্যাপটা……"

সব সময়ই প্রথম দিকে মনে হয় ব্যাপারটা না জানি কতো সহজ। তারপরই সে ফিরে আসে ওয়েশিংটনে।

আর এখন সে হাইতিতে। সারা রাত শেষ হয়ে একঘণ্টা কাবার হয়েছে। ভয়ংকর কয়জনের পায়ালো অন্ধকারে তারই অপেক্ষায় রত।

ওপরের দিকে তাকালো নিক। পাহাড়ের চূড়োর বেড় আর ঘাসের আস্তারণ তার কয়েক ফুটের মধ্যেই। শেষ বারের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি হিসেবে নিঃশ্বাস নিয়ে নিলো সে। এখানটা বেশ চওড়া। পোষাকে চোর-কাঁটা-জাতীয় কিছু বিঁধলো। কিছুটা হাল্কাও বোধ হচ্ছে নিজেকে। আকাশের দিকে একঝলক তাকিয়ে নিলো। হ্যা, মেঘগুলি বেশ পাতলা। কয়েকটা তারা আকাশে ঝিকমিকিয়ে উঠলো। হ্যা, ঐ ঝিকমিক আলোর তার প্রয়োজন আছে। ওরাই তাকে গাছের ফাঁক দিয়ে নির্দিষ্ট গুহাটায় নিয়ে যাবে।

ধীর গতিতে শেষবারের মতো সে পাহাড়ে চড়তে তৈরী হলো। শেষ খাঁজটায় তার কাঁটাগুলো আটকালো এবার। পায়ের এবার চাই শেষ ঝাঁকুনিটা। বাস্ তাহলেই তার পরিশ্রম সার্থক। পাহাড়ের ধারটায় চোখ রাখলো নিক কার্টার। তার চোখে কোন দৃশ্য উদ্ভাসিত হয় সেটা বুঝে নিতে। কারণ সে নিশ্চয়ই চাইবে না কোনো আলগা গাছপালা পাকড়াতে আর সেটা খসে গেলে একেবারে মাথা থেকে তলায় গড়িয়ে ছাতু হতে।

তাকালো আর দেখলো কোনো একটা জিনিষ যেটা সেখানে থাকবার কথা নয়। মানুষটার থাকবার কথা গুহাটায়। নিশ্চয়ই তার সামনে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে থাকবার কথা ছিলো না। তার দৃষ্টি পায়ের ভারী বুট-জোড়া থেকে নিশ্চল শক্ত-সামর্থ পা-জোড়া, চওড়া বুক আর মুখ-ভর্তি দাড়িতে উঠে গেলো।

মুখটা ভাংগা দাঁতের মেলা বসালো হাসি দেখাতে গিয়ে। আধো-আলো আধো-ছায়ায় মুখটা কোনো মতেই বন্ধুর মুখ বলে মনে হলো না।

"সুস্বাগতম বন্ধু," নিরুত্তাপ গলা ফিসফিসিয়ে উঠলো, "আমি কী তোমাকে সাহায্য করতে পারি?"

নিক্ দাঁত কিড়মিড় করলো আর সম্মতি জানাতে যেন ঘাড়টা হেলালো। কিন্তু দ্রুত চিন্তায় মগ্ন তার মস্তিষ্ক। 'সুস্বাগতম বন্ধু' কথাটা অধঃপাতে যাক। তাকে বলা নাম আর সংকেত-ধ্বনি গুলিতে কোথাও "সুস্বাগতম বন্ধু" কথাটা নেই। আবছা অন্ধকারে বিরাট দেহটা তার আরো কাছে এগিয়ে এলো। সে তার কাঁটা-ওলা পা কিছু নীচে কোনো এক খাঁজে ভালো করে ঢুকিয়ে দিলো শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে। একটা হাত ঝোপের গোড়ায় আটকে রেখে অন্য হাত সাহায্যের জন্য মুক্ত রাখলো। নীচু গলার হাসি ভাসলো বাতাসে। আর ধরে থাকা হাতের ওপর ভারী বুটের জব্বর লাথি দেহ মন যন্ত্রণায় ভরিয়ে দিলো তখনই।

"আমেরিকার শুওর।" হিসহিসিয়ে উঠলো মানুষটার গলা। আবার পা উঠলো। এবার লাথিটা এলো একদম নিকের মাথায়।

ডুবো জাহাজ অনেক মাইল দূরে। জলের নীচে ভেসে চলেছে। জঁা পিঁয়ের ডুবো জাহাজের তার নির্দিষ্ট ঘরে কাণে একটা কালো বাক্স-গুঁজে বসে ছিলো। ভয়ে আঁতংকে এক সময় তার মুখ হাঁ হয়ে গেলো।

"আমেরিকার শুওর।" গ্রাহক যন্ত্রে আবার ফিসফিসানি হলো। আবার একটা শব্দ। এবারের শব্দ প্রথমটার থেকেও জোরে। শব্দটা প্রথমে দাঁতের কড়মড়ানি মনে হলেও শেষমেষ কানে তালা লাগিয়ে দিলো।.........

চিচিং ফাঁকা

"ছের ছের!"

সুখ-স্বপ্ন উবে গেলো। যেন সুন্দর একটা সিনেমার দৃশ্যে হঠাৎ নেবে এলো লোড্ শেডিংয়ের হল্লা। চোখ চেয়ে চাইলাম। সামনেই দেখলাম আমার প্রকাশন সংস্থার শ্যামাপদকে। মুখে সেই বিচিত্র সম্বোধন। ষাঁড় স্যার আর ছার-এর জগাখিচুরি ছের! হড়বড়িয়ে উঠতে চেষ্টা করে বল্লাম,—মালকিন এয়েছেন? পা-জোড়া অভ্যস্ত চটি জোড়ায় ঢুকলো না। পড়লো জলে। শব্দ উঠলো—ঝপাং। ঘাবড়িয়ে একটু আগের দেখা "এক চক্রী বাস"-এর 'আমি' তুড়ি লাফ মারতে চাইলো একটা। টাল সামালাতে পারলে না দেহটা সরু বেঞ্চিটায়।—সম্পূর্ণ দেহটা পড়লো জলে। গাধার হাসি শুনেছেন? ঠিক গাধার হাসির মতো টেনে টেনে হেসে চল্লো শ্যামাপদ। বল্লাম, "এ-সব কী!"

হাসি থামলো এক সময়। হঠাৎ গম্ভীর হলো মেদিনীপুরের মানুষ শ্যামাপদ। আবার জিজ্ঞাসা করলাম,—মালকিন আসেন নি—কো?

"আর মালকিন! কিন্তু বাবু পৃথিবীটা যে নড়ে গেলো সেটা কী প্রত্যয় হয়েছে আপুনির। আপুনি ছের, সারা রাত এখানে ছ্যালেন কী করি?"

"আশ্চয্যি!- কী বলছো তুমি।" চারদিক তাকালাম এবার। ফাঁকা ঘরের দূরের দিকে ফেলে রাখা কতোগুলি বেঞ্চি-টেবিলের একটায় আশ্রয় নিয়েছিলাম আমি। সমস্ত ঘরটা ভর্তি হয়ে গেছে জলে। কেঁচো উঠছে দেওয়াল বেয়ে।

সোনা ব্যাং একটা টেবিলে গাল ফোলাচ্ছে। হঠাৎ অবাক হলাম। কারণ কলেজ ষ্ট্রীট কখনো তো এতো চুপচাপ থাকে না। নিরিবিলিতে থাকার জন্য আশ্রয় নিয়েছি এই ঘরে অনেকদিন। হঠাৎ দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র-ধারের ষ্টেশনে না জেনে নাবলে আর সমুদ্রের দিক থেকে হাওয়া বইলে যে গম গম আওয়াজ ওঠে—আমি যখনই এই ঘরে বসি ঠিক ওই আওয়াজটা কেন পাচ্ছি না আজ? অশুভ চিন্তা এলো মনে। তারপরেই ভয়—আমার বাড়ী, ছেলে-মেয়ে! চরম ভয় পেয়ে বসলো আমায়। চিৎকার করে উঠলাম আমি, "কী হয়েছে শ্যামা?"

—"আসুন, ইদিকি দেখবেন আসুন, বাইরে চলুন।" প্রায় হাত ধরেই বাইরে টেনে নিয়ে গেলো। অবাক হলাম। শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট থেকে জলের স্রোত এই কাণা গলিটায় সুন্দরবনে বাওরে জোয়ারে যেমন জল ঢোকে ঠিক সেই ভাবে ঢুকছে। কোথাও কোনো লোক নেই। কেবল কিছু দোকান-মালিক-কর্মচারি ছোটো ছোটো নৌকো আর উল্টানো মিষ্টির দোকানের বড় বড় গামলায় নিজের নিজের দোকানের পথে যেতে চেষ্টা করছে। এখন দুপুর বারোটা। কাল বিকেল চারটেয় এই সংস্থায় এসেছিলাম—ছেলেমেয়েদের জামা-কাপড় কিনবার জন্য টাকা চাইতে। সংস্থার মালকিন তখনো আসেন নি। তাই নিরিবিলি ওই ঘরটায় চলে আসি সময় কাটাবার জন্য। মালকিন না এলে টাকা মিলবে না। ঘরটা ভদ্রমহিলা এখনো কাজে লাগাননি। এখন গুদাম ঘর হিসবেই ব্যবহার করা হচ্ছিলো।

দুপুর থেকেই বৃষ্টি। অবিশ্রান্ত বরিষণ। হিমেল হাওয়া। বর্দ্ধমান থেকে সারাটা পথ ঠায় ট্রেনে দাঁড়িয়ে। তা প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা। দেহ মন বই ছিলো না। টেবিলের ও পাশে লম্বা বেঞ্চিটা দেখে লোভ হলো। কাঁধের ঝোলা মাথায় দিয়ে চোখ বুঝলাম একসময়। বয়স হচ্ছে তো। ভেবেছিলাম একসময়—পুজো তো দেরী আছে। পরে একদিন আসা যাবে। না, বিশ্বাস নেই প্রকাশকদের। আজকেই টাকা দেবার কথা ভদ্রমহিলার। শখের লিখিয়ে আমি। টাকার দরকার হলেই লিখি। সব রকম লেখা—নাটক উপন্যাস, গল্প অরে কারিগরী বই। চাকরী-ও করি ছোটোমটো একটা। মনের কথাটাই প্রকাশ পেলো শ্যামাপদের ভাষায়,—আক্কেল-টা দেখুন ছের, কানা-ইয়ের। যখন প্লাবন নাবলো,—ব্যাটা ঘরগুলি তো হাঁটকে দেখবি। ঘরে কুলুপ মারলেই হলো। অবশ্যি ত্যকেন লোর সেসিং ছ্যালো। তা বলে খুজবিনি কো? ছ্যা, ছ্যা, কী ববহার!

—কিন্তু শ্যামা, আমি হাওড়া ষ্টেশনে যাবো কী করে? এই সমুদ্র ঠেংগিয়ে?

—কোথায় যাবেন ছের আপুনি? গাড়ী-ঘোড়া কী চলছে? ট্রেন তো কাল এতে থেকে বন্ধ। দেখুন গে—হাওড়া ব্রিজ ভেংগে গেছে কী না!

চোখ দুটো অজান্তেই জলে ভরে উঠলো। ছেলেমেয়ে এখনো বোধহয় তাদের মাকে বিরক্ত করছে—বাবা কখন আসবে? আমার ক্যামেরা? আমার ম্যাচকি?

কতো অসহায় মানুষ। দুশো বছরের বিজ্ঞানের দান ২৩শে অক্টোবরের এক প্লাবনে স্তব্ধ। জানি না কখন অজান্তে বুক জলে নেবে পড়েছি। পেছনে শ্যামাপদের চিৎকবার,—সবুর করেন ছের, সবুর করেন। এই গামলা নৌকোতে পৌঁছেদি আপুনিকে।